আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচ.ডি
ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

(Influence of Austrict Language and Culture on Jharkhandi Bengali Language and Culture : An analytical study)

গবেষক
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী
পঞ্জিয়ন ক্রম : পিএইচ. ডি/১২৩৩/২০১০
তারিখ : ০৪-১০-২০১০

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা অনুষদ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিলচর - ৭৮৮০১১, ভারত

আগস্ট ২০১৪ ইং

DEPARTMENT OF BENGALI
Rabindranath Tagore School of
Indian Languages & Cultural Studies
Assam University, Silchar
(A Central University constituted under Act XIII of 1989)
Silchar - 788011, Assam, India.

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled "**Jharkhandi Bangla Bhasa O Sanskritir Upor Austric Bhasa O Sanskritir Prabhab - Ekti Bishleshanatmak Adhyayan**" submitted by Mrityunjay Banerjee for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Bengali is a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other university. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University, we recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this university.

Amalendu Chakraborty

Name & Signature of the
Joint Supervisor

Rama Bhattacharyya.

Name & Signature of the
Supervisor

Dr. Amalendu Chakraborty
Department of French
Assam University, Silchar-11

Prof. Rama Bhattacharyya
Department of Bengali
Assam University, Silchar-11

DECLARATION

*I, **Mrityunjay Banerjee**, bearing Registration Number Ph.D/ 1233/2010 dated 04-10-2010 of the A.U.S., hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "**Jharkhandi Bangla Bhasa O Sanskritir Upor Austric Bhasa O Sanskritir Prabhab - Ekti Bishleshanatmak Adhyayan**" is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University/Institute.*

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Place : Silchar
Date : 01-09-2014

Mrityunjay Banerjee

Mrityunjay Banerjee

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ			ক-খ
গবেষণায় ব্যবহৃত চিহ্ন ও সংকেত :			গ-চ
ভূমিকা			১
প্রথম অধ্যায়	:	ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার গঠনতত্ত্ব	২৭
তৃতীয় অধ্যায়	:	ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থ ও ক্রিয়া ব্যবহারে ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার সঙ্গে অস্ট্রিক ভাষার সম্পর্ক	৬২
চতুর্থ অধ্যায়	:	ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা এবং অস্ট্রিক ভাষার সমন্বয়ের প্রেক্ষাপটে ঝাড়খণ্ডীতে কিভাবে অস্ট্রিক ভাষার পারস্পারিক প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা	১০৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার পারস্পরিক প্রভাবের কারণে পরিবর্তনের রূপরেখাগুলির চিহ্নিতকরণ	১১৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	প্রবাদ-প্রবচণে ঝাড়খণ্ডী বাংলা ও অস্ট্রিক ভাষার সমন্বয়—একটি প্রস্তাবনা	১২৫
সপ্তম অধ্যায়	:	ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে অস্ট্রিক সংস্কৃতির প্রভাব	১৪৩
অষ্টম অধ্যায়	:	ঝাড়খণ্ডী বাংলা ও অস্ট্রিক শব্দকোষ সম্পর্কে আলোচনা	২০৯
উপসংহার	:		২৪০
গ্রন্থপঞ্জি	:		২৫১
সংগৃহীত চিত্র	:		২৬০

মুখবন্ধ

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা আমার মাতৃভাষা আর আমার বাড়ির চারপাশে প্রতিবেশী হিসেবে শৈশবকাল থেকেই সাঁওতাল, মাহালি, মুন্ডা, ডোম, বাগদি, শবর প্রভৃতি অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের লোকের সাথে উঠাবসা। পরে যখন বুঝতে শিখি যে এদের ভাষা বাংলা ভাষার উপর প্রভাব ফেলেছে। যখন কোন কাজে অন্যত্র গেছি তখনই আমার উচ্চারণ ভঙ্গিমা ও ভাষা প্রভেদের জন্য সহজেই চিহ্নিত হয়ে গেছি ফলে স্নাতকোত্তর পাঠকালের সময় থেকেই এই ভাষার স্বকীয়তাটা খোঁজার ইচ্ছা হয় এবং পরবর্তী কালে ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে গবেষণাকর্মে প্রলুব্ধ হই। গবেষণাকর্ম করতে এসে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও অজস্র প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছি কত ব্যথা নীরবে সহ্য করেছি ও বাস্তবজীবনের মুখোমুখি হয়ে আমি অবিচল থেকে গবেষণার কাজ করেছি। গবেষণার প্রথম দিন থেকে যাঁরা সর্বদাই অভয় ও সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড° প্রিয়কান্ত নাথ এবং অধ্যাপিকা রমা ভট্টাচার্য (তিনি শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়িকাই নন, আমার মাতৃস্থানীয়া) আর ড° অমলেন্দু চক্রবর্তী (ফরাসী ভাষা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়) আমার সহকারী তত্ত্বাবধায়কই নন আমার প্রেরক। এঁদের কাছে গবেষণা করতে পেয়ে আমি যারপরনাই খুশি। বই যোগাড় করে সাহায্য করেছেন ড° অর্জুন দেব সেনশর্মা, ড° দুর্বা দেব, ড° দেবাশিষ ভট্টাচার্য নানাভাবে পরামর্শ দান করেছেন। আর সাহায্য করেছেন প্রফেসর ঈপ্সিতা চন্দ ও প্রফেসর সায়ন্তন দাস (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), প্রফেসর সুহৃদ কুমার ভৌমিক (সাঁওতালী বিভাগ,

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়), পার্থসারথী হাটি খাতড়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, ড° শঙ্কর বিশাই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্ম্মূ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। আর সাহায্য করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগার— কলকাতার কর্ম্মীবৃন্দ, এবং বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মচারীবৃন্দ ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের কাছ থেকেও। আমার এই গবেষণার কাছে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন শ্রী বাদল পাল (শিলচর পৌরসভার কর্মী), ডা. গিরিজাকান্ত দাস (অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ চিকিৎসক, শিলচর), শ্রী সুরজিৎ ভট্টাচার্য (অম্বিকাপট্টি, শিলচর) ও আমার বাবা শ্রী বংশীবদন ব্যানার্জী ও মা শ্রীমতী শক্তিরূপা ব্যানার্জী সকলকেই প্রণাম জানাই।

সংক্ষিপ্ত সময়ে মুদ্রণে সাহায্য করেছেন হেমন্ত সিংহ তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনিবার্য কিছু ভুল এড়ানো যায়নি। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত সংকেত ও চিহ্ন

~ স্বনিমের ওপরে — আনুনাসিক বোঝাতে।

~ শব্দের পাশে — সমান্তরালভাবে বোঝাতে।

/ বিকল্প (Alternative) বোঝাতে।

> অব্যবহৃত পূর্ববর্তী বোঝাতে।

< অব্যবহৃত পরবর্তী বোঝাতে।

+ যুক্ত।

√ অন্তর্ভূক্ত বোঝাতে।

. স্বনিমের নীচে মূর্ধণ্য উচ্চারণের সূচক।

→ অভিমুখ বোঝাতে।

–– পারস্পরিক সংযোগ বোঝাতে।

" ঐ বা পূর্বোক্ত বোঝাতে।

* শব্দের আদিতে সামান্য ওপরে আনুমানিক এবং বাক্যের শুরুতে বিশেষ দ্বষ্টব্য বোঝাতে।

১,২,৩ উল্লেখপঞ্জি বা গ্রন্থসূত্র উল্লেখের সাংকেতিক চিহ্ন।

√ ধাতু বোঝাতে।

= সমান বোঝাতে।

(?) অর্থ জানতে চাওয়া / কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বনিম-লিপি (International Phonetic Script IPS) স্বরধ্বনি (মৌলিক)ঃ

অ-ɔ আ-a ই-i উ-u এ-e ও-o অ্যা-æ

এ্যা-ɛ ('এ' এবং 'অ্যা'-এর মধ্যবর্তী উচ্চারণ)

ও-u ('ও' এবং 'অ'-এর মধ্যবর্তী উচ্চারণ)

অ (লুপ্ত)-ɑ̸

অর্ধস্বর ঃ ই-ĭ উ্-ŭ এ্(য়্/ĕ) ও্(ŏ) অ্(ŭ)

যৌগিক স্বর ঃ ওই্-o͜i ওউ্-o͜u

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

ক-k	চ-c	ট-ṭ	ত-t	প-p	র-r
খ-k^h	ছ-c^h	ঠ-$ṭ^h$	থ-t^h	ফ-p^h	ল-l
গ-g	জ-j	ড-ḍ	দ-d	ব-b	ল (মূর্ধণ্য)-l
ঘ-g^h	ঝ-j^h	ঢ-$ḍ^h$	ধ-d^h	ভ-b^h	শ-ʃ
ঙ-n	ঞ-ñ	ণ-ṇ	ন-n	ম-m	স-s
					হ-h

সংক্ষেপীকরণ (Abbreviations) ঃ

ক্রি. → ক্রিয়া
ক্রি. বি → ক্রিয়া বিশেষ্য
ক্রি. বিণ → ক্রিয়া বিশেষণ
ক্রি. সমা → ক্রিয়া সমাহার
ক্রি. সহা → ক্রিয়া সহায়ক
ক্রি.-গুচ্ছ → ক্রিয়া গুচ্ছ
বি. → বিশেষ্য
বিণ. → বিশেষণ
বি.-গুচ্ছ → বিশেষ্য গুচ্ছ
মা. চ → মান্য চলিত
সা → সাধারণ
পু. ঘ → পুরাঘটিত
নিত. বৃ → নিত্য বৃত্ত

ভবি	→	ভবিষ্যৎ
সাধা	→	সাধারণ
সম্ভ্র	→	সম্ভ্রমার্থ
তুচ্ছ	→	তুচ্ছার্থক
উত্তম পুঃ	→	উত্তম পুরুষ
পু. বিভ	→	পুরুষ বিভক্তি
প্র. বিভ	→	প্রকার বিভক্তি
স্ব.	→	স্বরধ্বনি
প্রা.	→	প্রাকৃত
প্রা. বা	→	প্রাচীন বাংলা
ম. বা	→	মধ্য বাংলা
আ. ম. বা	→	আদি মধ্য বাংলা
মা. বাংলা	→	মান্য বাংলা
বা.	→	বাংলা
ঝা. বা	→	ঝাড়খন্ডী বাংলা
মা. ঝা	→	মানভুঁইয়া ঝাড়খন্ডী
ধ. ঝা	→	ধলভুঁইয়া ঝাড়খন্ডী
পূ. ঝা	→	পূর্বী ঝাড়খন্ডী
প্র. রা	→	প্রত্ন রাঢ়ী
সং	→	সংস্কৃত
উড়ি/ওড়ি	→	ওড়িয়া
উৎ	→	উৎকল
আ	→	আরবি
ফা	→	ফার্সি
ব্রজ বু	→	ব্রজবুলি
সাঁও	→	সাঁওতালি

ভূমিকা

বাংলা ভাষার চারিত্রিক দিকগুলি যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে বাংলা ভাষার উৎস সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। আমাদের গদ্য ও পদ্যে ব্যাকরণ বা শব্দের অনুশাসন অর্থাৎ শব্দের পর শব্দ যুক্ত হয়ে কিভাবে বাক্য ছন্দোবদ্ধ হয় তা অনুধাবন করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। ভাষার দুটি ভাগ, গদ্য ও পদ্য আর এ দুটিই অষ্ট্রিক ভাষার আদলে তৈরি হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন — "বাংলাভাষাটা যে অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্যভাষা, সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মানবে; আর্য্যামি যতদিন বাধা দিতে থাকবে, ততদিন বাংলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে।"[১] তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে বাঙালির পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন? কারণ বাংলার জনগোষ্ঠীকে জেনে নিয়েই ভাষাকে জানার চেষ্টা করবো। মাত্র একহাজার বছর আগে চর্যাপদের পূর্বে বাঙলা ভাষাই ছিল না। তার আগে কী ভাষায় বা এখানকার মানুষ কথা বলতো?

বৈদিক যুগে বাংলাদেশের ভাষাকে ও বাংলার সংস্কৃতিকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে। বেদোত্তর যুগে বাংলাদেশকে অযজ্ঞীয় বলা হইয়াছে। তীর্থযাত্রা বিনা সে দেশে গেলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে এজন্য বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক গ্লানিকর কথা আছে।[২] ঝাড়খণ্ড অঞ্চল (বৃহত্তর রাঢ়) সেকালে আর্যেতর (সাঁওতাল, শবর, ওঁরাও যাদের বংশধর) অষ্ট্রিক জাতি অধ্যুষিত ছিল। তাদের ভাষা, আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি আজও পর্যাপ্ত পরিমানে ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সামাজিক আচারে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। 'টোটেম বা কুলকেতুর পূজা সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান ঝাড়ফুঁক, খাদ্যসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার টাবু বা ধর্মগত বাধানিষেধ পদ্ধতিতে বিশ্বাস — এই সব বিষয়ের প্রভাব ভারতবাসীর জীবনে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এদের বেশিরভাগই আদি অস্ট্রালরূপ জাতি প্রচলিত করেছিল।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দীপপুঞ্জগুলির বিচিত্র ভাষার সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত অংশে আনাম, মালয়, তালৈঙ, খাসিয়া, কোল (মুন্ডা) সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা যেসব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ ও খ্মেরগোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যে সব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই ভাষার পুরাতন নাম অস্ট্রো-এশিয়, আধুনি নাম অস্ট্রিক। কিন্তু এ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা একই গোষ্ঠীর নয়। অস্ট্রালয়েড রক্তের সঙ্গে মোঙ্গলীয় রক্তের মিশ্রণ হয়েছে বা হয়নি সবই অনুমান। সুতরাং আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী আদি-অস্ট্রেলিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে যেমন মুন্ডা, কোল ও সাঁওতাল, ভূমিজ ও শবর। পরবর্তীকালে যদিও রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে বা অনেক জায়গায় নতুন নতুন জনগোষ্ঠী পুরোপুরি আত্মসাৎ করেছে তবুও পুরানো অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাকে গ্রহণেও বাধ্য হয়েছে এবং নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই ভাষাপ্রবাহ আজও চলে আসছে। অস্ট্রিক ভাষা একসময় মধ্যভারত হতে আরম্ভ করে সাঁওতাল-ভূমি আসাম, নিম্ন ব্রহ্ম, মালয়, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই ভাষাগুলি সবই অস্ট্রিক পরিবারের মধ্যে পড়ে। আবার এক গোষ্ঠীর হলেও তাদের প্রভেদও আছে। তালৈং-মনখ্মের সঙ্গে কোলগোষ্ঠীর মিল বেশি। খাসিয়াদের সঙ্গে নিকোবরীদের মিলও যথেষ্ট। সাঁওতালী, মুন্ডারী, ভুমিজ, হো, কোড়া, অসুরী খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদব প্রভৃতি সকল বুলিই এক গোষ্ঠীভুক্ত বা খুবই কাছাকাছি — অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর কিরাতজন-কৃতি গ্রন্থে বলেছেন — The proto-Australoieds of India, after they become modified into the Primitive-Austric-speaking people, come in touch with the Aryans after these latter had invaded India in times posterior to 1500 BC, and the Aryans come to know them as Nisādas as Sabaras and as pulindas, and in post-christain times as Bhillas and Kolls (where we have the modern Indo-Aryan names for Central Indian tribes of Austric origin – Bhils and Kols) Nisada, or Sabara-pulinda or Bhilla-Kolla tribes gradually became Aryanised in speech in the Ganges Valley and else where,

and were fused with the Aryans and also with the Dravidians. The process is still continuing, in Chota Nagpur and elsewhere where Austric speakers are gradually abandoning their own speech for the Aryan – Oriya, or Bengali, or some form of Bihari, Rajasthani or Bundeli, in this way, with the change of speech and with racial admixture with Dravidian and Aryan speakers. These Austrics became transformed into the masses of the Hindu or Indian people of North India. In India, from the earliest times cultural assimilation went hand in hand with a large amount of racial fusion, people of the above mentioned races. With various forms of Austric, (Page-9).

উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্র (কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকায়) আর্যভাষার প্রভাব। এই আর্যসভ্যতার এই ভাষাও সংস্কৃতির বাহক, যা সংস্কৃত, প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে বর্তমানে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। বাংলা ভাষাও তার মধ্যে অন্যতম। এখন যদি বলা যায় যে সংস্কৃত-প্রাকৃতের ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দপদ রচনারীতির প্রভাব আছে, (হয় অস্ট্রিকরূপে নয়তো সংস্কৃতের ছদ্মবেশে) তা হলে বোঝা যায় যে আর্য ভাষাভাষী লোকদের আদিমতম স্তরে অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকের বসবাস ছিল। ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন — "Aryan, in scientific language is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language, and if we speak of Aryan race at all, we should know that it means no more than Aryan speech" ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরিস্কার করে বলতে চাইলেন, It is worse that Babylonian confusion of tongues - it is downright theft"[৩] কিন্তু তথাপি আজও জাতিসত্তাবিদগণ আর্যজাতিরূপ মতবাদের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই[৪] কিন্তু এমন ভাবনার অবকাশেই নেই—

"আসামে ও বাংলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়ি (বিশ বা বিংশ নয়) এক পণ অর্থাৎ ৮০ টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে-বাজারে

পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, কড়ি এমনকি ছোটমাছ ইত্যাদি দ্রব্যও এখনও এইভাবে গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং এই গণনারীতিটি — দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪-ও। মূল অর্থ পোন/চার। অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কুড়িই তাদের গণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এর মান। কাজেই এক কুড়ি; দুই কুড়ি; তিন কুড়ি; চার কুড়িতে (৪ x ২০ = ৮০) এক পণ। এই অর্থে আশিও পণ, চারও পণ। এই পণ তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ। আবার কুড়ি গোণ্ড বা গণ্ডতে এক পণ ৮০ এও অস্ট্রিক ভাষারই গণনা। অর্থাৎ এক গোন্ডা বা গন্ডাতে চার সংখ্যা; প্রত্যেক সংখ্যার কুড়িতে (৪ x ৫) পাঁচটি গোন্ডা। এই গোন্ডা বা গণ্ডই বাংলায় গোন্ডা যার চার সংখ্যার সমান। চার কুড়িতে এক গোন্ডা।"

বাঙলায় খাঁ খাঁ (করে ওঠা) খাঁখার (দেওয়া), বাঁখারি (চেরা বাঁশ) বাদুর কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো) জাং (জঙ্ঘা) ঠেঙ্গ গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ, ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোঞ্চা, কলি (ছন) ছাট, পেট, খোস, ঝোড় বা ঝাড়, চিখিল (কাদা) ডোম, চোঙ, চোঙ্গা, মেড়া (ভেড়া), বোয়াল করাত দা দাও, বাইগন, পগার, গড় বরজ, লাউ, লেবু, কলা, কামরাঙা, ডুমুর প্রভৃতি মূলত অস্ট্রিক ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ।[৫] নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে ৪৪ নং পৃষ্ঠায় লেভি সাহেবের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা গ্রহণযোগ্য —

Pulinda-Kulinda Mekala Utkala (with the group Udra-Pundra-Munda) Kosala-Tosala; Anga-Vanga, Kalinga-Tillinga form the links of a long chair which extends from the eastern of Kashmir upto centre of the Peninsula. The skeleton of the 'ethnical system' is constituted by the heights of the Central Plateau; it participates in the life of all the great rivers of India except the Indus in the West and Kaveri in the South. Each of these groups forms a binary whole; each of these binary resets is united with another member of the system. In each ethnic pair the twin bears the same name, differentiated only by the initial K and

T; K and P; Zero and V, or M or P. This process of information is foreign to indo-European. It is foreign to Dravidian; it is on the contrary characteristic of the vast family of languages which are called Austro-Asiatic, and which cover in India the group of the Munda languages, often called also Kolarian.[৬]

যদি আমরা বাঙালি জাতি ও ভাষার উৎস সন্ধানের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে দেখব যে বাঙালি সংকর জাতি। নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক চর্চায় Physical Anthropology বা শারীরিক নৃবিজ্ঞানের মূল্য নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমনকি বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণের সহিত অপর কোনো প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশি ঘনিষ্ট।"[৭]

বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখা যায় আদিবাসীদের মধ্যে এক একটি Cast বা জাত হিসাবে কাজ করে থাকে যেমন কোড়া* যারা মাটি কাটার কাজ করে, আবার অনেকেই বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি, ঝাঁটা, কুলো বুনে এদের মাইলি বা মাহালি**। এরা এভাবেই জীবিকা গ্রহণ করেছে। আর্যজাতীর ন্যায় অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও জাতি-প্রথা চলে আসছে। সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন যে "ধীমাল উপজাতির লোকজন এখনও ধীরে ধীরে রাজবংশী হচ্ছে ধীমাল ও রাজবংশীদের মধ্যে এখনও বৈবাহিক যোগাযোগ বিদ্যমান।" (সুহৃদকুমার ভৌমিক — বাঙলাভাষার গঠন, পৃষ্ঠা ১৭) এটা কিন্তু ঠিক নয় কারো ব্যক্তিগত ঘটনা হয়ে থাকতে পারে; তাছাড়া সমাজ এগিয়ে চলছে এখন বৈবাহিক ক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক শিথিল। আর পাশাপাশি

---

* কোড়া (বাঁকুড়া জেলার রাইপুর ব্লকের মণ্ডলকুলি গ্রামে ও রানীগঞ্জে প্রচুর কোড়া সম্প্রদায় বাস করেন।

**মাহালি (বাঁকুড়া জেলার রাইপুর ব্লকে তপ্তদামদি গ্রামে ও সারেঙ্গা ব্লকের খয়ের পাউড়ি গ্রামে প্রচুর মাহালি জাতি বসবাস করেন।

অবস্থানের জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নৈকট্যেরও মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। রিজলী সাহেব অন্ত্যজ যে সকল উপজাতির প্রসঙ্গ এনেছেন তা বর্তমানে নির্ভেজাল বলে মানা যায় না অনেক জাতিগোষ্ঠীকেই তিনি এক হিসাবেই ধরে নিয়েছেন কিন্তু Hindu Method of Tribal Absorption হিসাবে দেখা গেলেও তা যে চূড়ান্ত নয় বর্তমানে বর্ণাশ্রম একমাত্র Socio-Economic Pattern-এর উপর নির্ভর করছে।

বাংলা ভাষার প্রাথমিক গঠন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বারা ঘটেছিল, ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বনিতত্ত্ব ও বাগরীতি (Speech-habit)। তার প্রকাশ ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা পদ্যে। শব্দের যথোপযুক্ত অর্থবাহী বাক্যের গঠন বা Syntax এবং প্রাচীনতম সাহিত্য চর্যাপদের মাধ্যমে আদিবাসী জীবন ও সমাজ কতখানি প্রতিফলিত। যখন আমরা তুলনামূলক বিচার করবো তখন ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নতুন ভাষা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে কিম্বা নতুন শব্দের আগমণ ঘটে, তাদের নিজস্ব শব্দ কম ব্যবহৃত হতে হতে হারিয়ে যায় ব্যবহারিক কারণেই কিন্তু ধ্বনিবৈশিষ্ট্য জীবদেহে জিনের মতো (hereditary factor in germ-cell) কাজ করে। যেমন — সংস্কৃত শব্দ নরঃ বাঙলায় উচ্চারিত হয় নর হিসাবে, 'গৃহ' বাঙলায় 'ঘর' এবং ঐ একই শব্দ ওড়িয়াতে 'ঘর-অ' হিসাবে উচ্চারিত হয়। সমস্ত উত্তর ভারতীয় ভাষার 'ঘর' প্রাকৃত থেকে আগত। ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক লিখেছেন — বাংলাভাষার গঠনবিন্যাস, ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা এমনকি স্বাভাবিক বাগরীতি ও ছন্দ, সবকিছু আলোচনার জন্য আজ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় ভাষা সাঁওতালির দ্বারস্থ হতে হইবে। বাঙলা ও সাঁওতালীর সরধ্বনির সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন — বিশুদ্ধ অ (যেমন ঘর) এবং অ্যা (দেখা, খেলা) এ দুটি ধ্বনি বাংলা ও সাঁওতালিতে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান, যা বাংলার নিকটতম ভাষা হিন্দিতে নেই।" Open 'ε' অসমীয়াতেও বিদ্যমান। এই অ্যা ধ্বনি সাঁওতালীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ধ্বনিবিচারে অন্যতম আর একটি দিক হল speech habit বা বাগরীতি। এই বাগরীতির উপরেই গড়ে ওঠে ছন্দ। বাঙালির ছন্দ বাঙালির বাগরীতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। বাগরীতির ক্ষমতা অনেক গভীর ও অপরিবর্তনীয়। আমরা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে

পারি, কিন্তু ঐ শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করতে পারি না যেমন —

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেএ এলো বান' — এতে যে ছন্দ প্রকাশিত হয়েছে, তা বাঙালির স্বাভাবিক বাগরীতির দ্বারাই পরিচালিত। কিন্তু যখন ওড়িয়া ভাষাভাষী কোন ব্যক্তি এটি পাঠ করে তখন তার উচ্চারণ ও ছন্দ হবে অন্যরকম। —

বৃষ্টি-পড়ে টাপুর-অ টুপুর-অ নদেয-অ এলো বান-অ। Hindu Method of Tribal Absorpation টি বোঝা যাবে —

। । ।   । ।   । । ।   । ।   । । ।   । ।   । ।

তেহঞ্ পেড়া তাহেন্ মেসে। তেহেঞ্ তোয়া। দাকা (৪+৪+৪+২)

। ।   । ।   । । ।   । ।   । । ।   ।   । ।

গা গা পেড়া। তাহেন্ মেসে। গাপাজে-ল। দাকা (৪+৪+৪+২)

। ।   । ।   । । ।   । ।   ।   ।   । ।   । ।

দিন্‌গে পেড়া। তাহেন্ মেসে। দিন সে রাগে। উর্তু (৪+৪+৪+২)

(হে কুটুম, তুমি আছ থেকে যাও। আজ দুধ-ভাত খাওয়াব, কাল যদি থাক, তবে মাংস-ভাত খাওয়াব। আর যদি প্রতিদিন থাকো, তাহলে শুধু ঝোল-ভাতই দেব।)

— আবার

নাচনিয়া থারে থার

মাদাড়িয়া সারে সার

অকয় কোয়াঃক চেঃৎ ঞুতুম

বাইঞ বাড়ায়া —

(যারা নাচবে তারা স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে, যারা মাদল বাজাবে তারাও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনকার কী যে নাম আমি জানি না।)

বাংলা ভাষার ছড়ার ছন্দ বা দলবৃত্তরীতি সরাসরি কোল জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে এসেছে। চর্যাপদ রচনার অনেক আগে যখন বাংলা গড়ে ওঠেনি, তখন খেরওয়াল ভাষাগোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। কোলাবিধ্বং সিনস্তথা (চণ্ডী, ১ম

অধ্যায়) —

।।।। ।। ।। ।। ।। । ।

হতুবন। বোলোগোম। দিশুমন। বো-লে (৪+৪+৪+২)

হতুবন। গো-অম। আয়রে বেড়ইঞ।

হতুবন। বোলোগোম। দিসুবন। বো-লে —

দিসুদি। গুরগোম। সুতঃ-ড়াঃ। ইঞে।।

।। ।। ।।।। ।।।। ।।

কা-আ। তরুবর। পঞ্চবি। ডাল (৪+৪+৩+২)

চঞ্চল। চী-এ। পৈঠো। কাল

পয়ার ছন্দ ১৪ মাত্রা অসমীয়াতেও আছে ওড়িয়াতেও আছে। (Classical meeter)

ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক লিখেছেন — 'কোলজাতি অধ্যুষিত Austic বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্লাবনের সময় সে যুগের কোল গোষ্ঠীর নানা শাখা (তখনও সাঁওতাল শব্দের জন্ম হয়নি) ছোট-বড় দলে বৃহৎ ভারতীয় সমাজে যুক্তি হয় এবং সে যুগে তাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দকে ঘষে-মেজে সংস্কৃতে মানানসই করে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অক্ষম অনুসরণ করে বা আদৌ না-করে, তৎকালীন তাদের ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ প্রয়োগ করে বাঙলা তথা দেকুদের ভাষা সৃষ্টি করেছিল, মনের ভাব প্রকাশের জন্য। সম্ভবত এ ঘটনা ঘটে গুপ্ত ও পালদের মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং মানুষ পরিবর্তিত হয়নি ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে।[৮]

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে অনেক গ্রামের নাম আছে যাদের অনেকেই আর্য শব্দতত্ত্বে কোনো অর্থ হয় না। কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতির ভাষা এবং উপভাষাতে তাদের কিছু কিছু অর্থ থাকলেও অনেকেরই অর্থ মেলে না। অথচ ঐ নামগুলির মানে নিশ্চয়ই একসময় ছিল। হয়ত অনেক উপভাষা কালের বুকে বিলীন হয়ে গেছে। যেমন ধাঙড় জাতি এরা ছোটনাগপুর মালভূমির সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী। কোলগোষ্ঠীর

এক শাখা। এরা যে ভাষায় কথা বলে তার অনেকটা সাঁওতালরা বোঝে না। উচ্চারণ ও বলবার ধরণও আলাদা। এরা এখন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ক্রমে বাঙালি বা বিহারী সংস্কৃতির আওয়ায় এসে পেড়েছে। ভাষাগত দিক থেকে মুন্ডা, হো ও সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রিকগোষ্ঠীর। মুন্ডা ও কোলদের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল আছে। জীবন্ত ভাষার ধর্ম হল — নানা ভাষা থেকে শব্দসম্ভার আত্মসাৎ করা। মুন্ডারী শাখার ভাষাগুলি তা করেছে। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এমননি ইংরেজি শব্দও আধুনিক মুন্ডারী ভাষায় বর্তমান — We found reasonable ground to conjecture that the Aryan invaders of India had come in contact with the Santals or a cognate race in primitive times and mentioned that the prakrit, a very early form of vernacular. Sanskrit had adopted pure Santali terms. (The Annals of Rural Bengal. Bribhum, p. 176, Hunter)

অনেক গ্রামের নাম সাঁওতালী ভাষায় পাওয়া যায় যেমন — বাদ, বাজোল, নরদা, গুড়গুড়ি, সুকুই, নাগি, বালাম, বুট, বুটমারি, বিরুড়ি, দাহিয়া, দাসরি, গাজালিয়া, কুকড়াখুপি, চাতরা, ছাতাই, পড়্যাডি , সামুডি, গালুডি, সারেঙ্গা, ভালাইড়ি, সামুড়্য, চ্যাতড়া, ঝিঙাগড়া, দল, ভাসা, সুকুই, নাগি, ডাগরাশাল, গজালিয়া হালনি, মাকামসি, নগু, লওয়ানি, মাশুরি, রুপশাইল, কুখড়াশাইল প্রভৃতি ধানের নামেও বলা যায়। বিভিন্ন মাছের নাম থেকেও গ্রাম বা স্থানের নাম নিষ্পন্ন হয়েছে। দাঁড়কা (স্থান) খুরযে (স্থান), কাঁই, খলসে (স্থান) পুঁয়ে, গড়ই, চ্যাং, বালকড়া, মাগুরা, লুড়কুচি, ভেদা, ডুমির, ছোয়া, চিমুড়ী, রাইখড়া, পাঙ্গাশ, বাইটকা, খরশলা, শাল (সংস্কৃতে শালা) শব্দের যোগে বহু নাম আছে। শাল হল আখমাড়াই ও গুড় তৈরির জায়গাটিকে বলা হয়। সাঁওতালি ভাষায় শাল মানে গুড়। দমদম কথার অর্থ ঘন। বাঁশের ঝাড় বা মাথার চুলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। তুতুড়া - ভিজে মাটি। দুমকা-ছোট টুকরা, সাংড়া-দুটি লোকের কাঁধে বাঁশে কিছু ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া, পংড়া-কচি চারাকে। দামড়া -এঁড়ে বাছুর ইত্যাদি। হুগলীতে শব্দটি বলদ অর্থে ব্যবহৃত হয়, দ্র. রামকৃষ্ণ কথামৃত।

কালের প্রভাবে বিচিত্র সংস্কৃতির সংঘাত ও উন্নত ভাষাভাষীর সংস্পর্শ গ্রাম নাম বদলেছে বিকৃত হয়েছে। সুতরাং সব নামের অর্থভেদ হওয়া সহজ নয়। ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষাতেও শত শত অস্ট্রিক শব্দ মিশে আছে। তাদের রূপান্তরও ঘটেছে। আবার আর্য প্রভাবের ফলে বহু শব্দ সংস্কৃতগন্ধী হয়ে গেছে। যেমন — 'গঙ্গা' শব্দটি মুন্ডারী ভাষায় 'গং'। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — গঙ্গা (শব্দটি √গম থেকে) শব্দটি অস্ট্রিক শব্দজাত বলে মনে হয়। ঢেঁকি, ঢেঙা, ডাং প্রভৃতি দেশি শব্দ বলে বাংলা ব্যাকরণ বা অভিধানে স্থান পেয়েছে। এগুলি মুন্ডারী ভাষায় আছে। তাছাড়া মুন্ডারী ভাষার শব্দ যা ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্য আফর-ধানের চারা (তলা), আঞ্জির - পেয়ারা, আঁয়া - প্রকৃত (ডাঁহা) যেমন ডাঁহা মিথ্যা কথা বইল্ল। বাইদ - ভাঙ্গা, ডাবু - হাতা, বিরানো - আজানা, ডেঙ্গো - অবিবাহিত লোক, ধবিস - নির্ভয়। যেমন — (চইখে ভাল দেখইতে পাই নাই, ধাধসে ঘুইরে বেড়াই)। কুলি - গ্রামের কাঁচা রাস্তা (হিন্দী - কুলি, সংস্কৃত - দুল্ল্যা)

"খোকন আমাদের লক্ষ্মী
গলায় দেবো তক্তি
কোমরে দেবো হেলে
কুলি কুলি বেড়াবে যেন
কুনো বড় মানুষের ছেলে।"

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষায় কুলকুলি বলা হয়, আহ্লাদে হৈ চৈ করে বেড়ানোকে। হড়পা - জোরে (হড়পাবান), লেডো - দুর্বল, লুডুং বুডুং - অলস (কাজ করার ইচ্ছা নাই, শুধু লুডুং বুডুং করছে) কথাটি খুব সম্ভবত নড়বড় শব্দ থেকে এসেছে। নড়বড় > লড়বড় > লুডুং বুডুং (লুডুর বুডুর)। হিন্দিতে লুডুর-লুডুর expression পাওয়া যায়। আলামরা - নেতিয়ে পড়া; ডোল - বালতি, তুষ - ধানের খোসা। ফোরা - ফাঁপা (ফোপরা বাঁশ), হাসা - মাটি (হাসা পাথর) ইসবিস - উত্তেজিত হওয়া (ইসবিস কাঁকড়ার বিষ — বাংলা ঝাড়ন মন্ত্র) খালুই (পূর্ববঙ্গেও ব্যবহৃত হয়) - মাছের চুপড়ী, গান্ধি - একদল (মাছ সংখ্যায় বেশি হলে পুকুরে গাঁদি লাগে অর্থাৎ ভেসে ওঠে।) স্থিরছাতুরে - ছড়িয়ে

পড়া; আরি - হাত করাত, শেলেদা - শেলেদা বাঘ (কেঁদো বাঘ), আঁটন (প্রতিমা বা তার কাঠামো) - দেবস্থান, আঁইড়ে বাস - বালিকা বয়স (ঐ তো আঁইড়ে বাস একটা কোলে; দিনরাত চ্যাঁচ্যাঁ করছে), ডিগর - অবাধ্য (ভারি ডিগর ছেলে সারাদিন বাঁদরামো করছে) ইত্যাদি। এসব ছাড়াও কতকগুলি শব্দ ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষি অঞ্চলে অবিরত ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু সেগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে কিনারা করা বড়ই মুসকিল। যেমন উরুলি মুরুলি (অবিন্যস্ত বেশবাস), ডারপার (দুঃসাহসী), ডিঙ্গলে (মিষ্টি কুমড়ো), ঢাপা (বড়), লুন্ডুরে (উড়নচন্ডী), ঘ্যাসসড় (নোংরা), জলপটঙ্গা (জলবৎ), ঝুলফুলি (নবজাতকের ছেদিত নাড়ী), পেঁটেচিপ্পি (মক্ষীচুষ), আঁধা, ধাপুড়ি (আন্দাজ), ভালা (দেখা), বেত (মুখ), ঝলখলি (ঝঞ্ঝাট), গাঁড়র (নিরেট বোকা), আপুসে দেওয়া (মেরে শেষ করে দেওয়া), খাটুল মাটুল (আসন পিঁড়ি হয়ে বসা), মাকড় কুদোমি (হুল্লোড়), বিঁজি (ক্ষুদ্র), খিদিবিদি (অস্থির), একাশি (কাৎ করে ঢালা) ইত্যাদি।

তাছাড়া অস্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, বেগুণ, লাউ, লেবু, পান, নারকেল, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, ডুমুর < উডুম্বর, হলুদ < হরিদ্রা, সুপারি, ডালিম < দাড়িম্ব ইত্যাদিরও চাষ করত। এই কৃষিদ্রব্যের নামের প্রত্যেকটিই অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা থেকে নেওয়া, এবং এগুলোর প্রত্যেকটিই এখানকার অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্য। তুলোর কাপড়ের ব্যবহারও অস্ট্রিকভাষীদের দান। (নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৪৯) কার্পাস শব্দটি অস্ট্রিক। পট, কর্পট এই দুটি শব্দও অস্ট্রিকভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। কম্বল কথাটিও অস্ট্রিক। নিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণির শবর, মুন্ডা, গদব, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা প্রধানত পশু শিকার করতো আর তীর ধনুকই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্রোপকরণ। বাণ, ধণু বা ধনুক < ধনুষ, পিনাক — এই সবকটি শব্দই মূলত অস্ট্রিক। (বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৪৯)

'ইহারা যেসব পশুপাখি শিকার করিত, তাহাদের মধ্যে হাতি, মেড়া (ভেড়া) কাক কর্কট এবং কপোতের (যাহার অর্থ শুধু পায়রাই নয়, যে কোন পক্ষী, মূল অর্থ ঘুঘু পাখি, শব্দটি অস্ট্রিক) নাম করা যাইতে পারে। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার, হস্তী অর্থে এবং কপোত মূলত অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত।'[৯] (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৪৯)

ঝাড়খন্ড অঞ্চল সম্পর্কে লিখিত ইতিহাস যা পাওয়া যায় তা হল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিবরণ ও পরবর্তীকালে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাবে তান্ত্রিকতা ম্লান হয়ে গেছে। বৌদ্ধধর্মকে অপসারণের উদ্দেশ্যে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা কি রকম চেষ্টিত হয়েছিল তা লৌকিক দেবদেবীর পূজাপাঠগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে। অনেক জায়গায় মাটির নীচে বৌদ্ধমূর্তিগুলিকে পুঁতে ফেলে শিব বা ধর্মঠাকুরে রূপান্তর করা হয়েছে। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি তান্ত্রিক সাধকরা। জনমানসে বিশ্বাস রক্ষার জন্য রামায়ণ মহাভারতের যাবতীয় উপাখ্যান স্থান বিশেষের উপর আরোপ করে গেছেন। ... অবশ্য সূহ্মদেশের নাম পাওয়া যায়। 'সূহ্ম' রাঢ় অঞ্চলকেই সূচিত করেছিল।[১]

---

(১) দ্রষ্টব্য ঃ অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষের এক অংশ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল, নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ; পুন্ড্র এবং সূহ্ম। বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চলের পূর্ব নাম ছিল অঙ্গ। বঙ্গ-পূর্ববঙ্গ, কলিঙ্গ-কটক অঞ্চল তাহার পরের দেশ ওড্র-উড়িষ্যা। পুন্ড্র মালদহ অঞ্চলের এবং সুক্ষ রাঢ় অঞ্চলের পূর্বনাম। পুন্ড্রের রাজধানী ছিল গৌড়। অঙ্গ, পুন্ড্র এবং সুক্ষ পরবর্তীকালে গৌড়মণ্ডল নামে অভিহিত হয়। একসময় সমগ্র বাঙ্গালাদেশ গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিতি ছিল। আসাম পর্যন্ত সীমা ছিল এই গৌড়বঙ্গের। উত্তরকালে কোন সময় গৌড়বঙ্গ চারিটি প্রদেশ বা ভুক্তির অন্তর্ভূক্ত হয় পৌন্ডবর্ধনভূক্তি, প্রাগজ্যোতিষভূক্তি, বর্ধমানভূক্তি ও দন্ডভূক্তি — মালদহ, আসাম, রাঢ় অঞ্চল এবং মেদনীপুর অঞ্চল পরে বর্ধমান ভুক্তির অর্থাৎ রাঢ়ের একাংশের নাম হয় কঙ্কগ্রামভুক্তি। (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭২, পৃ. ২১)।

ঝাড়খণ্ডী
বাংলা ভাষা
অনুসন্ধান ক্ষেত্র
ঝা ড় খ ণ্ড
ঝা ড় খ ণ্ড
ঝা ড় খ ণ্ড
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
আসানসোল
দুর্গাপুর
বর্ধমান
বিষ্ণুপুর
আরামবাগ
মেদিনীপুর
উড়িষ্যা
মে দি নী পু র
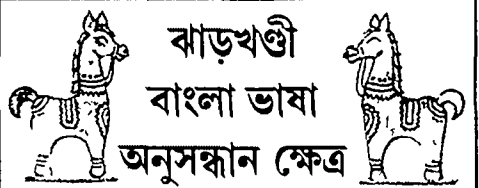
প্রথম অধ্যায়

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ইতিহাসের সঙ্গে সেই দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার ক্ষেত্র হিসাবে যে অঞ্চলটিকে নির্বাচন করছি তা আধুনিক রাজনৈতিক পটভূমিতে সর্বজনবোধ্য করে তোলার জন্য ছোটনাগপুরও বাংলা নামে চিহ্নিত করা যায়। ছোটনাগপুরের মালভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো উল্লেখ করেছেন ঃ

"ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভূখন্ড রাঁচিগন্ডোয়ানা মালভূমির অন্তর্গত। গন্ডোয়ান মালভূমির সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকে একই ভাগ্য-সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে ছোটনাগপুর বা রাঁচি মালভূমি যা ক্রমশঃ অবনমিত হয়ে তার অজলা-অফলা, ঊষর-ধূসর শরীর চিত্রে রাঙামাটি আর কাঁকর-পাথরের প্রলেপ নিতে নিতে খড়্গপুরের প্রান্তভূমি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। গন্ডোয়ানার বিন্ধ্য পর্বতমালা পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে চান্ডিল জামশেদপুরের দলমা পাহাড় স্পর্শ করে ঘাঘরা গোটাশিলা পাহাড় হয়ে চাকুলিয়া-বেলপাহাড়ীর মধ্যদেশ কানায়েশ্বর পাহাড়ের প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত হয়েছে, উত্তরে বাঘমুন্ডি অযোধ্যার পাহাড় ছাড়িয়ে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্যন্ত তা প্রসারিত। বলা বাহুল্য, ভারতের এই আদিম ভূমিখন্ডে সেই গন্ডোয়ানা থেকে খড়্গাপুর পর্যন্ত আদিম অধিবাসীদের বাসভূমি প্রসারিত। বলা বাহুল্য, ভারতের এই আদিম ভূমিখন্ডে সেই গন্ডোয়ানা থেকে খড়্গাপুর পর্যন্ত আদিম অধিবাসীদের বাসভূমি প্রসারিত। যাদের মধ্যে রয়েছে দ্রাবিড়, আদি অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর লোকেরা। কোন কোন গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা এখনো নির্বিকার ব্যবহার অব্যাহত

রেখে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। কোন কোন গোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আর্যভাষা গ্রহণ করে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করছে। পরবর্তী গোষ্ঠীগুলোর ভেতর ভূমিজ মাল, খারিয়া, কর্মি-মাহাত গোষ্ঠীগুলোই প্রধান"[১] এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলা। পুরুলিয়া জেলার — ঝালদা, বেগুনকোদর, আর্সা, বাঘমুন্ডি, অযোধ্যা, বরাবাজার, পুরুলিয়া সদর, বলরামপুর, ছররা, পাড়া রঘুনাথপুর, রামকানালী, আদ্রা, সান্তরী, কাশীপুর, গৌরাঙ্গডি, আনারা বিরামডি, বরাভূম, কান্তড়ি, কেন্দা, গোপালনগর, মানবাজার, বুধপুর, পুঞ্চা, হুড়া পাকবিড়রা, পর্ব্বতপুর, বান্দোয়ান, ঘটিহুলি, কুইলাপাল। বাঁকুড়া জেলার — শালতোড়া, শুশুনিয়া, তামাজুড়ি, কস্তুরিয়া, ছাতনা, শালডিহা, জোড়সা, ইন্দপুর, বাঘডিহা, বিবরদা, মশানঝাড়, হাড়মাসড়া, হিড়বাঁধ হাতিরামপুর, সুপুর, খাতড়া, লক্ষ্মীসাগর, কাঁকড়াদাঁড়া, অম্বিকানগর, চিয়াদা, বাজসোল, ঝিলিমিলি, রাণীবাঁধ, রাউতোড়া, রাইপুর, ছেন্দাপাথর, মটগোদা, ফুলকুশমা, ধান্দ্রা, সারেঙ্গা, সুখাডালী, দুবরাজপুর, সিমলাপাল পিয়ারডোবা, তালডাংরা, রামসাগর, তরনপুর, ওন্দা, মেজিয়া, দুর্লভপুর, নতুনগ্রাম, গঙ্গাজল ঘাটি।

পশ্চিম মেদিনীপুর — পচাপানি, রঘুনাথপুর, শিলদা, বেলপাহাড়ী, দহিজুড়ি, বীনপুর, ঝাড়গ্রাম, গিধনী, জামবনী, রিহায়া, লোধাশুলি, সরডিহা, চাঁদড়া, ভীমপুর, লালগড়, পিড়াকাটা, রামগড়, চন্দ্রকোনা রোড, গোয়ালতোড়, শালবনী, গদাপিয়াশাল, মেদনীপুর সদর।

ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচি, রামগড়, পূর্বসিংভূম, পশ্চিম সিংভূম, দেওঘর দুমকা, বোকারো, ধানবাদ, ছাতরা, গারওয়া, গিরিডি, কোডরমা, হাজারিবাগ, জামতাড়া, লোহারদাগা, পলামু প্রভৃতি জেলা সহ ছোটনাগপুরের বিস্তৃত ভূমিভাগ। পূর্ব সিংভূম জেলার ধলভূম ও ঘাটশিলার-যুগসেলাই, পোতকা, পতমদা, বরাম ও ঘাটশিলা মহকুমার মুসাবনী, দুমারিয়া, বহড়াগোড়া, ধলভূমগড়, চাকুলিয়া, গুঁড়াবাঁধা এবং পশ্চিম সিংভূম জেলার কয়েল, কোয়না, খারখাই, সঞ্জায়, রারো, দেও, বৈতরণী। চক্রধরপুর, বাঁদগাও, সোনুয়া, মনোহরপুর, গৌরী, আনন্দপুর, রাঁচি জেলার দশমফল্স, জনা, হিরনী, পঞ্চঘাট, কানকি ডেম সহ বন্ডু, তামাড়

প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা ঝাড়খন্ডী-বাংলা।

এই অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে থাকে তা বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন এই উপভাষাকে ঝাড়খন্ডী বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন। 'মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশের কথ্যভাষা রাঢ়ীর অন্তর্গত; দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম কথ্য উপভাষাগুলিকে 'দন্ড স্তবক' বলা যায়। দ্বিদলসংহিতান্ততি শিবস্তোত্রে (দ্র. স্তবকমালা রাজেন্দ্র লাইব্রেরী) "ঝাড়খণ্ডে বক্রেশ্বরঃ" (একই স্তোত্রে "রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ" আছে। আর মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের ধলভূমের ও মানভূমের কথ্য ভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খন্ডী বলা যায়।[২] ঝাড়খন্ড শব্দের অর্থ হল (ঝাড় - বি. ঝোপ খাঁ: লাটা) ছোটগাছ, ছোটগাছের ডাল; শুকনো ডালপালা বা ঝোপ অর্থে অস্ট্রিক শব্দ ঝান্টি ধ্বনিগত বিবর্তণে ঝাটি, ঝাড়ি বা ঝাড় অধ্যুষিত অর্থে ঝাটিখন্ড, ঝাড়িখন্ড বা ঝাড়খন্ড নামটির উদ্ভব। ঝান্টি > ঝাটি > ঝাড়ি > ঝাড়। ঝাড় শব্দটি বন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নীহাররঞ্জন রায় ভূ-প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে এই অঞ্চলকে পুরাভূমি বলেছেন। এবং এ বিষয়ে তিনি বলেছেন —

'রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বাঁকুড়া ও মেদনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি; ইহাও উক্ত পুরাভূমির অন্তর্গত মালভূমির অংশ একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা অনুর্বর। এখনো এই অংশে গভীর শালবন, পর্বত আকর, কয়লার খনি এবং ইহা সাধারণত অনুর্বর। প্রাচীন উত্তর রাঢ়ের অনেকখানি অংশ। দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিম অংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর গৈরিকভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ রাঢ়ের রানিগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন বিষ্ণুপুর রাজ্য; মেদনীপুরের শালবনি-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর সমস্তই এই পুরাভূমির নিম্ন অংশ। এই সব পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এখনো ইহাদের জলস্রোত

পার্বত্য লালমাটি বহন করিয়া আনে।[৩]

সাধারণত বৃহত্তর ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার অঞ্চল বলতে এক বিস্তৃত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায় — যার উত্তরে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সীমা, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা, পূর্বে বর্ধমান ও পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা। ঝাড়খন্ড রাজ্যের সিংভূম জেলা। এই ঝাড়খন্ডী অঞ্চল হল প্রধানত লাল কাঁকুরে মাটির দেশ; সাঁওতালী ভাষায় 'রৌড়দিশম' — অর্থাৎ পাথুরে রুক্ষ মাটির দেশ। দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চল ছিল অনার্য অধ্যুষিত। অনার্যরা ছিল আদি অস্ট্রাল (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) জাতি, কিম্বা তাদেরই শাখাভূক্ত নানা গোষ্ঠীর লোক। বস্তুত এই আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠীই ঝাড়খন্ডী ভূমির নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। 'মার্কেন্ডেয় পুরাণে মল্ল ও ব্যাঘ্রমুখ নামে দুটি রাজ্যের উল্লেখ আছে'।[৪] মল্ল রাজ্য বলতে মল্ল > মাল > মান (যুক্তবর্ণের সরলীকরণ ও ল > ন)। অরণ্য রাজ্যগুলি 'ভূম' হিসাবেও পরিচিত ছিল। অতিতের মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্তের বরাভূম, তুঙ্গ ভূম রাজ্য বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর। শেখর পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শেখর ভূম। সামন্তভূম, মানভূম সমস্তই ঝাড়খন্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঝারিখন্ডের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে —

'ঝারিখন্ডের স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি।।
মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারিখন্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষন্ড।।[৫]

শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রভাবে ঝাড়খন্ডের 'ভীল্লপ্রায়' (ভীল্ল > ভীল) লোককেও বিগলিত করেছিল এবং তারা 'পরম্পরায় বৈষ্ণব হৈল সর্বদেশে' ও সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে (মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ)। ইতিহাস বলছে চৈতন্যদেব (১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী জন্ম এবং ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা আষাঢ় এর পর তাঁকে আর দেখা

যায়নি) ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে মাঘমাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় চব্বিশ বছর। এরপর প্রায় পাঁচ বছর দক্ষিণ ভারত; পশ্চিম ভারত, মথুরা, বৃন্দাবন এবং রাঢ় গৌড়বঙ্গে পরিব্রাজক হিসাবে ভ্রমণ করেন ১৫১০-১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে চৈতন্যদেব ঝাড়খন্ড অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছিলেন। ঘটনাটি চৈতন্য ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে —

শেষ খন্ড সেতুবন্ধে গেলা ...

ঝারিখন্ডে দিয়া প্রভু গেলা মথুরায়।।[৬]

অষ্টাদশ শতকের কবি রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঝাড়খন্ডের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়—

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্ শাল পত্রে চ ভোজনম

শয়নম্ খর্জুরীপত্রে ঝাড়খন্ডো বিধীয়তে।[৭]

লোহার (অয়) পাত্রে পান (পয়ঃ) করা, শাল পাতায় ভোজন করা এবং খেজুর (খর্জুরী) পাতার বোনা তালায়ে শোওয়া এই অঞ্চলের মানুষের অভ্যাস বর্তমান দিনেও তা দেখা যায়।

ইংরেজরা আগের থেকেই এই অঞ্চলটিকে ঝাড়খন্ড নামেই জানত এবং চিনত। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে জঙ্গলমহলে দেওয়ানী সনদ পাবার পরও ঘাঁটি গাড়ার সাহস পায়নি। ১৭৬৫ খ্রীঃ দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাবার পর ঝাড়গ্রাম অভিযান চালায় সঙ্গে সঙ্গে রামগড়, শাঁখাকুলি (লালগড়) জামবনী, ঝাঁটিবনী (শিলদা) আত্মসমর্পণ করে। এরপর রাইপুর (তুঙ্গভূমি), ফুলকুশমা, শ্যামসুন্দরপুরের রাজারা কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এরপর আমাই নগর (অম্বিকা নগর) সুপুর, ছাতনা, বরাভূম, সামন্তভূম, পাতকুম, বুড়ু, সিলি তামাড় ঝালদা, কাতরাস, ঝরিয়া, পাঞ্চেত, কাশীপুর প্রভৃতি রাজ্যও দখল করে 'ঝাড়খন্ড' নাম বাদ দিয়ে জঙ্গলমহল নাম দেয়। ১৭৭৪ খ্রীঃ মেদিনীপুরের অধীনে আনা হল। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। ১৭৯৪ খ্রীঃ রাইপুর ও শ্যামসুন্দরপুরকে আবার মেদিনীপুরে ফিরিয়ে আনে। অবশেষে ১৮০৫ খ্রীঃ জঙ্গলমহল

নামে একটি জেলা গঠন করেন। এরমধ্যে পাঞ্চেত, বাঘমুন্ডি, বেগুনকোদর, তরফ বালিয়াপার, কাতরাস, হেসলা (ঝালদা) ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, কিসমৎ নওয়াগড়, তোড়াং টুন্ডি, পাতকুম, শনপাহাড়ী, ভঞ্জভূম, শেরগড়, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, বরাভূম, সুপুর, অম্বিকা নগর, সিমলাপাল, ভালাইডিহা প্রভৃতি যুক্ত করে নতুন জঙ্গলমহল রাজ্য গঠন করা হল। ধলভূম জঙ্গল রাজ্য হলেও তাকে জঙ্গলমহলের সঙ্গে না রেখে মেদিনীপুর শাসকের নিয়ন্ত্রণেই রাখা হল।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে জঙ্গলমহলে ভূমিজ বিদ্রোহ হয়। ১৮৩৩-এ এক নির্দেশ বা রেগুলেশন দ্বারা জঙ্গলমহল জেলার বিলোপ ঘটানো হয়। সেনপাহাড়ি, সেনগড় এবং বিষ্ণুপুর বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বাকি পরগণাগুলি মানভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৮৩৩-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নন রেগুলেশন এরিয়া গড়ে তোলা হয়। যার দায়িত্ব দেওয়া হয় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্টের হাতে — যিনি কমিশনার হিসাবে কাজ করবেন। ২২ শে ডিসেম্বর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় নতুন জঙ্গলমহল জেলা থেকে শনপাহাড়ী, শেরগড়, বিষ্ণুপুর এবং ধলভূমকে বাদ দেওয়া হল। বাঁকুড়া শহর বিষ্ণুপুর এবং ছাতনাকে বাঁকুড়া এজেন্সীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই নতুন এজেন্সিকে আবার তিনটি বিভাগে ভাগ করা হল — (১) মানভূম বিভাগে (যার সদর দপ্তর মানবাজার) ননরেগুলেটেড জঙ্গলমহল সহ ধলভূমকে (২) লোহার দাগা বিভাগে রাখা হল — বুন্ডু, সিলি, তামাড়, আদি পাঁচ পরগণা সহ চুটিয়া নাগপুর ও পালামৌকে। (৩) হাজারিবাগ বিভাগে রাখা হল — রামগড়, খড়কডিহা এবং পুরাতন রামগড় জেলার রেগুলেশন বহির্ভূত রাজ্যগুলিকে। ১৮৩৮ এ মানভূমের সদর দপ্তর পুরুলিয়ায় আনা হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে সিংভূমের সঙ্গে ধলভূমকে যুক্ত করা হয়।

ধলভূমকে সিংভূমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলেও ধলভূমের পূর্বপ্রান্ত (বর্তমান পশ্চিমবাংলার পড়িহাটি, গিধনী এবং গোপীবল্লভপুর হয়ে একেবারে ঝাড়খন্ড লাগোয়া অংশটি মেদনীপুর জেলাতেই থেকে গেল। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে মানভূমকে তিন টুকরো করে দেওয়া হয়। বাংলাভাষী জঙ্গলমহল বাংলা বিহারের

বিভিন্ন জেলায় অঙ্গীভূত করা হয়। ধলভূম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বৃহত্তর অংশ বিহারের (অধুনা ঝাড়খন্ডের) সিংভূম জেলার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এবং ক্ষুদ্রতর অংশটা বাংলার মেদনীপুর জেলার সঙ্গে মিশে গেছে। পাঁচপরগণা (বুন্ডু, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু ও রাঁচি) রাঁচি জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। জঙ্গলমহলগুলোর অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে মানভূম জেলা গড়ে উঠেছে। ঝাড় গ্রাম নয়াবসান, কল্যাণপুর, জামবনী, লালগড়, রামগড়, ঝাঁটিবনী আদি নিয়ে গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর (২০০২, ১লা জানুয়ারী পশ্চিম মেদিনীপুর) জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা।

সারেঙ্গা, রাইপুর, সুপুর, অম্বিকা নগর, সিমলাপাল, ফুলকুশমা, ভঞ্জভূম, কুইলাপাল, ছাতনা, আদিমহল নিয়ে গড়ে উঠেছে বাঁকুড়া জেলা। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে মানভূম ভেঙ্গে তিন টুকরো করা হল বাংলা ভাষী অঞ্চল সত্ত্বেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ধানবাদকে বিহারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। (২০০০ খ্রীস্টাব্দে ঝাড়খন্ড রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়) কাতরাস, ঝরিয়া, আদিমহল এবং সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সরাইকেলা, তোড়াং, পাতকুল এবং ধলভূম মহকুমার সঙ্গে চান্ডিল, পটমদা এবম মধ্য অংশ নাম। ১৯৫৬ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর একুশটি থানার ষোলোটি থানা পুরুলিয়া জেলা নামে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়। যার মধ্যে রইল বরাভূম (বরাবাজার) পাঞ্চেত, ঝালদা, বাঘমুন্ডি, বাগনকোদর, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, মানভূম (মানবাজার), কাশিপুর প্রভৃতি আদিমহলগুলো। ঝাড়খন্ড এবং জঙ্গলমহল আগে থেকেই লুপ্ত হয়েছিল এখন মানভূমও মুছে গেল। মানভূমের বাংলাভাষী ধলভূম বিরাট শিল্পাঞ্চল নিয়ে আগের মত সিংভূম জেলার মহকুমা হিসাবেই থেকে গেল। পাঁচপরগণা রাঁচির সঙ্গে যুক্ত হল।

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষা অঞ্চল বলতে আমরা ঝাড়খন্ডের রাঁচি জেলার বুন্ডু, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু, আদি পাঁচপরগণা, ধানবাদ জেলা, পূর্বসিংভূম এবং পশ্চিম সিংভূম জেলা পশ্চিমবাংলার (পুরুলিয়া জেলার) সমস্ত জঙ্গলমহল পাঞ্চেত, কাশীপুর, বাঘমুন্ডি, বাগানকোদর, তরফ, বালিয়াপার, কাতরাস, হেসলা, ইলু, ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, চুটি, তোড়াং, টুন্ডি, নাগরকিয়ারী, পাতকুম, মানবাজার, বরাবাজার, বাঁকুড়া জেলার

— ছাতনা, ভঙ্গভূম, সুপুর, সামন্তভূম, অম্বিকা নগর, খাতড়া, কুইলাপাল, সিমলাপাল, ডালাইডিহা, রাইপুর (তুঙ্গভূম), সারেঙ্গা, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা আদি সীমন্তবর্তী জঙ্গ লমহল সমূহ এবং পশ্চিম মেদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত, ঝাড়গ্রাম, নয়াবসান, দইজুড়ি, লালগড়, পিড়াকাটা, রামগড়, হুমগড়, পাথরপাড়া, শিলদা, জামবণী, বেলপাহাড়ী, আদি জঙ্গলমহল সমূহ।

অনুচ্চ শৈলশ্রেণী পরিবেষ্টিত, উচ্চাবচ-তরঙ্গায়িত ভূমিতল, রুক্ষ অনুর্বর কঙ্করময় ভূখন্ড ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী অঞ্চল। জঙ্গলময় এই ভূখন্ড অজলা ও অফলা। এখানে সেখানে মহুয়া, শাল, পলাশ, কেঁদ-এর বর্ণময় সৌন্দর্য। সমতলভূমি খুবই কম। স্থানে স্থানে ছোটো বড়ো মাঝারি টিলা। ভূমিখন্ডের প্রায় সব জায়গায় ডাঙ্গা-ডহর, তড়া টাঁইড়-টিকর, বৃক্ষহীন কঠিন প্রস্তরময় পাহাড়-পর্বত ডুংরীতে ভরা। কোথাও কোথাও বেলে পাথর, কোথাও বা শ্লেট পাথরের ভাঁজ। আর স্থানে স্থানে বালিযুক্ত কাদামাটি। ডুংরী-দাড়াংকে ভেদ করে কোথাও কোথাও নদ-নদী বয়ে চলেছে। দুই ভিন্ন ঋতুতে সেগুলির ভিন্ন রূপ — বর্ষাকালে দুকুল ছাপিয়ে স্রোত সব কিছুকে প্লাবিত করে চলে আর গ্রীষ্মকালে সেগুলি শুকিয়ে থাকে। শুধুই বালি আর বালি — বক্রেশ্বর কোপাই, দ্বারকেশ্বর, জয়পন্ডা, অড়কষা, তারাফেণী, ভৈরববাঁকী, শিলাবতী, কংসাবতী, কুমারী, জাম-টটক-দুয়াসিনী সুবর্ণরেখা। এগুলির উৎসস্থল রাজমহল পাহাড় সন্নিহিত ছোটনাগপুর মালভূমি। অপরাপর নদীগুলির উৎস কোনো পাহাড় অথবা বড় নদীর উপনদী বা শাখানদী। নদীগুলির গভীরতা নিতান্তই অল্প। প্রতি বছরই বিস্তীর্ণ অঞ্চল বানভাসি হয়।

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে 'ডুংরি-দাড়াং-দুংরা', বন-জঙ্গলে বিচিত্র ধরণের গাছগাছালির সমারোহ কোথাও শাল-সেগুন, পিয়াল, অর্জুন, হরিতকী, বহড়া, ভুড়রু, পলাশ, মহুয়া, ভালাই, চাকলতার জঙ্গল। কোথাও আঁকুড়া বহড়া শেওড়া, বাবলা শিরিষ, মহুয়া, চল্লা, ঝাঁটি কুটুসের (পুটুস) ঝোপঝাড়। কোথাও বনখেজুর, শেঁয়াকুল-জিডুল, লতার, সুরগঁজা, বাঘনখি, ভাবরি শর, কাসি, শম্বর প্রভৃতি গাছের বাহার। এক সময় সমগ্র ভূখন্ডটিই ছিল জঙ্গলে ভর্তি। ধীরে ধীরে বন-জঙ্গল কেটে গ্রাম বসেছে। শালবনি,

ডালাইডিহা, সরডিহা, মহুলবনি, আসনবনি, জামবনি, শালডিহা, ডুমুরিয়া, জামডহরা, নিমডিহা, মুঢ়াবনি প্রভৃতি গ্রাম নাম সেই সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে।

রুক্ষ, শুষ্ক মাটির মতোই ঝাড়খন্ডী অঞ্চলের পরিবেশ রুক্ষ, কঠিন, বর্ষা ও শীতের দিনগুলি বাদ দিলে প্রায় সারা বছরেই বয়ে চলে গরম বাতাস আর গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে জ্বলতে থাকে বন-বাদাড়, মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে এখানকার মানুষদের চলতে হয়। ভূমি অসমতল কাঁকুলে হওয়ায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বড়ো কম। আবার কৃষিও নির্ভরশীল প্রকৃতির বাদান্যতায়। তাই এই অঞ্চলকে অরণ্যভূমি নামেও চিহ্নিত করা যায়। জঙ্গল আর পাহাড় এই অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বাঁকুড়ার উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্বে দন্ডায়মান প্রহরীর মত শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড়। এছাড়া এই জেলায় আছে মেজিয়া, কোরা ও মাসাকারা পাহাড়। পুরুলিয়ার বিখ্যাত অযোধ্যা পাহাড় চাঁসাই ও সুবর্ণরেখার মধ্যে জল বিভাজিকার ভূমিকা পালন করছে। ——— ছড়িয়ে থাকা বাগমন্ডি, পাঞ্চেৎ, ঘোড়ামারা পাহাড়, দলমা পাহাড়, গোঞ্জা পাহাড়, গুকুই পাহাড়, গোরগাবুড়ি, কর্মা কাদালি আর খৈরপাহাড়ি জেলাটির অতিরিক্ত সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।[৭]

"ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠী নিগ্রোবটু এরপর প্রটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর কথাই প্রাগৈতিক যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের শারীরিক গঠনের সঙ্গে এদের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় বলে নৃবিজ্ঞানীগণ এদের আদি অস্ট্রালয়েড নামে চিহ্নিত করেছেন। ড. বিরজাশঙ্কর গুহর মতে, এদের পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ ভারত থেকে সিংহল ও মালয়েশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল"।[৮] আর্যদের আগমণের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে প্রটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। আদি-অস্ট্রালড বা নিষাদ গোষ্ঠীর আদি বাসভূমি ঠিক কোথায় ছিল এই নিয়ে পরিমল হেম্‌ব্রম বলেছেন — "ভারতের আদিবাসী যাদের Pre-Dravidian, আদি অস্ট্রালয়েড (Proto Australoid) 'অস্ট্রালয়েড বেদ্দাইক' (Austric-Veddaic) এবং বেদ্দিক (Veddic) নামে চিহ্নিত করেছেন এবং উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী — এরা একই মানবগোষ্ঠী জাত"।[৯]

ড. রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতে, ''এই আদিবাসী গোষ্ঠীরাই ঋকবেদে 'পাঞ্চজন্য' অর্থাৎ 'নিষাদ' নামে বর্ণিত হয়েছে। 'নিষাদ' গোষ্ঠীর মানুষজনেরা পুরাকালে মুন্ডারী ভাষাগোষ্ঠী অর্থাৎ অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিল''।[১০] সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রকৃত আদিম অধিবাসীরা হলেন 'প্রটো-অস্ট্রালয়েড' নরগোষ্ঠীর মানুষ। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলেন তাকে 'অস্ট্রিক' ভাষা বলা হয়। একদা এই ভাষার বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। প্রাক আর্য ভারতের মাটিতে যে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা 'অস্ট্রিক সভ্যতা'। ভাবতে অবাক লাগে আজও এই ভাষার অস্তিত্ব ভারতের মাটিতে টিকে আছে; হারিয়ে যায়নি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় — ''ভারতীয় ভাষাবিদরা জানাচ্ছেন, ভারতে এই অস্ট্রিক ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে 'মুন্ডারী' ভাষা,[১১] বাংলা তথা ভারতের আদিম অধিবাসীরা হলেন, সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, মাহালি, লোধা, শবর, কোড়া প্রভৃতি অস্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত মানুষজন।[১২] 'Austirc অস্ট্রিক অর্থাৎ দক্ষিণ দেশীয় বা দক্ষিণ (লাতীন Auster আউস্তের = 'দক্ষিণ প্রান্ত' হইতে এই শব্দ উদ্ভূত)[১৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরো বলেছেন — ''প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ জাতীয় জনগণ আর্য্যদের দ্বারা নিষাদ নামে অভিহিত হইত। এখন দক্ষিণ বা নিষাদ গোষ্ঠীর কতকগুলি ভাষা অখ্যাত ও অবজ্ঞাত হইয়া মধ্য ভারতে ও পূর্ব ভারতের কোনও কোনও স্থানে কোন করমে টিকিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় দক্ষিণ ভাষাগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে (১) Kol কোল বা Munda মুন্ডা শ্রেণী, ইহাতে আসে সাঁওতালী। বিহার প্রদেশ — বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগণা, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ এবং আসাম এই সমস্ত স্থানে সাঁওতালীদের বাস; ইহাদের আদি ভূমি হইতেছে বিহারে; উত্তরবঙ্গে ও আসামে মজুরিগিরি করিবার জন্য দলে দলে গিয়া ইহারা বাস করিতেছে); মুন্ডারী, রাঁচী ইহার কেন্দ্র, হো এতদ্ভিন্ন ভূমিজ প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা এই তিনটির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত; এছাড়া খাড়িয়া, কোরকু, জুয়াং শবর বা শোরা, গদব; Khasi খাসি বা খাসিয়া, আসাম প্রদেশে খাসিয়া পাহাড়ে প্রচলিত এবং নিকোবারী''।[১৪] শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাসকে বলেছেন — ''আর্যরা এদেশে অনার্য গোষ্ঠীগুলিকে দাস, দস্যু, অসুর বলে অভিহিত

করত। ঋগ্বেদ সংহিতার — "বিজানীহি আর্য্যান যে চ দস্যবঃ", "অয়মেতি বিচাকদ বিচিন্বন দাস আর্য্যাম" ইত্যাদি কথা থেকে স্পষ্ট জানা যায়। খেরওয়াল বা খেরওয়ালরা এরই প্রতিবাদে নিজেদের 'হড়' অর্থাৎ মানুষ বলে পরিচয় দিতে শুরু করেছিল এবং আজ পর্যন্ত তারা নিজেদের ঐ নামেই পরিচয় দিয়ে আসছে। পরবর্তীকালে খেরওয়াল গোষ্ঠী নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। খেরওয়াল গোষ্ঠী তখন কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল তা বলা শক্ত। তবে, এখন ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরে বিচার করলে দেখা যায়, এগুলি এক সময় খেরওয়াল জনসমাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল (১) অসুর (২) মুন্ডা (৩) সাঁওতাল (৪) হো বা লাকড়া কোল (৫) বিরহড় (৬) খাড়িয়া বা খেড়িয়া (৭) শবর (৮) কোরওয়া (৯) কোড়া বা কোড (১০) করকু (১১) করমালী (১২) মাহালি (১৩) ভূমিজ (১৪) গদব (১৫) তুরি (১৬) কুড়মি (১৭) যুয়াং এইসব ভাষাগোষ্ঠী যখন আর্য আক্রমণে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল তখনই তারা আর্যদের দিকু বা বিদেশী আখ্যা দিয়েছিল বলে অনুমান হয়"।[১৫]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "রাঁচীর আশেপাশের কোল জাতীয়দের জন্য সীমিত এই নামকে ব্যাপক অর্থে আবশ্যকতা নাই। Kol 'কোল' এই নামটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারীরা 'কোল' বলিলে, দ্রাবিড় ভাষী ওরাওঁ, কন্ধ এবং মালপাহাড়িদের বাদ দিয়া মুন্ডা, হো, সাঁওতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোরকু প্রভৃতিদেরই বুঝে; কোলদের নাম হইতে ছোটনাগপুরের একটি অঞ্চলের নাম হইয়াছে 'কোলহান' অর্থাৎ কোলদেশ দেশ। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এই 'কোল' শব্দটি মধ্যযুগের ভারতীয় আর্যভাষার (প্রাকৃতের) 'কোল্ল' শব্দ হইতে উদ্ভূত। মধ্য ভারতের অরণ্য পর্বতবাসী অনার্য নিষাদগণকে এখন হইতে দেড় হাজার বছর আগে 'ভিল্ল' ও কোল্ল বলিয়া উল্লেখ করা হইত।[১৩] সুতরাং সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের একটা তালিকা পাওয়া যায় তা এইরকম কিরাত, কেশুর, কোঁচ, কোরঙ্গা, কোল, গোলা, চন্ডাল, চামার, চুনারি, চোদুল, ছতার, ডোম, দরজী, ধাজি, ধোপা, ধোয়ারা, দাস, পাইক, পাটনি, পালুই, বাইতি, বাগদি, বেরুলিয়া, বেহারা, ভাট, মাছুয়া,

মাঝি, মারহাটা, মান, শুঁড়ি, শালধি, শিউলি, হাড়ি।[১৬] সহজেই অনুমেয় পেশাগত কারণে খেরওয়াড় জনগোষ্ঠীর অংশ বিশেষকেই এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তরুণদেব ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন —

"ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রত্নাশ্ম সংগ্রহে মিঃ বল ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। ঝরিয়ার কয়লাখনি, গোবিন্দপুরের কাছে কুনকুনে গ্রাম, হাজারিবাগ জেলার বোকানো কয়লা খনি, বাঁকুড়া জেলার গোপীনাথপুর, বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ কয়লা খনি এবং উড়িষ্যার চেনকানল থেকে তিনি বহু প্রত্নশ্মর আয়ুধ সংগ্রহ করেছিলেন। ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ূধের জায়গাগুলি মানচিত্রের উপর সাজালে দেখা যায়; গঙ্গার দক্ষিণ তীর জুড়ে তাদের প্রাধান্য। এলাকাটি ছোটনাগপুর মালভূমির ভেতর। অধিবাসী বেশিরভাগ আদিবাসী কোমও উপজাতি"।[১৭]

আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত অরণ্য পর্বত সঙ্কুল উল্লিখিত বিস্তৃত ভূমিখন্ড বৃহত্তর অস্ট্রিক জনজাতীর পরিমন্ডল। আদিবাসী জনজাতীই আদিম জনজাতী। এই আদিম জনজাতির আবাসভূমি পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশ্বের প্রাচীনতম ভূমিরূপ বলে চিহ্নিত হয়েছে। বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ প্রভাতরঞ্জন সরকারের অভিমতটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে —

"আজকে আমরা পশ্চিমরাঢ়ে যে তরঙ্গায়িত রক্ত মৃত্তিকা দেখতে পাই — যে তরঙ্গ সামনের দিকে এগোতে এগোতে সুদূর নীলিমায় মিশে যায়, যে তরঙ্গ পশ্চাদ্দিকে পেছুতে পেছুতে কোন হারানো ঠিকানার ইঙ্গিত দিয়ে যায় — সেই তরঙ্গায়িত দেশ হল আমাদের রাঢ়ভূমি। ...পশ্চিম রাঢ় বলতে বুঝি (১) সাঁওতাল পরগণা, (২) বীরভূমের একাংশ, (৩) বর্ধমানের পশ্চিমাংশ, (৪) ইন্দাস থানা বাদে বাঁকুড়া জেলা, (৫) পুরুলিয়া জেলা, (৬) ধানবাদ জেলা, (৭) হাজারিবাগ জেলার (বর্তমান গিরিডি জেলা) কাসমার, পেটারওয়াড়, গোলাজিরিডি ও রামগড় প্রভৃতি এলাকা, (৮) রাঁচী জেলার সিন্নি, সোনাহাতু, বন্ডু, তামাড় থানা, (৯) সিংভূম জেলা (পূর্ব ও পশ্চিম), (১০) পশ্চিম মেদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা, সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ মহকুমা"।[১৮]

এই বিশাল এলাকাটিতে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়ের চূড়া, খাদ, ঢালু উপত্যকা, ঝর্ণা, ছোট ছোট নদী, বড় বড় পাথরের চাঁই এবং সারা পাহাড় জুড়ে সবুজ গাছ। সুবোধ বসুরায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

"মালদা, আড়ষা, পুরুলিয়া, বলরামপুর বাঘমুন্ডি থানা জুড়ে পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টিনন্দন পাহাড় অযোধ্যা। ইংরেজি L অক্ষরের মত আকৃতি, বিমান থেকে দেখলে মনে হবে কোন দৈত্য বুঝি একপাটি বুট জুতা খুলে রেখে গেছে। মাটি সরালে দেখা যাবে এই শিলাস্তর যুক্ত আছে উত্তরে হাজারিবাগ, পশ্চিমে রাঁচী, দক্ষিণে সিংভূমের মেঘ মালার শৃঙ্গে। আছে আরো অনেক শৃঙ্গ চেখটু, গজাবুরু, মাঠাবুরু, ট্রশুল, ডুংরী, পানিগাড়া, চন্দনপানি। সাঁওতালী শব্দ 'বুরু' অর্থে পাহাড় এবং দেবতা। ডুংরি, দ্রাবিড় শব্দ, অর্থ অনুচ্চ বিচ্ছিন্ন পাহাড়"।[১৯]

তথ্যসূত্র

১। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য : বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত : প্রথম বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৩।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত : ড° সুকুমার সেন : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৪৮।

৩। বাঙালীর ইতিহাস : (আদিপর্ব) নীহার রঞ্জন রায় : দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৩।

৪। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য : বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত : প্রথম বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৬।

৫। শ্রীশ্রী চৈতণ্যচরিতামৃত : স্বামী প্রভুপাদ : ভক্তিবেদান্ত ট্রাস্ট, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৮২।

৬। চৈতণ্য ভাগবত (প্রথম অধ্যায়) :

৭। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা : অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা : রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৩৩।

৮। Austric Civilization of India : N. Hembram : Nirmal Book

Agency, Kolkata 2004, Page-89-48।

৯। সাঁওতালী ভাষাচর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত : পরিমল হেমব্রম : নির্মল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৭।

১০। পাঞ্চজন্য : ড° রমাপ্রসাদ চন্দ্র : ফার্মা কে. এল এম. প্রাইভেট লিমিটিড, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-১৭।

১১। সাঁওতালী ভাষাচর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত : পরিমল হেমব্রম : নির্মল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৯।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৯।

১৩। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : ডি মেহরা রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৭।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

১৫। বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাকবৈদিক প্রভাব : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-২৬।

১৬। সাঁওতালী ভাষাচর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত : পরিমল হেমব্রম : নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৬৩।

১৭। পুরুলিয়ার ইতিহাস : তরুণদেব ভট্টাচার্য : লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৩।

১৮। সভ্যতার আদিবিন্দু : প্রভাতরঞ্জন সরকার : রাঢ়, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৩-৪।

১৯। অযোধ্যা : সুবোধ বসুরায় : ছত্রাক, পুরুলিয়া, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার গঠন তত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্ব

ঝাড়খন্ডী বাংলা ঝা. বা-এর স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জণ ধ্বনিগুলি মান্য বা শিষ্ট চলিত বাংলার অনুরূপ। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে (ঝা. বা)এর উচ্চারণ মধ্যবাংলা এবং ওড়িয়া ধ্বনির মত।

	Back (পশ্চাৎ)	Central (কেন্দ্রীয়)	Front (সম্মুখ)
Close (সংবৃত)	u (উ) ũ (উঁ)		i ই ĩ (ইঁ)
Half-close অর্ধ সংবৃত	o (ও) õ (ওঁ)		e (এ) ẽ (এঁ)
Half-open অর্ধ বিবৃত	ɔ (অ) ɔ̃ অঁ		ɛ (এ্যা) ɛ̃ (এ্যাঁ)
Open বিবৃত	ã (আঁ)	আ	

১

ড. সুধীরকুমার-এর মতে "From the above chart it is clear that the vowel sounds of SWB (ঝা.বা) and SB do not vary generally except in the case of the front vowel 'ɛ' which is not to be found in the SB which has 'æ' instead of 'ɛ' this half open front vowel; intermediat

between 'e' and 'æ' is found in East Bengal and in etereme West Bengal also. The sound 'æ' is through not common is SWB (ঝ.বা) yet, it can be found in certain cases and in the pronunciation of a few educated people".[২] যে সমস্ত পরিবেশে 'ɛ' উচ্চারিত হয় সেগুলিকে তিনি উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন যেমন — কেশব (Kɛʃ⊃b); পেশা (Pɛʃa); কেদার (Kɛdar); গজেন (G⊃jɛn); কেনে (Kɛnɛ); কেবল (Kɛb⊃l); খেলা (Kʰɛla); এগারো (ɛgaro); গেলা (gɛla); এক (ɛk) -এ ‘এ’-র উচ্চারণ 'e' হলেক এগারোতে এ-র উচ্চারণ 'ɛ' প্রসঙ্গত সুধীরকুমার করণ লিখেছেন —

"East Bengal has only 'e' sound but S.W.B. has 'ɛ' and 'e' both, when an initial 'e' wil be pronounced as 'e' or 'ɛ' that depends upon the speaker".[৩] S.W.B. (G) তে 'æ' এর উচ্চারণ প্রসঙ্গে ঝন্দা ঘোষাল জানিয়েছেন অ্যা 'æ' -র ব্যবহার (উচ্চারণ) S.W.B. (G) তে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব উচ্চারণেই আছে। যেমন কঁ্যাদা (Kæ̃da) (গ্রন্থিকান্ড); ক্যাচরা (Kæcra); (প্যাচপ্যাচে) কঁ্যাড়্রাইট (Kæ̃draite) (খোঁচাচ্ছে); খঁ্যাতনা (ভেংচিকাটা) Kʰæ̃tna, অ্যাঁগরা (আগুন) গ্যানস্য (নোংরা); গঁ্যাড (গুলগল্প); চ্যাঙচেঙ্গিয়া (ঝকঝকে); চঁ্যাক্ণা (ছঁ্যাকা দেওয়া) প্রভৃতি শব্দ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মৌখিক উচ্চারণে পাওয়া যায়।[৪]

'ɛ' এবং 'æ' ধ্বনির উচ্চারণ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত — The M.I.A. vowel (e) in initial syllables become open in Middle Bengali (ɛ), and possibly also in old Bengali cf-dekkhai > দেখই dēkhai, dekh⊃i > দেখএ, দেখে (dɛkh⊃ẽ, dɛkhɛ) > দেখে, দ্যাখে (dækhe) ekka > ēka (e:k⊃) > (ɛ:k⊃) > æ : k) and – yā – after a consonant, in tatsamas; become (ea: ɛa:), later (æ) in new Bengali tyāga > তেয়াগ (tɛa:g⊃; tɛẽa:g⊃) > (tæ:g) Post consonants– ā in tatsamas similarly

become (ŏa : > ə⊃ > ə:) see later, under 'the oirgin of the new Bengali vowels : (ə). In connection with (i) in early Middle Bengali, the back – ā – (a:, a) received a frontal articulation also later, under 'Vowel Mutation, and the origin of New Bengali Nasalisation of the vowels was fully developed, also vowel – harmony come in quite early in the history of Bengali as a N.I.A..[৫]

আবার 'ɛ' নয়, এ ভাষার স্বরধ্বনিগত আরও বিশেষত্ব — 'ও' এবং 'অ'-র মাঝামাঝি 'ও' (যাকে আমরা U দিয়ে চিহ্নিত করছি) ধ্বনির অস্তিত্বে। যেমন এ্যাগারো (ɛgaru), যৌল (SoUlU), ঘরে (GhUre), হবে (hUbe) কভে (KUb^ho) এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

The change of ai < aï and au < aü to an open è =(ɛ) and open ò=å(⊃), is not a characteristic of the Eastern 'outer' speeches, although it is found in Rājasthānī-Gujarātī, Sindhī, Lahndī, and other western 'outer' dialects. It is also a noteworth characteristic of modern western Hindī as well. So much so that at the present day the English sounds of (æ) (as in man, which is a rather low kind of (ɛ) and of (ə) (as in hot), ...cf. Kahi > Kai > (Kɛ:) > Kē, Kahu > Kau > (Kə) > Kō ; ai, au < ai, au – are ordinate pronounced with low tongue position in the western Hindi homeland hai-sounding as (ɦɛĕ, (ɦɛ:) or even as ((ɦæ) aur as (ʌŏr, əŏr, ə:r)

ঔ au in tatsama words = āu of Sanskrit, is pronounced ou in Bengali, much like the Southern English O in joke (djoŭk) and of course, in tadvaba words, āu of Srt. occurs as ō.[৬]

তাই এই ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির সারণি হবে নিম্নরূপ ঃ

	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
সংবৃত	ই (i) ইঁ (i)		ই (u) উঁ (ũ)
অর্ধ সংবৃত	এ (e) এঁ (ẽ)		ও (O) ওঁ (Õ)
অর্ধ বিবৃত	এ্যা (ɛ) এ্যাঁ (ɛ̃)		ও (U) ওঁ (Ũ)
	অ্যা (æ) অ্যাঁ (æ̃)		অ (⊃) অঁ (⊃̃)
বিবৃত		আ (a) আঁ (ã)	

ই (ĩ)	উ্ (Ũ)	
এ্ (য়ু / ẽ)	ও্ (Õ)	অ্ (Ũ)

অর্ধস্বরের সারণি ঃ

এ ভাষায় ও (Õ) এর উচ্চারণ বিস্বন হিসেবে অ (Ũ) হয়ে যায়। অর্থাৎ ও উচ্চারণের সময় ঠোঁট দুটি যত গোল হয় অ (Ũ) এর উচ্চারণের সময় ঠোঁট দুটি ততোটা গোল হয় না। আবার অ (Ũ) এর উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা যে উচ্চতায় থাকে অর্ধ 'অ' উচ্চারণের সময়েও জিহ্বা খিট ততোটাই উচ্চতায় থাকে।

স্বরধ্বনি ঃ 'অ' মান্য চলিতে 'অ' এর উচ্চারণ দুরকমের আছে ⊃ (স্বাভাবিক) এবং O পরিবর্তিত। যেমন অক্ষর (⊃khār) অন্ধ (⊃ndo) অম্বুজ (⊃mbuj) কিন্তু স্বরসঙ্গতি বা স্বরের উচ্চতায় দু ধরনের উচ্চারণ আছে —

	মান্যচলিত বাংলা	ঝাড়খন্ডী বাংলা
ও — অ	ওঁচা	অঁছা ⊃̃cha
	কোনা	কণা k⊃na
	কোন	কন K⊃n
	সোম	সম S⊃m
	পোকা	পকা p⊃ka

	মান্যচলিত বাংলা	ঝাড়খন্ডী বাংলা
অ — ও	অনুকূল	ওণকূল Onkul
	অপূর্ব	ওপরুগ
	সকল	সোকল
	সংসার	সোম্‌সার

সুতরাং যেখানে 'অ' এর পরিবর্তিত উচ্চারণ (মা.চ) ঝাড়খন্ডীতে সেখানে 'অ' এর স্বাভাবিক উচ্চারণ। আবার সেখানে মান্যচলিতে 'অ' এর স্বাভাবিক উচ্চারণ ঝাড়খন্ডীতে সেখানে পরিবর্তিত উচ্চারণ। মান্যচলিত যেখানে দীর্ঘস্বর 'আ' ঝাড়খন্ডীতে সেখানে হ্রস্বস্বর 'অ' উচ্চারিত হয়।

আ — আ	আড়াল	অড়াল (ছেইলাটা আমার অড়ালে আছে)
	আছাড়	অছাড় (জ্বালাইস না এমন অছাড় দুব না)
	আঁধার	অঁধরা (অঁধার রাইতে জ্বালাইস বাতি)

অ-এর আনুনাসিক উচ্চারণ ঃ

S.B.	S.W.B. (G)
কহি (বলি)	কই (K⊃h⊃̃)
কাইছি (বলছি)	কহটঁ (K⊃ht⊃̃)

আ-ঝাড়খণ্ডীতে 'আ' এর উচ্চারণ হ্রস্ব; তবে 'আ' কখনা শব্দের শেষে উচ্চারণ করার সময় দীর্ঘ হয়। যেমন — আঁড়িয়া > এঁড়ে > আঁঢ়রা (কর্কশ) 'আ' এর হ্রস্ব উচ্চারণ আঁইখ (চোখ), আঘু (আগে), আউলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের— "বাঁশীর শবদে মো আউলাইল রন্ধন"), আউজা (হেলাপড়া)

আবার মান্য চলিতের হ্রস্ব 'অ' ঝাড়খণ্ডীতে কোথাও কোথাও দীর্ঘ স্বরে 'আ' তে পরিণত হয়েছে যেমন —

মা. চ.	শব্দ		ঝাড়খণ্ডী
"	আমিত্ব	>	অমিতা
"	অরক্ষিত	>	অর্খিতা

'ই' ঝাড়খণ্ডীতে সাধারণত হ্রস্ব ভাবে উচ্চারিত হয়, তবে এর বিপরীত যে দেখা যায় না এমনটা নয় —

হ্রস্ব - 'ই' ইজির বিজির (হিজিবিজি)

ইকিড় মিকিড় (ঝিলমিল)

ইড়িং বিড়িং (এলোমেলো)

ইগির জিগির (জিগির)

ইতু < ইতি — (শষ্য রক্ষা করার অনুষ্ঠান)

দীর্ঘ 'ই' উদুর্‌খুলা < উদর কূট (লক্ষ্মীছাড়া) ল + ই (ঈ)

উধুম্ ধুম্যা (লক্ষ্মীছাড়া) ল + ই (ঈ)

উরুল ঝুরুল (এলোমেলো) ল + ই (ঈ)

উণকা < ঊণকা = ফাউ

উপরোধ = অনুরোধ

উভোল = মিন্ত্রণের সুপারি

উ — ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষার মধ্যে 'উ' এর হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। তবে বিস্বনরূপে উ দীর্ঘত্বও লাভ করতে পারে —

'উ'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ

উদুলকুসুল (উসখুস) → দ + উ (ঊ)

উরুলঝুরুল (এলোমেলো) + র + উ (ঊ)

উ (ঊ) সঁত (আশাবাদী)

উলুকপাত (উল্কাপাত)

'উ' এর হ্রস্ব উচ্চারণ —

উলা (গরুর গাড়ির বেলনের মধ্যেকার ছিদ্রে লৌহবেষ্টনী)

উলখি (উলকি)

উসং < আশ্বস্ত (উচ্ছসিত)

উমর (বয়স)

উজাড় (ফসল নষ্ট করা)

উজাড়িয়া (দৈনিক মজুর)

উঢ়া (পায়ে দেওয়া)

উঘা (তুল)

উছাল, উছাড় < উৎশাল = বমি

উট্‌কে (ওখানে)

উটুপুটু (চঞ্চল)

উদনী < উদ্দাম (মা বিটি উদনি পিঠে পুড়ে ফুদনী)

উদাম < উদ্দাম (শাসনহীন)

উফাল < উৎলম্ফ (লাফ)

'এ' — মান্য বা শিষ্ট চলিতের মতোই 'এ' এর স্বাভাবিক উচ্চারণ ঝা.বা ভাষায় ঃ

এঁড়লি (চৌকঠের তলার ভাগ)

এংলা < উলগা < উৎগল (উচ্ছিষ্ট)

এক নিল্লা (খাঁটি)

এক মস্তে (একসাথে)

এঁকের পেঁকের (নড়বড়ে)

এড়ি (গোড়ালি)

এড়েং বেড়েং (বিশৃঙ্খল)

এবড়া খেবড়া (অসমতল)

এলগাঁ (উদ্দিষ্ট)

এঁড় < অন্ড (লিঙ্গ)

এ (হে)

এক, এটকে (এদিকে)

এঞ্জেনি (তক্ষক)

এ্যা (ɛ) — ঝাড়খন্ডীতে এ্যা (ɛ) এর উচ্চারণ রক্ষিত হয়েছে। যেমন — Kɛdar কেদার, দেদার dɛdar, সীতা Sɛta, গীতা Gɛta, খেলা Khɛla, মেলা Mɛla, চেলা Chɛla ইত্যাদি।

'অ্যা' (æ) — মান্য চলিতের মতই 'অ্যা' (æ) এর উচ্চারণ দেখা যায় যেমন — কঁ্যাদা Kændā, ক্যাচরা Kæra, অ্যাঁগরা ængra.

'ও' — 'অ' এর পরিবর্তিত উচ্চারণ রূপে 'ও' এর উচ্চারণ ছাড়াও 'ও' এর নিজস্ব উচ্চারণ ঝাড়খন্ডী বাংলায় আছে। যেমন — ওখনু (মাগনা), ওঙ্গিয়া (জেদী), কোড় (কোল), জোহো (উদ্যোহ), নোক (লোক), ঘোঁচা (ঘন), ফোসোয়া (নালীগর্ত)। আবার ঝাড়খন্ডী বাংলাভায়ায় 'ও' এর পরিবর্তিত উচ্চারণ অ (–) উচ্চারণ হয় (ও → অ)।

মান্যচলিত	S.W.B.(G) ঝাড়খন্ডী বাংলা
ঘোড়া	ঘড়া
গোলাপ	গলাব
ফোঁড়া	ফঁড়া
রোগা	রগা
খোঁচ্	খঁচ্

এ প্রসঙ্গে সুধীরকুমার করণ বলেছেন — Generally it may be concluded that the dissylabic words with initial 'o' and final 'ā' changed the initial 'O' to 'a' (ɔ) ...thus it shows that S.W.B.(G) has not preserved the O.I.A. 'O' before single consonat. But there are some exceptions also.[৭]

আবার কোন কোন শব্দের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাতের হলে 'ও'-'উ' তে পরিণত হয়। যেমন — 'ও' → 'উ' — গোঁসাই (মা.চ) → গুঁসাই (ঝা.বা), রোয়া > রুয়া (ঝা.বা) সোরু > সুরু, পোঁতা > পুঁতা।

'ঔ' (ওউ্) কখনো কখনো 'ও' উচ্চারিত হয়। যেমন — কেউ > কোউ, (এ → ও) ও (U) → S.W.B.(G) ঝাড়খণ্ডীতে 'অ' এবং 'ও'এর মাঝামাঝি ও (U)-র উচ্চারণ হয়। যা মান্যচলিতের ক্ষেত্রে হয় না। যেমন যোল্ SoulU, এগার EgarU, হবে hUbe ।

দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর (Dipthong) ঝাড়খন্ডী বাংলাতে যৌগিক স্বর 'ওউ্'-র ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা হয়। 'ওই' স্থানেও 'ওউ' উচ্চারিত হয় যেমন —

মান্যচলিত	ঝাড়খন্ডী
'ওই' স্থানে	ওউ্ঠ/ওউ্ঠি
ওই	ওউ্
ওইগুলি	ওউ্গা
ওই/ওটা	ওই্টা

আলাদাভাবে ‘ওই’-র উচ্চারণ না থাকলে অন্য ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঝাড়খন্ডী বাংলাতে উচ্চারিত হয়। যেমন খৈ, মৈ, চৈ, বৈ, বৈতাল (boital), বৈকাল (boikal)। ‘ওউ্’ এর নিজস্ব ব্যবহার— নৌটুনি (noutuni)→ খুন্তি। নৌটি (nouti), নৌটানা (noutana) → ওল্টানো, সৌতুন (সতীন) < ‘সৌতন’ (Soutun) হিন্দি ।

অন্যান্য দ্বিস্বর ঃ আমাদের অনুসন্ধানে আরো কিছু দ্বিস্বর ধ্বনির অস্তিত্ব ঝা.বা-তে ধরা পড়েছে —

অয়্ (অয়) → জয়, খয় (ক্ষয়), হয়, ভয়, টয়

অও্ → দঅও, বহ্ও, কহ্ও, চলহ্ও, জলহ্ও

আঅ্ (aŬ) → খুয়াঅ্ (খাওয়াও) পঢ়াঅ্

আই → ঘাই, জাই, মাই, থাই, চাই, বাই

আএ্ (আয়) → চরাই, বিহাই, মিআয়।

আউ্ → জাউ, খাউ, > খুয়াউ

আও, আওঁ → গাও, জাওয়া, খুয়াওঁ, কহিথাওঁ

উই → দুই, ধুই, কুই, ঠুই, চুই

এই → ভেনেই, অদ্রের, তরেই, হোইটা, তেইটা

এউ্ → নেউদা (নিন্দা করা) বেউরা (খবর) চাউরা, ছাউরা

অ্যায় → নেয় (næ ĕ) দেয় (dæ ĕ), চায়, ছায়, মায় (মাকে)

আঁই → রাঁইত (রাত), কাঁইত (কাত)

আঁউ → মাউকাস, হাঁউসী (মজার)

আঁএ্ → ঠাঁয়া (নিকটে)

‘ঋ ’৯ → ঝাড়খন্ডীতে ঋ, ৯ এর উচ্চারণ নেই। মান্য চলিতের মতোই তবে ঋ-এর ওড়িয়া প্রভাবিত ‘রু’ উচ্চারণ হয় যেমন — অমৃত > অম্রুত; তবে শব্দের আদিতে ‘ঋ’-এর উচ্চারণ নেই। ‘ঋ’—‘রি’ রূপেই উচ্চারিত হয়। (ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ব্যবহৃত হয়)

নাসিক্যধ্বনি ঃ ঝাড়খন্ডী বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরধ্বনিরই আনুনাসিক রূপ লক্ষ্য করা যায়।

স্বত নাসিক্য ঃ

অঁ → অঁটা (কোমর), কঁকা (বোবা), অঁজরা (আবর্জনা/ নোংরা), অঁড় < অন্ডক কোমর

আঁ → আঁঢ়রা (কর্কশ)

ইঁ → হঁঝল্ < উজ্জ্বল, ইঁদ < ইন্দ্র, ইঁধে (মধ্যে) (মি.ঝা)

উঁ → উঁধি (ডুমকা পিঠার জন্য উপরে বসানো হাঁড়ি), উঁআকে (ওকে), উঁদুর (ইঁদুর)

এঁ → এঁড়ে, এঁড়ো (গিরগিটি), এঁড়রি (চৌকাঠের তলার অংশ)

এ্যাঁ (ɛ) এ্যাঁড়েং ব্যাঁড়েং (ɛ̃rang Bɛ̃rang) এ্যাঁংলা (ɛ̃ngla)

অ্যাঁ → ছ্যাকনা, ঠ্যাকনা

নাসিক্যভবনজাত আনুনাসিকতা ঃ ঙ, ঞ, ন্, ম্, ণ (ড়ঁ) — এই নাসিক্য ধ্বনিগুলি পূর্বে থাকার (শব্দের মধ্যে) পরবর্তী ধ্বনিগুলি (মৌলিক) ঝ.বাং আনুনাসিক হয়ে যায় এবং পরের নাসিক্য ব্যঞ্জণ লুপ্ত হয়।

এককভাবে 'ঞ' এর কোন ব্যবহার বাঙলায় নেই, সাধারণত 'চ' বর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন চঞ্চল = চন্চল, বাঞ্ছা = বানছা, যাচ্ঞা = যাচনা 'জ্ঞ' 'জ+ঞ' — এই উভয় ধ্বনিই বাঙলায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কিন্তু গগঁ, গ্যঁ।[৭]

অঁ → অঁধরা < অন্ধকার, অঁছা < অবাঞ্ছিত, অঁচাল (আঁচল), অঁজরা (আবর্জনা)

আঁ → অঞ্জলি > আঁজুলা, অঙ্গিকা > আঙ্গিকা > আঁগা, অস্থিতা > আঁছিতা

ইঁ → মিশ্রণ > মিঁস, পিঁধা > পিন্ধ্যা (ম.বা.) বিঁদ < বিন্দু, হিংসা > হিঁসা,

উঁ → কঁচি < কুঞ্চিকা, গুঁড় < গন্ড (বলশালী), উঁচা < উঁচু

এঁ → এঁকড়া < একোড়, এঁড়রা < ইঁড়রা (টেরাচোখে চাওয়া) ডে.

এ্যাঁ (ɛ) → ডেঁহগা (dɛ̃hga) < ডিঙ্গা

ওঁ → ভন্ডুল > ভোঁড়োর

Ũ → ভেন্ডি > ভোঁড়ো (bhŨro)

আনুনাসিকহীনতা ঃ নাসিক্য ধ্বনি থাকা সত্ত্বেও ঝাড়খন্ডী ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি (নাসিক্য স্বরের লোপ) অনেক ক্ষেত্রে আনুনাসিক হয় না। যেমন—

অ → মন্ত্র > মন্তর, পনখি (বাঁটি)

আ → ভানজি < ভাগ্নী, বানছা < বাঞ্ছা

ই → সিবঙ্গা (খোঁড়া), ফিঙফিঙিয়া (পাতলা)

উ → ভুসঙ্গা, মুন্ড > মুড, উনি > উঃ

এ → ভেলেই < ভগ্নীপতি

অ্যা → ছ্যানছেনিয়া, ভ্যালাই, অ্যাড়চোইখা

ও → নির্মল > নিবোল, ওণুকূল < অনুকূল

আবার মান্য চলিত বাংলায় যে সকল শব্দে মৌলিক স্বরধ্বনি স্বাভাবতই আনুনাসিকভাবে উচ্চারিত হয়; সেই সমস্ত শব্দের মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি ঝাড়খন্ডী বাংলার উচ্চারণে আনুনাসিক থেকেই যায় —

মধ্যভারতীয় আর্য		মান্যচলিত		ঝাড়খন্ডী
কক্ষ	>	কাঁখ	>	কাঁখ
প্রোথিত	>	পুতা	>	পোঁতা
করকঠিকা	>	কাঁকুড়	>	কাঁকুড়
ইষ্টক	>	ইঁট	>	ইঁট
—	>	ছাঁদনা	>	ছাঁমড়া
—	>	খুঁটে	>	ঘুঁইটা
—	>	আঁকপাঁক (হাঁকপাক)	>	আঁকপাঁক

মৌলিক স্বরধ্বনির আনুনাসিকতা সম্পর্কে ড. সুধীরকুমার করণ বলেছেন — In S.W.B. however, a vowel is not nasalised if the nasal consonant precedes. Thus 'Mā̃' is pronounced as mā-ā; nā̃c > nāc etc. But 'nā' and 'ni' are exceptionals which are never na-ā or ni-i 'na' and 'ni' which are pronounced as nā and nĩ.[৮]

আবার মান্য চলিতে যে সমস্ত শব্দে স্বরধ্বনিগুলি আনুনাসিক ঝাড়খন্ডী বাংলাতে সেই সমস্ত শব্দে সেগুলি আনুনাসিক। এবং ব্যঞ্জন বর্ণের লোপের ফলে কখনও কখনো তাদের সঙ্কোচনও ঘটে যায় —

S.C.B.	S.W.B.(G) / ঝাড়খন্ডী বাংলা
জামাই	জাঁই
জঞ্জাল	জঁদরা
খন্ড	খাঁড়
ডগ/ডগা	ডঁকু
ডেঙ্গো	ডাঁগুয়া
ঢ্যাঙ্গা	ডেঁপা
ডিঙ্গানো	ডিযাঁ
ঠায়	ঠাঁয়

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ মান্য চলিতের ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি ঝাড়খন্ডীতেও আছে। এগুলির উচ্চারণও মান্য চলিতের মতো তবে ণ, ল এর মূর্ধণ্য উচ্চারণ মান্য চলিতে নেই। কিন্তু ঝাড়খন্ডীতে ণ, ল এর উচ্চারণ O.I.A., M.I.A. বা ওড়িয়ার মতো মূর্ধন্য হয়। আবার ন এর দুরকম উচ্চারণ ঝাড়খন্ডীতে দেখা যায় — মূর্ধায় এবং দন্তমূলীয় O.I.A. এবং O.M.B. এর মত ঞ এর উচ্চারণ ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষায় রক্ষিত এবং শ, ষ, স এই তিনটি শিষ ধ্বনির

মধ্যে কেবলমাত্র 'স'-ই ঝাড়খন্ডীতে উচ্চারিত হয় ফলে মান্য চলিতে 'শ' যেখানে ধ্বনিতা/স্বনিম (Phoneme) এবং স এর 'শ' বিস্বন হিসাবে বিবেচিত হয়। 'র' এর উচ্চারণ দন্তমূলীয় কম্পিত হলেও ঝাড়খন্ডী বাংলাতে কোথাও তা তাড়িত ধ্বনি ড় তে পরিণত হয়। এই অনুযায়ী ঝাড়খন্ডী বাংলার সারণি হবে এরকম ঃ

কণ্ঠনালীয়	কণ্ঠ্য	মূর্ধণ্য	তালব্য	তালু দন্ত্যমূলীয়	দন্ত-মূলীয়	দন্ত্য	বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য
স্পৃষ্ট-	ক (K)	ট (ṭ)				ত (t)	প (p)
অল্পপ্রাণ	গ (G)	ড (ḍ)				দ (d)	ব (b)
স্পৃষ্ট-	খ (K^h)	ঠ ($ṭ^h$)				থ (t^h)	ফ (p^h)
মহাপ্রাণ	ঘ (G^h)	ঢ ($ḍ^h$)				ধ (d^h)	ভ (b^h)
স্পৃষ্ট-				চ (c)			
অল্পপ্রাণ				জ (d)			
স্পৃষ্ট-				ছ (c^h)			
মহাপ্রাণ				ঝ (j^h)			
নাসিক্য	ঙ (n)	ণ (ṇ)	ঞ (n̄)		ন (n)		ম (m)
পার্শ্বিক		ল (ḷ)			ল (l)		
কম্পিত					র (r)		
তাড়িত		ড় (ṛ) ঢ় ($ṛ^h$)					
উষ্ম	হ (h)				স (s)		

ণ; ন → মান্য চলিতে ণ; ড়ঁ রূপে উচ্চারিত হয়; ণ র স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই। কিন্তু ঝাড়খন্ডীতে জিহ্বাগ্র মূর্ধাকে স্পর্শ করে ণ উচ্চারণ করে বলে O.I.A.-র মতো এর

মূর্ধণ্য উচ্চারণ হয় ড়ঁ এর মতো।

মান্যচলিত	ঝাড়খন্ডী
চিকণ	চিকণ (ড়ঁ)
বাণ (তীর)	বাণ (ড়ঁ)
নারান	নারাণ (ড়ঁ)

শুধু মূর্ধণ্য 'ণ'এর ক্ষেত্রেই নয় ঝাড়খন্ডীতে শব্দের মধ্য এবং অন্ত অবস্থানে কোন কোন ক্ষেত্রে 'ন'-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ হয়। যেমন —

কানা > কাড়াঁ(ণ), ভুড়কুনি > ভুড়কুঁড়ি (ণ), চিয়াণ > চিয়াড়ঁ (ণ), চনফনিয়া > চড়ঁফড়িঁয়া, তবে শব্দের আদিতে 'ন' 'ন'-রূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন নঈ (নদী) নম (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম), নাহা (নৌকা), নুয়া (নূতন), নিমজা (নিমজ্জিত/অদৃশ্য হওয়া)।

কখনো কখনো 'ন' র 'ণ' রূপে উচ্চারণ হয় য়ঁ-র এর। যেমন — পানী (পায়িঁ), গণেশ (গয়েঁস), কানা (কায়াঁ), এ প্রসঙ্গে ড. সুধীরকুমার করণ বলেছেন — O.I.A. 'n' which become n in M.I.A. and in O.B. period remains as 'n' in the words like jāṇe, pāṇe, māṇus, bān.[৯]

ল — ঝাড়খন্ডীতে 'ল'র দন্তমূলীয় এবং মূর্ধন্য (retroplex) উভয় উচ্চারণই হয়। তবে শব্দের আদিতে ল-এর কোন রকম উচ্চারণই হয় না, ল > ন তে পরিণত হয় —

লোক > নোক, লতা > নতা, লাট > নাট, লাল > নাল, লাটা > নাটা, লাজ > নাজ, লুগা > নুগা, লাঙ্গুল > নেগুড়, লোহা > নুহা।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে — "লুন lun-(lavana) লুন, লাজ lāj নাজ, লাছ lācha নাছ nāch লাতি > নাতি"[১০]

মূর্ধণ্য ল'-জিহ্বার সামনের দিক উল্টে গিয়ে মূর্ধাকে আলতো করে স্পর্শ করলে মূর্ধণ্য 'ল' উচ্চারিত হয় — যার উচ্চারণ অনেকটা (ড় ও ল এর মাঝামাঝি) জ এর মতো। (ওড়িয়াতে এই ধ্বনি সরাসরি 'ড়' হিসাবে ব্যবহৃত হয়) যেমন — নাজকুলি (নাজকুড়ি-লজ্জাকুলা)

, জল (জড়ড়-জল), ঝাল (ঝাড়ড়-ঝাল), মহিল্লা > মাহড়্ড়া, ছেলি (ছেড়িড় - ছাগল)। মূর্ধণ্য 'ল' সম্পর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

Māgadhi of the second and third M.I.A. periods probably had this -I. But it become a dental or alveolar- I- once more in all Magadhan of the N.I.A. period excepting in Oriya. Oriya has cerebral -I- which corresponds to O.I.A.[১১]

দন্তমূলীয় ল — মহুল (মহুয়া) ভুকলা (বড় আকারের), বিলেই (বিড়াল) মিলকা (চোখ খোলা) ভ্যালকা (হাবাগোবা)।

'র' শুধুমাত্র 'ণ' ল-নয় ঝাড়খন্ডীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দন্তমূলীয় (কম্পিত) 'র' এর মূর্ধণ্য (তাড়িত) যেমন —

নারিকেল > নাড়িয়া, বজ্র > বোজোড় (সামনা-সামনি ধাক্কা), খচ্চর > খ্যাঁচড়, হরিৎ > হড়র।

'র'-এর মূর্ধণ্যভূত উচ্চারণ ওড়িয়াতে শোনা যায়; রাঢীতেও একবারেই অনুনয় যেমন—

O.I.A.	Oriyā	Rarhi
নারিকেল	নাড়িয়া	নারকোল
সুভদ্রা	সুভড়দড়া	সুভদ্রা

এ প্রসঙ্গে ড. সুধীরকুমার করণ বলেছেন — "The pronounciation of 'r' it may be said this trilled seound is pronounced in the same way as which may be found in some of the dialects of Begnali"[১২]

ড় — অনেক ক্ষেত্রেই O.I.A. র 'ড' ঝাড়খন্ডী বাংলায় 'ড়' তে পরিণত হয়েছে যেমন — খন্ড > খাঁড়, পন্ডাসুর > পঁড়াসুর, কুন্ড > কুঁড়, ঠান্ডা> থঁড, মুন্ড > মুঁড, তুন্ড > দুঁড়, পান্ডুর > পাঁড়ুর, কান্ড > কাঁড়, জাড্য > জাড়।

ড. সুধীরকুমার করণ জানিয়েছেন — 'The intervocal and final 'd' and 'dh' of O.I.A. become r and rh in S.W.B. this r is a flopped sound and

rh it its transformation'.[১৩]

ত > ড় → কত > কেতে > কেডে > কেড়ে

ট > ড় → পেটিকা > পেড়ি

র - ড় → নারিকেল > নাড়িয়া

ল - ড় → হুলিয়া > হুড়িয়া > হোড়, লাঙ্গুল > লেঙ্গুড়, যুগ্ম > যুগল > জোড় > জোড়া > জড়া

ন > ড় → যোগান > জোগাড় > জগড়া (ধ্বনি বিপর্যয়)

ঢ় → ড় → ঝাড়খন্ডী বাংলাতে ঢ় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় যেমন — আঢ়া (ধানের পরিমাপ), উঢ়া (পরিধান/পরা), গাঢ়া (গর্ত), মুঢ়া (কাঠের গুঁড়ি), পিঢ়া (কাঠের তৈরী বসার চৌকি)। এ প্রসঙ্গে ড. সুধীরকুমার লিখেছেন — "In this respect it may be said S.W.B. is still in the M.B. period where rh was a genuine and prominant sound. One should be more careful about the pronounciation of r and rh in S.W.B. because the words with final r and with final rh differ in meaning though the words may be similar in form.[১৪]

যেমন — পড়ে (পাঠ করে) — পড়ে (পতিত), বুঢ়া (বৃদ্ধ) — বুড়া (ডোবা)। তবে ঢ় সবসময় 'ঢ'র পরিণতি নয়। যেমন — তির্যক > ত্যাড়া > ত্যাঢ়া।

হ — ঝাড়খন্ডী বাংলার উচ্চারণ মান্য চলিতের মতোই। যেমন — হলা (হিল্লোল), হড়র (হরিৎ), হান (হানি), হালি (সবুজ), হাঁসা (ফরসা), হামার (ধান রাখার মরাই), মান্যচলিতের অন্তে 'হ' সাধারণত অনুপস্থিত, কিন্তু ঝাড়খন্ডীতে 'হ' ক্ষীণ হলেও উচ্চারিত হয় —

S.C.B.	ঝাড়খন্ডী
বউ	বোহউ < বহু
বইতে	বহিতে

দোয়া　　　　　　দুহআ < দুহা < দোহন (আদি মধ্য বাংলা)

অন্ত্য হ – নহ (লতা), নাহা (নৌকা), বহা (বওয়া), নিহিনিহি (ঘ্যান ঘ্যান করা), ডাহা (রোদের প্রাখর্য), জোহো (উদ্যোগ)।

ঞ — S.W.B. তে 'ঞ' এর উচ্চারণ সম্পর্কে সুধীরকুমার করণ জানিয়েছেন — ñ (ঞ) generally occurs before other palatals and is pronounced as 'n' as in panca, bāncha (pānca, banchā) etc.[১৫] কিন্তু এ ছাড়াও ঞ-এর একটা নিজস্ব উচ্চারণ আছে ঝাড়খন্ডী বাংলাতে। ঝাড়খন্ডীতে উত্তম পুরুষ একবচনের যে রূপ 'ঞ'-র সেখানে নিজস্ব একটা উচ্চারণ হয়। যেমন —

মুঞি (muñi), এছাড়া পাঞি-তে ঞ অনেক স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে। আবার অস্ট্রিক ভাষাতেও 'ঞ'-এর স্বাভাবিক বেশী (সাঁওতালী ভাষায় ব্যাপকভাবে শোনা যায়)।

শ, স, ষ → ঝাড়খন্ডীতে মান্য বাংলার যুক্তবর্ণ ছাড়া সব উচ্চারণ একই। কিন্তু মৈথিলী ও অন্যান্য বিহারী ভাষায় কেবল 'স' হয়। রাঢ়ের দক্ষিণে 'শ' ও 'স' এর বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। মতো শিস্‌ধ্বনির ক্ষেত্রে 'স' কেবলমাত্র উচ্চারিত হয়। শ, ষ, স সবক্ষেত্রেই উচ্চারণ হয় 'স' রূপে যেমন — শশবিন্দু (সসবিন্দু), শশধর (সসধর), শ্রবণ (সুবনা), শোঁকা (সুঁগা), শকট (সগড়) আবার 'স'-র উচ্চারণ কোথাও কোথাও 'ছ' হয় যেমন — সম্মুখ (ছামু), শ্রী (ছিরি)।

বাকি ব্যঞ্জনধ্বনি গুলির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য মান্য চলিতের মত।

অস্ট্রিক ভাষার গঠনতত্ত্ব

'অস্ট্রিক' ('Austric') শব্দটি লাতিন শব্দ (Auster) আউস্তের 'দক্ষিণ প্রান্ত' হইতে এই শব্দ উদ্ভূত বলে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন।[১৬] মুন্ডারা নিজেদের হোড়ো আর হো তথা কোল-রা নিজেদেরকে হো বলে সম্বোধিত হয়। শ্রদ্ধেয়

রামসুন্দর বাস্কে — "সাঁওতাল পূর্ব-পুরুষদের পরম্পরা অনুযায়ী সাঁওতাল সম্প্রদায়রা নিজেদেরকে হড় হপন (মনুষ্য পুত্র বলে সম্বোধন হয়ে থাকে"[১৭] তারা জাতিতে খেরওয়াল বংশের এবং জাতিতে 'খেরওয়াল' ও তাদের সমাজও 'খেরওয়াল সমাজ'। এবং ভাষাগত দিক দিয়েও বলা যায় এই খেরওয়াল জাতিগোষ্ঠী মানুষজনের ভাষাই খেরওয়ালী ভাষা। এ প্রসঙ্গে বিমল মুর্ম্মুর লেখায় পাই —

"ভাষাবিদ স্যার থমসন এদের ভাষাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য খেরওয়াল শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আর এই খেরওয়ালী ভাষাকে অন্যান্য পন্ডিতরা কে কি নামে বর্ণিত করেছে — স্যার ম্যাকসমুলার সাঁওতালী ভাষাকে — মুন্ডা-দ্রাবিড়, জর্জ কেম্পবেল সাঁওতালীকে — কোলোরিয়ান, স্যার ফ্রেডারিক কোল-মুন্ডা। আর এই খেরওয়ালী ভাষাকেই প্রাচীন ঋকবেদে আসুরী নামে পাওয়া যায়। আসুরী ভাষাকেই ভাষাবিদ Gerard Diffloth 1974 সালে ভাষার বিশ্বসংসারে বুঝবার সুবিধার্থে শ্রেণীভূক্ত করেছেন Austric শ্রেণীর ভাষা রূপে"।[১৮]

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, বাংলাদেশে আর্যভাষা বহুপূর্বে এদেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করত —

The other elements in the Aryan-speaking peoples of Northern and North eastern India may be briefly noted. Beside the Dravidian's there were the Kols, whose speech is a member of a linguistic family extending through Indo-China and Malay, Peninsula to Indonesia, Melanesia and Polynesia – the Austric family (P. W. Schmidt, Die-Mon-Khmer, Volker etc. Brunswick, 1906) Kol speakers are now confined roughly within the region between the Ganges, the Tapti and the Godavari (West Bengal, Chota-Nagpur, North-east Madras. Presidency, the Central Provinces), but on linguistic and ethnic grounds it has been surmised that at one time they lived in the Gangetic plains,

up to foot of the Himalays.[১৮]

গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় এবং মধ্যভারতের অনেক অংশে অস্ট্রিক ভাষী অস্ট্রালয়েডদের বসবাসই ছিল সবচেয়ে বেশি। অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েডদের সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রাম কেন্দ্রিক। অস্ট্রিক ভাষাবর্গের মূল দুটি শাখা — অস্ট্রোএশীয় এবং অস্ট্রোলেশীয়।

The language of Mundas with their kinded dialects spoken by the Santals. Hos, and the other allied tribes inhaviting the Chhotanagpur plateau, has been shown by Peter Sehmidt to form of sub-family of the family called by him Austro-Asiatic, which includes Monkhmer, Wa, Nicoborese, Khasi and the aborginal languages of Mallacca. There is another family which he called Austronisian including Indonesian, Melanesian and Polynesian. These ------ families are grouped into one great family which he calls the Austric.
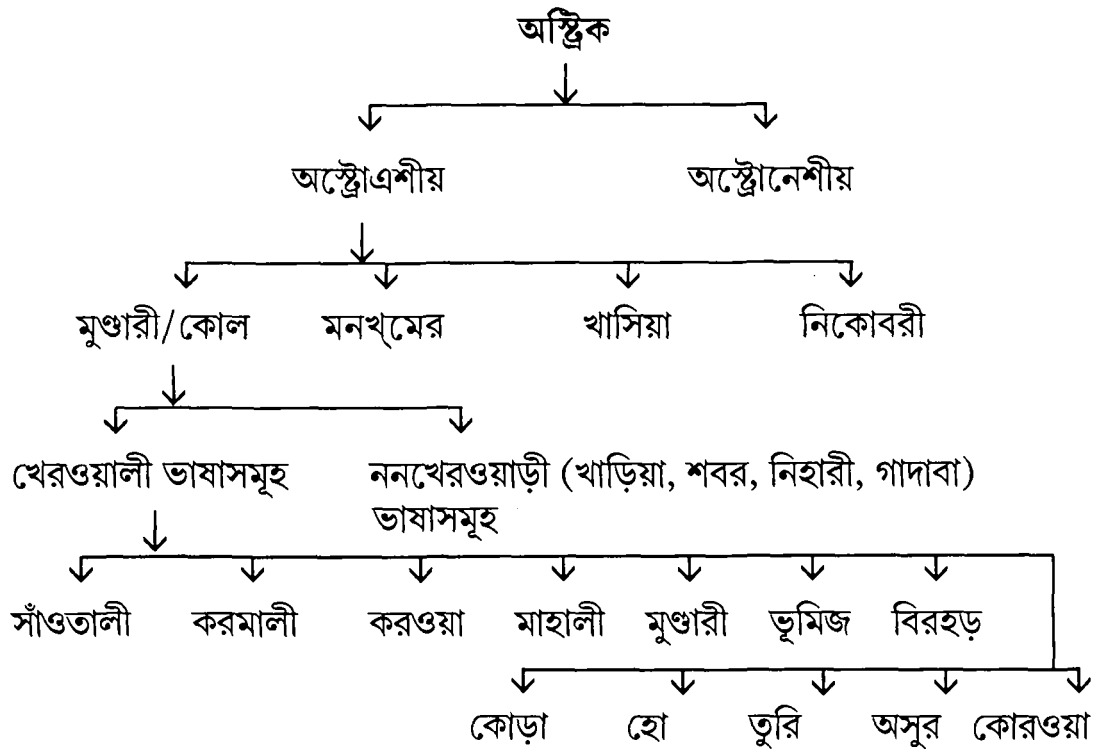
অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা অস্ট্রোএশীয় শাখার মুন্ডারী বা কোল ভাষাগোষ্ঠীর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবো যদিও খেরওয়ালী ভাষাগোষ্ঠীর একমাত্র সাঁওতালী ভাষাকে বাদ দিলে 'অস্ট্রীক ভাষা' গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষাগুলি বিলুপ্তির পথে। তাই এ প্রসঙ্গে বিমল মুর্ম্মুর কথাটি প্রণিধানযোগ্য — 'Austric' শ্রেণীর ভাষার গঠনতত্ত্ব আলোচনা পূর্বে কোন কোন জাতিগুলিকে অস্ট্রিক তালিকাভূক্ত করতে পারি সে সম্পর্কে G. A. Grierson লিখেছেন —

"Santali, Mundary, Bhumij, Koda, Ho, Turi and Korwa are only slighty differing forms of one and the same language. All these tribes are accounting to Santali traditions decended from the same stock and were once known as Kherwars or Kharwars".[২২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, G. A. Grierson যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, প্রারম্ভে তাদেরই ভারতের আদিম অধিবাসী হিসাবে বলা হয়েছে। এঁরা 'খেরওয়াড়' বা 'খারওয়াড়' জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এরা নিজেদের খেরওয়াড় বা খারওয়াড় বলে পরিচয় দিতেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের খেরওয়াল নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। 'খেরওয়াড়' শব্দ খেরওয়াড় শব্দ থেকে আগত। এ প্রসঙ্গে কানাইলাল হাঁসদার মতে — 'খেরে' শব্দ থেকেই খেরওয়াল শব্দের উৎপত্তি। 'খেরে' অর্থাৎ পক্ষীকূলকে বুঝি। যারা পাখি খায় তারাই পরবর্তীকালে খেরওয়াল"।[২৩]

আদিবাসী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অর্থাৎ খেরওয়াল মানুষেরা ঠারে কথা বলেন (ঠাট্ তাঁদের ভাষা)। খে র > হেড় বা 'হড়' ভাষায় কথা বলে।

প্রসঙ্গত H. H. Resley বলেছেন — "According to Mr. Skrefsrud the name Santal is a corruption of Saontar and was adopted by the tribe after their sojour far several generations in the country about saont they were said to have been called Kharwar, the root of which, Khar, is a variant of her 'man' the name which all Sentals use among themselves".[২৪]

ভাষাটির নাম হড়রড় বা হড় পীরসি। বড় এবং পীরসি — দুটো কথারই মানে হল ভাষা। বাংলা ভাষায় যে জনগোষ্ঠীকে সাঁওতাল বলা হয়, তারা নিজেদের বলেন হড়। (পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ব্লকের রামজীবনপুর গ্রামে বা আশপাশের গ্রামগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানকার কোড়া গোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের পীরসি বলে অভিহিত করেন।

অস্ট্রিক ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে পীরসীভাষাকে সামনে রেখে আলোচনা করব। পীরসি ভাষায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য এরকম ঃ

	Back (পশ্চাৎ)	Central (কেন্দ্রীয়)	Front (সম্মুখ)
Close (সংবৃত)	u (উ) ũ (উঁ) হ্রস্ব		i ই i (ইঁ) হ্রস্ব
Half-close অর্ধ সংবৃত	o (ও) õ (ওঁ) হ্রস্ব	ā (অী)	e (এ) ẽ (এঁ) হ্রস্ব
Half-open অর্ধ বিবৃত	ɔ (অ) ɔ̃ (অ্যাঁ)		ɛএ্যা ɛ̃ (এ্যাঁ) হ্রস্ব
Open বিবৃত	a (আঁ) æ̃		

হড় রড়েতে স্বরধ্বনি মোট আটটি
অ, আ - া,
অী - ্যা, ই - ি,
উ - ু,
এ - ে, ও - ো

প্রথমে দেখব তিনটি স্বরধ্বনি) অ, আ, অী

অ — অকারে, অল, জম, অঁ জম, অর, অকয়

আ — আম, দাকা, কাথা, বাহা, আব, সার, রাহা

অী — এই ধ্বনিটি বাংলায় নেই। এটি একটি অর্ধ-সংবৃত মধ্যস্বরধ্বনি। 'অী' ধ্বনিটি

উচ্চারিত হয় —

বাংলা		পীরসি/হড় রড়
অতি	>	আঁতু
বী	>	বীহু
লই	>	লৌই
কম	>	কৌমি

আবার ই, এ, অ্যা স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ এভাবে হয় —

ই — ই এঙ, ঠিলি, কুলি, উজি, তিকিন, তিস

এ — এম, এহপ, তেহেএঙ, পে, সেরেএঙ

অ্যা — অ্যাপ, অ্যালা - 'অ্যা' এই স্বরধ্বনিটি হড় রড় বা পীরসিতে এখনও স্পষ্ট করে জায়গা করে নিতে পারেনি। কিন্তু মুখের ভাষায় এই ধ্বনিটি স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায় উ এবং ও-এর উচ্চারণকালে 'উ' ধ্বনিটি স্পষ্টই পাওয়া যায় —

উ — উনি, উল, উতু, উজি, কুভু, এঙুতুম

ও — ওনড়ে, ওণকো, হাতাও, বেনাও, তোয়ো

স্বরধ্বনির আনুনাসিক উচ্চারণে স্বাভাবিক। যেমন অঁ - হুঁ, মঁড়ে

আঁ — সাঁও, জাঁহাঁয়, তাঁহাঁয়, দাঁড়ে, দাঁসায়

আঁ — কিসাঁড়, জৌঁড়ি, মাঁড়ি

এঁ — চেঁড়ে, হেঁড়ে

উঁ → কুঁড়িৎ, কুঁই, কুঁড়ি

ওঁ — পোঁড়

স্বরধ্বনির হ্রস্ব উচ্চারণও হড় রড়তে আছে। স্বরে স্বল্পতা বোঝাতে সব সময় ক্ষীণভাবে স্বরধ্বনির অবরুদ্ধ উচ্চারণ করতে হবে। বিসর্গ চিহ্নের দ্বারা তা বোঝানো হয়েছে —

অঃ — অঃতোয়া, নিতঃদ, সাবঃ, হরঃ

আঃ — দাঃ, রাঃ, অড়াঃ, আমাঃ

অীঃ — অীঃয়ুব, তিনৌঃ, ইনৌঃ

ইঃ — ইঃতি, গিতিঃ

উঃ — উদুঃ, হিজুঃ

ওঃ — থেয়োঃ আ

রেভাঃ পি ও বোডিং বলেছেন — Vowels : a, e̱, e, io̱, o, u vowel resulant ạ ẹ ọ vowel nasalized ã ã ẽ ẽ ĩ õ õ ụ of this the following dipthong. Combinations are used –

ae, ao, ại, ạụ, ea, e̱o̱, e̱o, e̱i, e̱o̱, iạ, io, iu, oā, ōe, o̱e, o̱i, ua, ui which may all be nasalized; the sign of nasalization is for the sake of convenience ordinarily put only on the first part of the dipthong, although, of course, the whole combination partakes of the nasalization.[২৫]

আটটি স্বরধ্বনির মধ্যে সাতটির উচ্চারণ বাংলাভাষার মতোই। এই সাতটি হল অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। একটির উচ্চারণ আলাদা। এই স্বরধ্বনিটি হল অী। অর্ধসংবৃত মধ্য স্বরধ্বনি। বাংলা এবং পীরসিতে আ উচ্চারণ করার সময় মুখবিবর খোলা অর্থাৎ বিবৃত রাখতে হয়। অর্থাৎ 'হা' করে 'আ' উচ্চারণ করতে হয় যেমন আম কিম্বা দাকা কিম্বা বাহা বলবার সময়। আবার 'উ' উচ্চারণ করার সময় মুখবিবর থাকে সংবৃত, মানে প্রায় বন্ধ, যেমন উল বা উতু, উনি মুখ বন্ধ করে আ উচ্চারণ করলে অী ধ্বনির কাছাকাছি যাওয়া যাবে। উ উচ্চারণ করতে ঠোঁট দুটি গোলাকার বা কুঞ্চিত থাকে, অী উচ্চারণ করতে ঠোঁট দুটি ছড়ানো বা প্রসারিত থাকে, যেমন — কৌহ্, বীহ্, লী, কীমি। এই ধ্বনি বাংলায় নেই।

স্বরধ্বনির অবরুদ্ধ উচ্চারণে ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়, যেমন —

হর মানে রাস্তা কিন্তু হরঅ মানে কচ্ছপ, আর হরঃ মানে পরিধান করা। যেমন — দাঃ রে মানে জল কিন্তু দারে (গাছ)। এক্ষেত্রে স্বরধ্বনিটি গলার ভিতরে চেপে দেওয়া হয় মানে নিঃশ্বাসবায়ুর নির্গমণে বাধা দেওয়া হয়।

অ → বাংলা ভাষায় 'অ' উচ্চারণ আছে ⊃ (স্বাভাবিক) এবং o পরিবর্তিত। কিন্তু পীরসিতে অ > 'ঔ' স্বাভাবিক এর মতোই উচ্চারিত হয় যেমন — অতি > ওতি, অধিক > ওধিক, অভিমান > ওভিমান।

আ → বাংলা ভাষা উচ্চারণে 'আবার', 'আদর', আড়াল-এর মতো পীরসিতেও দেখা যায় আজার, আলাঙ, আতার, আমদাজ, তালা মৌই।

আঁ → আঁ উচ্চারণ বাংলাতে নেই। আঁ-এর উচ্চারণ 'আ' এবং 'ও' মিলে সৃষ্ট। যেমন—

আঁডি = আ + ঔ + ড + ই = আঁডি

আঁতু = আ + ঔ + ত + উ = আঁতু

কাঁমি = ক + আ + ঔ + ম + ই = কাঁমি

ই, ঈ আর উ-এর উচ্চারণ বাংলাতে লেখা হয় কিন্তু পৌরসিতে ই, ঈ, উ কার 'ি' কার 'ী' কার 'ে' কার ব্যবহৃত হয় যেমন — ইতিল, ইরটি, ইসকির, জিয়ালী, ঠাকুর জীউ প্রভৃতি। সাঁওতালীতে ঈ শব্দের মধ্যে ঈ এর উচ্চারণ খুবই কম।

উ — পীরসি উ, এর হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। যেমন — আঁজমঃ আ, আঁজমঃ।

'এ' — বাংলা 'এ' ধ্বনি থাকলেও পীরসিতে 'এ্যা' উচ্চারণ হয় করা হয় যেমন — এসেৎ (এ্যাসেৎ), এহ্‌প (এ্যাহপ), এনেকিন (এ্যানেকিন) 'ঐ' 'ও' আর 'ঔ' এর উচ্চারণ বাংলা স্বরধ্বনির মতোই স্বাভাবিক আবার এদের ঐ-কার, ঔ-কার চিহ্নের ব্যবহারও পীরসিতে ব্যবহৃত হয় যেমন —

অ (া), আঁ (ী), ই (ি), ঈ (ী), উ (ু), এ (ে), ঐ (ৈ), ও (ো), আর ও (ী) কার

পীরসি ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি হবে নিম্নরূপ ঃ

	(সম্মুখ)	(কেন্দ্রীয়)	(পশ্চাৎ)
(সংবৃত)	ই (i) ইঁ ($\tilde{i}$)		ই (u)X উঁ ($\tilde{u}$)
অর্ধ সংবৃত	এ (e) এঁ ($\tilde{e}$)		ও (O) ওঁ ($\tilde{O}$)
অর্ধ বিবৃত	এ্যা (ɛ) এ্যাঁ ($\tilde{ɛ}$)	আঁ	অ (⊃) অঁ ($\tilde{⊃}$)
বিবৃত			

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

কণ্ঠনালীয়	কণ্ঠ্য	মূধর্ণ্য	তালব্য	তালু দন্ত্যমূলীয়	দন্ত-মূলীয়	দন্ত্য	বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য
স্পৃষ্ট-	ক (K)	ট (t)				ত (t)	প (p)
অল্পপ্রাণ	গ (g)	ড (ḍ)				দ (d)	ব (b)
স্পৃষ্ট-	খ (K^h)	ঠ (t^h)				থ (t^h)	ফ (p^h)
মহাপ্রাণ	ঘ (g^h)	ঢ ($ḍ^h$)				ধ (d^h)	ভ (b^h)
স্পৃষ্ট-				চ (c)			
অল্পপ্রাণ				জ (j)			
স্পৃষ্ট-				ছ (c^h)			
মহাপ্রাণ				ঝ (j^h)			
নাসিক্য	ঙ (ṇ)		ঞ ($\tilde{n}$)		ন (n)		ম (m)
পার্শ্বিক					ল (l)		
কম্পিত					র (r)		
তাড়িত		ড় (ṛ)		য়			
উষ্ম	হ (h)				স (s)		

হড় রড়েতে ব্যঞ্জন ধ্বনিতে বলা হয় সংগও সাড়ে। এগুলি বাংলার খুব কাছাকাছি। আমরা পরপর এগুলিকে উচ্চারণ পর্যবেক্ষণ করব উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে।

ক ⟶ কয়ঃ, কুড়ু, কঁয়ে

খ ⟶ খন, খঃচ

গ ⟶ গঃ চ, গঃ ক

ঘ ⟶ ঘন্টা, ঘ কিছু ঋণ শব্দ ছাড়া 'ঘ' ধ্বনিটি হড় রড়ে বিরল [২৬]

ঙ — শব্দের আদিতে এই ধ্বনি পাওয়া যায় না। মধ্য ও অন্ত্যে পাওয়া যায়। যেমন — চৌঙরা, বাঙ, আপুঙ ইত্যাদি শব্দে ঙ এসব ক্ষেত্রে (ং) এই বর্ণটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু 'ঙ' বর্ণটিকে ব্যবহার করাই ঠিক ধ্বনিটি কণ্ঠ নাসিক্য।

চ ⟶ চান্দো, চালাক, চেঁড়েঁ, চেৎচাবা, চুবি

ছ ⟶ ছাট, ছাড়াও, ছাড়ায়, ছাটকা, ছাঁদা

জ ⟶ জ, জম, জজম, জিৎকার, জহার, জঁহায়

ঝ ⟶ ঝিট, ঝিচ, ঝুঁক, ঝমর ঝমর, ঝাপনি

ঞ ⟶ ঞাম, ঞ, ঞিঞর, ঞুতুম, ঞুতমান্ ঞিঁদী,

ঞ একটি তালব্য নাসিক্য ধ্বনি যাকে শব্দের আদিতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি শেষেও পাওয়া যায়। যেমন ইঞ, বিঞ,

ট — টেটা, টনটা, টামাক, টুটি,

ঠ — ঠনকরা, ঠক

ড — ডঙ্গা, ডহর

ঢ — ঢড়া, ঢম্বা — ট, ঠ, ড, ঢ এই ধ্বনিগুলি বাংলাভাষার মতই মূর্ধণ্য ধ্বনি এবং সেভাবেই উচ্চারিত হয়। কেবল 'ণ' ধ্বনিতে সাঁওতালিতে পাওয়া যায় না।

ত — তালা, তাকের, তিচ, তাতাং

থ — কাথা, গাথা, পুথি, থির, থুতি

দ — দাকা, দাঃ, দারে, আদ, সাদম

ধ — —————— ধিবি, ধুরাও

ন — নিত, নওয়া, ননড়ে, নড়ে। স্বরধ্বনিতে আনুনাসিকতা ঁ দিয়ে দেখানো হয়।

প — পাড়হাও, পেঙঘা, পরতন, পারশাল, পিড়, পায়গন, পাহানি, পালগাং, পুটা, পীচনি।

ফ — ফাঁড়া, সাফা, ফারচা, ফায়সালা, ফীসিয়ারা

ব — বোঙা, বতর, বিঞ, বাহা, বুনুম, বির, বুরু, বয়হা

ভ — ভোদর, ভিন্দাড়, ভেড়া, ভিতরি, ভাগে

ম — মারাং, মিহু, মু, মাহা, মিৎ

র — রড়, রাঃ, রাকাপ, রেঙেঃচ, রুযীড়, রিমিল

ল — লল, লান্দা, লীগিৎ, লেকা, লেলহা, লুতুর, লীই, লহৎ

হ — হড়, হঃর, হেঃচ, হিজুঃ, হিলোঃ, হপন, হাতম, হিলি

য় — হয়, আয়মা, অকয়, মাঁয়াম

স — সেবেল, সাঁও, সিরম, সাগাই, সিক

ড় — শব্দের আদিতে এই ধ্বনি পাওয়া যায় না।

লেখার সময় হড় রড় ভাষাতে 'শ' এবং 'ষ' লেখা হয়ে থাকে যেমন — শায় = শত, বিষয় = বিষয় কিন্তু একমাত্র দন্ত্য স ই উচ্চারিত হয় (কারণ তৎসম শব্দ)। ং অনুস্বার চিহ্নটি সংস্কৃত ভাষায় অন্ত্য ম্ বর্ণের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হড় রড় বা পীরসিতে এই বর্ণের প্রয়োজন নেই। কারণ ঙ এবং ঞ বর্ণের সাহায্যে নাসিক্য ধ্বনির যথাযথ প্রকাশ সম্ভব। যেমন — রেঙ্গেঃ চ না লিখে রেঙে চ লিখলে কোন অসুবিধে নেই। তেমনই আপুং না লিখে আপুঙ এবং মারাং না লিখে মারাঙ লেখাই ঠিক। অন্তঃস্থ এবং ব (অন্তঃস্থ) একেবারেই প্রয়োজন নেই। পীরসিতে ঢ় এর ব্যবহার নেই। বিসর্গ

চিহ্নটি অবরুদ্ধ স্বরধ্বনিকে নির্দেশ করে।

সুতরাং পীরসিতে মোট ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা হল — ক, খ, গ, ঘ, ঙ / চ, ছ, জ, ঝ, ঞ / ট, ঠ, ড, ঢ / ত, থ, দ, ধ, ন / প, ফ, ব, ভ, ম / র, ল, হ, য়, স, ড় - এই ত্রিশটি। আটটি স্বরবর্ণ ও ত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে পীরসি অস্ট্রিক ভাষা গঠিত হয়।

কণ্ঠ্য — কান/খান, কাতে/গাতে, গাড়ি/ঘৌড়িঃচ, খাটাও/ঘটাও, ব্যাঙ/বিঞ, বালাম এরা/বালাঞ এরা।

নাসিক্য — বিন/বিঞ, তেঞাঙ/তেঞাঙ, ক/খ, ক/গ, গ/ঘ, ঙ/ঞ, ম/ঞ, ণ/ঞ,

তালব্যধ্বনি — বিডচ্ বিডিচ্ এ চমএদা

বিরিজ বিরিজ কেদেযায়। (চ/জ)

পেজ (চ/জ)

জম/ঝমঝম। (জ/ঝ)

বজীও/বুঝীও (জ/ঝ)[২৭]

ক/গ, গ/ঘ, ধ্বনিমূলগুলি আলাদা। ঙ/ঞ, ম/ঞ, ন/ঞ, ন/ঞ, উ, ঞ, চ/জ, ছ/জ, জ/ঝ এর ধ্বনিমূল আলাদা।

ওষ্ঠ্য ঃ উফরীউফরি/উপরীউপরি। ফ/প

পাট পাট রীপুদঃকানা/ফাট ফাটে রড় এদা। (ফ/প)

ভাড় ভাড়/বারাং বারাং (ভ/ব)

বেড়া - পেড়া (ব/প)[২৮]

মূর্ধন্য ঃ ঠুটকি/টুটি। (ঠ/ট) ঠেন/টেন (ঠ/ট), ঠেন/ঢের (ঠ/ঢ) ডাঙ/টাং। (ড/ট)

র, ল, হ, য়, স, ড় →

হর/হড়, রড (র/ড়)

লেন/রেন। (ল/র)

দাল/দাঁড়। (ল/ড়)

স্যে/ হেঃ চ। (স/হ)

তাড়াম/তালা। (ড়/ল)

হহ/হয় (হ/য়)

নাওয়া/ নোয়া। (ওয়া/য়া)[২৯]

ধ্বনিমূলকে আবদ্ধ করেছে। অস্ট্রিক ভাষায় সর্বনাম খুব বড় গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালী (হড়বড়) ভাষায় চাররকমের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়।

১। ব্যক্তিবাচক

২। নির্দেশক

৩। প্রশ্নাত্মক

৪। অনিশ্চিত সূচক

ব্যক্তিবাচকের ক্ষেত্রে সর্বনাম-এর ব্যবহার

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উত্তমপুরুষ (প্রথম ব্যক্তি)	ইঞ (আমি)	আলাঙ (দুজনে)	আরো (সকলেই)
মধ্যম পুরুষ (দ্বিতীয় ব্যক্তি)	আম (তুমি)	আবেন (দুজন)	আপে (তোমরা)
প্রথম পুরুষ (তৃতীয় ব্যক্তি)	উনি (সেই)	উনকিণ (দুজন)	ওনকো (অনেক)

ব্যক্তিবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে হড়বড়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দ্বিবচনের ব্যবহার আলাঙ এর উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতের মত। একবচনে আম এর ক্ষেত্রে সম্মানের জন্য কোনো কিছুরেই ব্যবহার করা হয় না। মধ্যমপুরুষের দ্বিবচনে আবেন সর্বনাম পদ বাক্যে

কর্তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ইঞ	জমাঞ	—	আমি খাব	(ঞ)	*অর্থাৎ*
আম	জমাম	—	তুমি খাবে	(ম)	*কর্তা উহ্য*
উনি	জমায়	—	সে খাবে	(য়)	*থাকে।*

ঞ, ম, য় ক্রিয়াপদের শেষে বিভক্তি হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়। এগুলিকে আত্মীয়বাচক হিসাবেও ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে যেমন—

আপা + ঞ = আঁপুঞ (আমার বাবা)

আপা + ম = আঁপুম (তোমার বাবা)

আপা + ত = আপাত (তার বাবা)।

পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক সর্বনামের পদ থেকে প্রত্যয় যোগ করেও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম পদ গঠন করা হয়। প্রাণীবাচক হলে শব্দের রেণ প্রত্যয় যোগ করা হয় আর অপ্রাণী বাচক হলে শব্দের আ আঃ উপসর্গ যোগ করা হয় যেমন—

ইঞরেন হপন — আমার সন্তান (হপন শব্দের অর্থ সন্তান প্রাণীবাচক তাই রেল হপন এর আগে রেন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

আমরেন হপন — তার সন্তান

উনিরেন হপন — উনার সন্তান

আবার ইঞাঃ পতব — আমার বই (পতব শব্দের অর্থ বই এই জন্য এর আগে আঃ যোগ করা হয়েছে)

আমাঃ পতব — তোমার বই

আচ্আঃ পতব — তার বই

উনিয়াঃ পতব — উনার বই।

নির্দেশক সর্বনামের ক্ষেত্রেও প্রাণী ও অপ্রাণী বাচক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়

প্রাণীবাচক

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উনি	উনকিন	ওনকো
হুনি	হুনকিন	হোনকো
ইনি	এনকিন	এনকে

যেখানে ঝাড়খণ্ডীতে পাই

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উনি	উনারা	উনারা
ইনি	উনারা	উনারা

প্রশ্নাত্মক সর্বনামের ক্ষেত্রে হড়-রড়

উনি অকারে চালাঃ কানায়? (হড়রড/পীরসি)

উনি কুথায় চলে যাচ্ছে? (ঝাড়খণ্ডী বাংলা)

আঃ রেন, রেয়াঃ রেয়াঙ, রেনাঃ এবং রেনাঙ এছাড়া ইঃ রেনিঃ বা রিনিঃ প্রত্যয়দুটিও সম্বন্ধবাচকতা প্রকাশ করার জন্যে প্রকাশ করা যায় অথচ ঝাড়খণ্ডী বাংলায় র-এর এই দুটি সম্বন্ধবাচকতা আমরা দেখি।

আঃ প্রত্যয়টি প্রাণীবাচক শব্দেই যুক্ত হয় ও পরবর্তী শব্দটি অপ্রাণীবাচক যেমন

আমাঃ আতে = তোমার গ্রাম (ইঞ + আ) পুথি = আমার বই

এখানে আঃ প্রত্যয়টির থেকে অধিকার বোঝায়।

প্রাণীবাচক / অপ্রাণীবাচক শব্দ + রেন + প্রাণীবাচক শব্দ

ইস্কুল + রেন + পাঠুয়া (ইস্কুলের ছাত্র)

অপ্রাণীবাচক প্রাণীবাচক

ইঞ + রেন + সেতা (আমার কুদুর)

রেয়াঙ এর ক্ষেত্রে শুধু বিষয় এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

দেওয়া-সেওয়া রেনাঙ কাথা কানা = দেবসেবার কথা হচ্ছে (অর্থাৎ দেবসেবার বিষয়ে)

রেনাং প্রত্যয়টি যুক্ত হয় সম্পর্ক বোঝানোর জন্যে, যেমন— কৌমিরেণাঃ জুহার
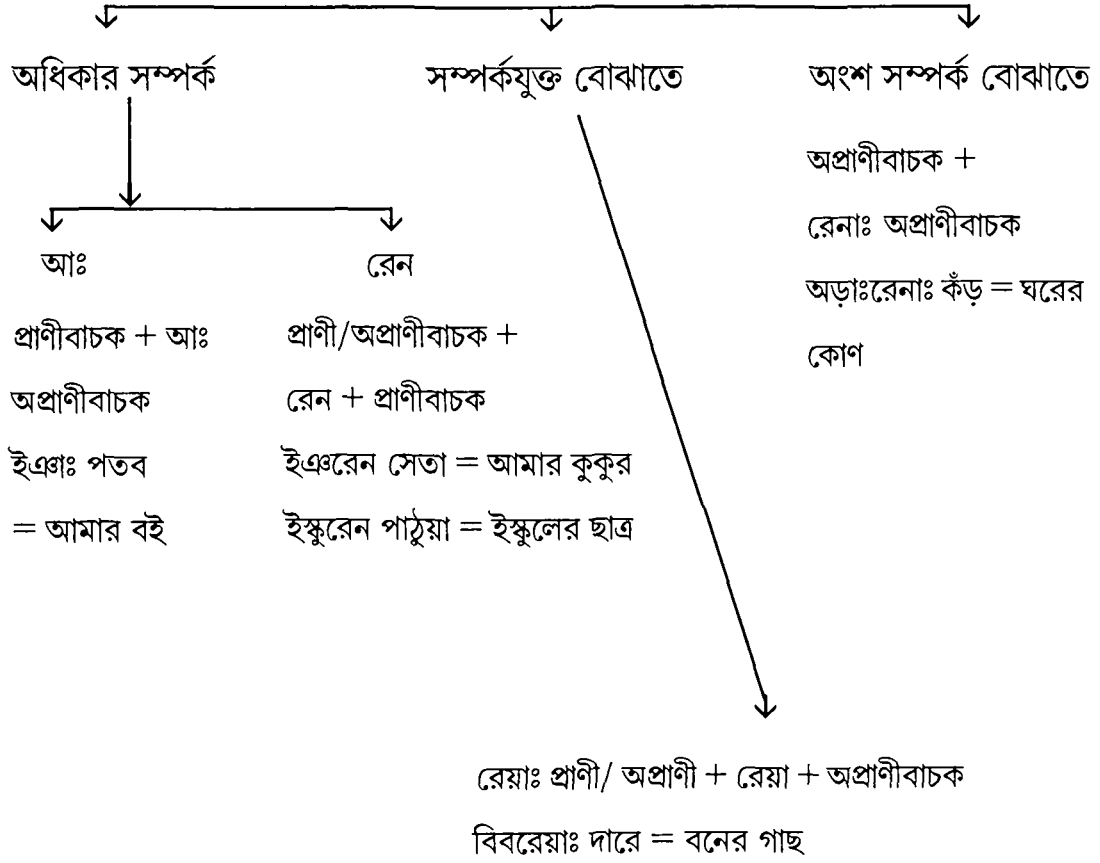
সুতরাং হড়রড় তে কর্তা ও কর্ম বোঝানোর জন্য কোনো শব্দাংশ জুড়ে দেওয়া হয় না। ক্রিয়াপদের মধ্যে কর্তার চিহ্ন এবং কর্মের চিহ্ন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র

১। South Western Bengali : A Linguistic Study : Sudhir Kr. Karan : Bihar Bangla Academy, Kadum Kanan, Patna, 1992, Page-89।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৯৫।

৪। ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ : ছন্দা ঘোষাল : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-৫৩।

৫। O.D.B.L (Part-I) : Suniti Kr. Chatterjee : Rupa & Com : New Delhi, 1986, Page-153।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৩।

৭। ভাষাবিদ্যা পরিচয় : পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৯৫।

৮। South Western Bengali : A Linguistic Study : Sudhir Kr. Karan : Bihar Bangla Academy, Kadum Kanan, Patna, 1992, Page-98-99।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫।

১০। O.D.B.L (Part-I) : Suniti Kr. Chatterjee : Rupa & Company : New Delhi, 1986, Page-543।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩৯।

১২। South Western Bengali : A Linguistic Study : Sudhir Kr. Karan : Bihar Bangla Academy, Kadum Kanan, Patna, 1992, Page-107।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১০২।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১০২।

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১০২।

১৬। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : ডি মেহরা রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৭।

১৭। সাঁওতালী ভাষার আলোকে বিশ্বসংস্কৃতির উৎস সন্ধানে : রামসুন্দর বাস্কে : আঁদিম পাবলিশার্স, মেসেদা, পৃষ্ঠা-১২।

১৮। সাঁওতালী ভাষা ও বিশ্বের মানচিত্র : বিমল মুরমু : আঁদিম পাবলিশার্স, মেচেদা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭।

১৯। O.D.B.L (Part-I) : Suniti Kr. Chatterjee : Rupa & Com : New Delhi, 1986, Page-28-29।

২০।

২১। সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪।

২২। Linguistic Survey of India : G.A. Grierson : Vol-V, Part-I, 1968, Page-105।

২৩। খেরওয়াল বংশধরদের প্রাচীন ইতিহাস : কানাইলাল হাঁসদা : নির্মল বুক এজেন্সি, অক্টোবর, কলিকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৩।

২৪। The People of India : H.H. Resly : The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1891, Page-21।

২৫। সাঁওতালী ব্যাকরণ : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-২।

২৬। সাঁওতালী ভাষার সহজ পাঠ : রামসুন্দর বাস্কে ও অনিমেষকান্তি পাল : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯।

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

তৃতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ব, রূপতত্ব, শব্দার্থ ও ক্রিয়া ব্যবহারে ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার সঙ্গে অস্ট্রিক ভাষার সম্পর্ক

ধ্বনিতত্ব ঃ স্বর ও ব্যঞ্জন

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি অ, আ, ই, উ, এ, ও (ক্বচিৎ) অ্যা এখানকার উচ্চারণে শুধুমাত্র পাওয়া যায়। এই ধ্বনিটি শ্যাষ (শেষ),, ত্যাল (তেল), চ্যাতন (চেতণ), ত্যাঁতুল (তেঁতুল) প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত অস্ট্রিক 'অ্যা' স্বরধ্বনি থেকে এসেছে। আবার 'আ' এর বিবৃত ধ্বনি হিসাবে 'আঁ' রূপ নিয়েছে। এটাও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর কাছ থেকে ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষার উচ্চারণে এসেছে।

অ্যাপা, আল্য > আল্যে (সাঁও > মা বা)

পূরক-স্বনত্ত অনেকগুলি। অ, আ, ই, উ, এ, এগুলি মূলধ্বনির অল্পবিস্তর অন্য ধ্বনির সান্নিধ্যের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার মতে — ''অ, আ, ই, উ, এ প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানে স্বল্প প্রভেদক উপধ্বনি বা উপধ্বনি সদৃশ স্থানান্তর ঝানখন্ডী বাংলাতেও সুলভ। ই, উ ও অর্ধস্বর য় (-ইয়, ইয়া, ইয়ে) উচ্চারিত হয়''।[১] আবার অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতেও এগুলি লক্ষণীয়। পীরসিতে 'য' ধ্বনি নেই। ঝাড়খন্ডীতে শেষ ব্যঞ্জন ধ্বনিটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই একক হিসেবে উচ্চারিত হয় যেমন, চুইল, কুইল্, কদাইল্ (কোদাল) মাইর্ (মার)। কুলি (সাঁ) > কুলহি (ঝা বা)। ''ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার মূল শব্দে যদি 'য'-ফলার অস্তিত্ব থাকলেও এখানকার সব শব্দগুলিই সরলীভূত একক ব্যঞ্জন'' —[২] যেমন — মধ্য > মইধ (ইতুটুক পাইখটি মইধ বনে চরে) (অপিনিহিতি) সত্য > সইত্, শূণ্য > শূইন (তিরিয়া মরিলে গির্হ শূণ্)। ঝাড়খন্ডী বাংলা

ভাষাতে লঘু 'ই' স্বর বিপর্যের ফলে দীর্ঘ হয়েছে যেমন, রাত্রি > রাতি > রাইত্, পক্ষী > পাখি > পাইখ্, আনিব > আনই্ব অস্ট্রিক ভাষার ক্ষেত্রে তিকিন, তিস > তিইস্।

'উ' প্রায় সব জায়গাতেই স্থান পরিবর্তন করে। যেমন — ইক্ষু > আখু > আউখ এটি বিপর্যাসগত এ 'উ' ধ্বনিটি আগম নয়। আবার কখনো কখনো 'উ' ধ্বনিটি 'ই' ধ্বনিতে পরিবর্তত হয়ে যায়। যেমন ঝুমুর > ঝুমুইর, পুখুর > পখইর। দ্রুত উচ্চারণে শব্দের মধ্যে 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। হরিয়া > হর্যা, হড়বড় > হড়বড়্যা; আবার অস্ট্রিক ভাষার পৌরসিতে হেঁড়া > হেড়্যা, গুড়্যা, প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। ঝা বা 'ঔ' ধ্বনির উচ্চরণ আছে ওমনি > অমনি > ঔমনি, হড়রড় শব্দেও ঔগু (সেনকাতে এ্েল ঔগুইমে = গিয়ে দেখে এসো।

ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বলেছেন — ''ঝাড়খন্ডী উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি এইরকম ঃ কণ্ঠ্যধ্বনি ক, খ, গ, ঘ, তালব্য চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, মূর্ধণ্য ট, ঠ, ড, ঢ, তাড়িত ড়, ঢ়, দন্ত্য ত, থ, দ, ধ, ণ, ওষ্ঠ্য প, ফ, ব, ভ, ম, অন্তঃস্থ য়, কম্পিত র পার্শ্বিক ল, উষ্ম শ, স, হ্ এবং প্রাণিত নাসিক্য ম্‌হ, লহ্, রহ, এবং ং। যেখানে পারসিতে কণ্ঠৎ ক, খ, গ, ঘ, (ঙ ধ্বনি নাসিক্য) মূধণ্য ট, ঠ, ঢ, ড (ড়) তাড়িত, তালব্য ঞ, তালু দন্ত্যমূলীয় চ, ছ, জ, ঝ, দন্ত্যমূলীয় র, ল, ন, য়, ও ম, দন্ত্য ত, থ, দ, ধ এবং বিশুদ্ধ ওধ্য প, ফ, ব, ভ, ম সুতরাং ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার ধ্বনি ও পৌরসি ধ্বনি অনেকটাই সামনা সামনি। পৌরসিতে ঞ দ্বারা স্বরান্ত ং অনুসার ব্যবহার হয়। 'ঙ ও ঞ' 'ন' 'ম' নাসিক্য ধ্বনি হওয়ায় ঝাড়খন্ডী বাংলাতে এর প্রভাব পড়েছে ফলে শিষ্ট মান্য চলিতের তুলনায় এই ভাষা 'মটা' বা মোটাভাষা। ও > অ, অ > ও, ং > ম, সংসার > সোমসার।

বিভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির অবস্থান, তত্ত্বব ও প্রকৃতি

অ আদিতে আছে অমূহা (অ-প্রভাত ঝা বা) অধুয়া অধৌত হড়, লড় এ অটুয়া (মুলুক) অসঠা কথা। সাঁওতালীতে অকারে, অল, জম।

খ লঘু অঃ অড়, অল্‌মা, অপ্‌সট্‌ অন্‌হেলা ঝাড়খন্ডীতে সাঁওতালীতে খন, খান, খঃ চ মধ্যে আছে শিমল (শাল্মলী), ঝড়িয়া (ঝটিকা) সাঁওতালীতে খাটাও

উৎপত্তি ঃ আ মূল থেকে অইরা (আভীর), গতর (গাত্র)

প্রত্যয় যোগে ঢাকই (ঢাকায়, বাড়ী বাড়ী গালি আল্য, অল্যল ল-শাড়ী) ওড়িয়ার প্রভাবে (আ > অ) রজা (রাজা), পতা (পাতা) নির্দেশক টা > ট আমার কথাট শুইনে জা।

উ > সবন্‌ নখা, সবরনরখা (সাঁওতালী) (সুবর্ণরেখা), গছ (গুচ্ছ), রগনা রুগ্ন।

এ > নার্‌কল্‌, নাড়কল (নারিকেল) মঁড়েহড়, তেহেঞে।

ও > আদিতে 'অ' 'ও' হিসাবে ব্যবহার হড়রড় ও ঝাড়খন্ডী বাংলা উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয়। ঝাড়খন্ডী বাংলাতে ও, সম্বোধনে ব্যবহার হয় — অ মিনি নাই কাঁগ গ ওঝা > অঝা, বৌ > বহু (বহুবাঁঝা)

সাঁওতালীতে অ > Õ (ৗ) বা উঃ (ু) ব্যবহার আবার কখনো কখনো (ৗ) ই কার হিসাবে ব্যবহৃত হয় গোয়ালা > গয়লা > গুয়লা (হড়রড়)।

ই - ই দেশে - নাই; পুছিম দেশে, রে ভাল উচ্চারণে ঝাড়খন্ডী বাংলা ও পৌরসি ভাষার মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। 'কলের ছানা কলে, ধূলার ছানা গলে'। 'চর (চোর) > চুর হামার ঘরে সাঁদাই ছিল' — গোষ্ঠ > গঠ, জড় < (জোড়া) কঠা < কোঠা; গটা (গোটা) লোস্ট্র > নোড়া > লড়া।

আ নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বর ঃ (বিবৃত)

মূল আ শব্দের আদিতে আশিন (আশ্বিন), আলিস, আপুষ মধ্যে আছে থান (স্থান) ঘাই (ঘাত) কাপাস পৌরসিতে আছে গাজাড়, অন্ত্যে আছে টুপা, বুদা (ঝোপ) ডুভা, নামে ডমা, কিতা, বুকা, লুবা, সাঁওতালী মুহি উৎপত্তি মূল থেকে (আবদ্ধ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলী হলে অঙ্কুশিকা > আঁকশি, গুলাচ (গুলঞ্চ), কাঁকই (কঙ্কতিকা), ছামু (সমুখ)। শ্বাসাঘাত হলে আবস্থা (অবস্থা) তামাল তমাল, কাবাট (কপাট, সাত ডিংলা বিটি রাখিল) মাহাজন (মহাজন), মাহিন্দিরি (মহেন্দ্র) সাহাস (সাহস), চান্ডাল (চন্ডাল)। নাসিক্য সংযুক্ত

ব্যঞ্জণের পূর্বস্বরে চাম্পা (চম্পা, এক গাছ চম্পা দেহ দেওরা ডালি নোয়াই), আন্ধা (অন্ধ) । উদ্‌বৃত্ত স্বরের সঙ্কোচণে থপা (স্তবক)। সমাসবদ্ধ পদ হলে যেমন গরভা (গর্ভ) খাউকি। ধূরাদেশ (দূর) ধারাপিশা, হ্‌কাদিন। অনুকার শব্দ দ্বৈতে ছলাছল, ঝরাঝর, ফটফট, তুচ্ছার্থেও ঘটে যেমন তিরিজনা (স্ত্রী) সরাসতি (সরস্বতী)

ই > ইক্ষু > আখু > আখ (আখ বাড়ির ধারে কার ছেল্যা কাঁদে) স্বরাগমে 'আ' হয় — অবাল (বাল্য) - বিপ্রকর্ষ ঘটলেও - বিক্রম > বিক্‌রাম, ব্রতী > বারতি

'ই' উচ্চাবস্থিত সমুখ স্বর (সংবৃত)

আদিতে ইঁদ (ইন্দ্র) ইঁতা (ইঙ্গিত), ইচড়া

মধ্যে নিরন্‌ (নিরন্ন) - নিশন্‌ (নিঃশূন্য ডিং, ডিঙ্গা (পৌরসী শব্দ)

অন্তে - থিতি (স্থিতি) কুথার লে আলে বধূ কুথায় তুমার থিতি) টাটি (অস্ট্রিক শব্দ) (টাটি ভাঙ্গে দহিটা সব খা'ল্য)

স্ত্রী নামে - সুগী, দিলি, লিদি

দ্ব্যক্ষর শব্দে গগ্‌লি, গুঁদুলি

স্ত্রী নামে - কারমি, পুটকি

উৎপত্তি

অ > 'ই' — সজ্ঞান > সিআন

আ > 'ই' — পার্শ্ব > পিশ

ঈ > 'ই' — দীপক > ডিবা,

উ > 'ই' — বায়ু > বাই, পরমায়ু > পরমাই, বাহু > বাঁহি, যৌবন > জউবন > জইবন

ঋ > 'ই' — শৃঙ্খল > শিকড়ি, ঘৃণা > ঘিনা

এ > 'ই' — কেতক > কেয়া > কিয়া। সাঁওতালী উচ্চারণে বেলা > বিলা, সে > সি

অপিনিহিতি ও স্বরবিপর্যাসে লঘু 'ই' — কুল > কুইল, চুল > চুইল, মার > মাইর, কুঠার

> কুইড়ার; কঞ্চি কুঁইচি, খাট > খাইট, কোদাল > কদাইল। কুটার > কুইড়ার আদি স্বরাগমে — স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন (আমার টুসুর একটি ছেল্যা ইসকুলে দিব)

মধ্য স্বরাগমে — কৃপণ > কিরপিন্ (তোমার কিরপিন গিরি আমার দেদার পছন্দ)

সম্প্রসারণে — বিআনী (বেয়ান) (আইসহ বিআনী, বসতে দেলঅ উচা পিঁড়ায়)

স্বরভক্তিতে — মহেন্দ্র > মাহিনদিরি, গৃহস্থ (গিরস্ত) (বাহিরিয়া দেখল দিদি, কত বড় গিরস্তর বেটা ডালিক)। মৃগী (মিরগী) (ঝটিতলে মিরগী সামাইছে) বৃক্ষ (বিরিখ) (যে বিরিখের ডাল নাই তার জীবনের আশাও নাই) জ্ঞান > গিয়ান (আমার গিয়ানে এমন কথা শুনি নাই)। ধ্যান > ধেয়ান (ধেয়ান করিয়া তাকে ডাক) হড়-রড়তে ঈ মূল 'ই' ক্ষেত্রে সীমিত যেমন সংগী < সঙ্গী। সঁখী সাথীর দেখা পালে বলইব মনের কথা।

উ পশ্চাদবস্থিত কুঞ্চিত উচ্চস্বর ঃ

শব্দের আদিতে উ রক্ষিত আছে, — উপকার / উব্গার, উখুলা, উকুন।

অস্ট্রিক শব্দ — হুঁড়রা, হুডুপ। সাধারণ শব্দে 'উ'এর ব্যবহার — বধূ > বহু (মূল শব্দ প্রাকৃত), মধু > মহু, ইক্ষু > আখু, লুটু, কেড়ু (ছোট কাড়া)। ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে ফুচু, ডুগু, দ্ব্যক্ষরীভূত নামে — পুইতু, কুইলু, হাগরু, ডিবরু। আদরার্থে ব্যবহৃত — অধবা; তুচ্ছার্থক উ — প্রত্যয়ান্ত শব্দে — ফুলু, লালু, হারু (গাই ন গরু, নিচিত ঘুমায় হারু) অনুজ্ঞা বাচক — ঘুমা > শু; নুয়ে > নু; ধুয়ে > ধু।

উৎপত্তি ঃ অ > উ — স্তম্ভ > থুম্ভি, অগ্র > আগু, ভিন্ন > ভিনু, সর্ব > সব। সাঁওতালী উচ্চারণে এই প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি — কলস > কুলসী, নদী > লুদী, মণি > মুণি, নরসিংগড় > লুরসিংগড়, বসিয়া > বুসি।

আ > উ — বিনা > বিনু; পশ্চাৎ > পেছু; ইন্দুর > উন্দুর; বিন্দু > বুংদি,

ঋ > উ — ঋজু > উজু, শৃঙ্গ > শুয়া, চল্লাগাছে শুয়াবালী হয়েছে।

ও > উ — রোম > রুয়া, কোণ > কুন, গোয়াল > গুহাল। দামোদর > দামুদর, কোকিল > কুইনি, সাঁওতালীতে খরস্রোত > খরসুতী, লোভ > লুভ, শোভা > শুভা, জোর >

জুর, লৌহ > লুহা।

স্বরবিপর্যস্ত লঘু উ — অনেকটা লঘু 'ই'র মতো, আউক, আউখ, সবু > সউব, ঠাকুরাণী > ঠাউকরাইণ।

সম্প্রসারণে — স্বর্ণ > সুনা (ওড়িয়া), স্বর্ণ → সু + অর্ণ

স্বরসঙ্গতিতে — কলু > কুলহু, সরু > সুরু

স্বরভক্তিতে — শুকলমনি, মুলুক,

এ মধ্যাবস্থিত সমুখ স্বর, অর্ধ বিবৃত

এ আদিতে — এড়ি, এড়েং, বেড়েং

মধ্যে — ভেষজ > ভেজি

অন্ত্যে — থেরেথেপে,

ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে — লেচে, ফেঁকে।

উৎপত্তি ঃ

অ > এ — কর্কশ > খেরখেস্যা, বয়স > বয়েস, ফণা > ফেণী

আ > এ — ডানা > ডেনা, দাঁড় > দেঁড়কা, জামাই > জামেই

ই > এ — হিম > হেমাল, পিপ্পল > পেপল, হিমানী > হেমানি

উ > এ — নূপুর > নেপুর, কুমুদ > কুমেদ,

ঋ > এ — বৃন্ত > বেঁট, ধৃষ্ট > ঠেটর।

স্বরসঙ্কোচনে — নিয়ম > নেম, বিধবা > বেবা।

স্বরভক্তিতে — গ্রাম > গেরাম; শ্রাবণ > শেরাবন;

ও পশ্চাদবস্থিত বর্তুল মধ্যস্বর

আদিতে 'ও' — অজলত > ওজলোত, অসার > ওসার।

উৎপত্তি ঃ

অ > ও — ঘট > ঘোট, কদলক > কদোল

ই > ও — স্থির > ঠোর,

উ > ও — কেবল সাঁওতালী উচ্চারণে উড় > ওড়।

ঔ > ও — পৌষ > পোষ,

স্বরভক্তিতে — শ্লোক > শোলোক;

অ্যা - ইয়া প্রত্যয়ের সংশ্লেষিত উচ্চারণ - মাদলিয়া > মাদল্যা, ঝুমুরিয়া > ঝু'মর্যা

'ই' স্বরের বিপর্যয় — হালিয়া > হাইল্যা (অপিনিহিতি)।

যৌগিক স্বর

সাঁওতালী যৌগিক স্বর সম্পর্কে Rev. P. O. Bodding বলেছেন — of these the following diphthong combinations are used –

ạe, ao, ại, all ẹa, eo, e̱o, e̱i, co, iạ, io, iu, oa, oẹ, o̱ẹ, oị, uạ, ui, which may all be nasalized; the sign of masalixation is for the sake of convenience ordinarily put only on the first part of the dipthong, although of course, the whole combination partakes of the nasalization.[৩]

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষায় দ্বিস্বর ধ্বনি অনেক, এদের উৎপত্তি ও অবস্থান এরকম —

১. অই — আদিতে আছে — আভীর > আইরা; খালহই, কালহই, বাবই (দড়ি) শালই, পালই।

উৎপত্তি — অউ > ভউ (ভাতৃজায়া > ভাউজি) (ভোজ, সাদড়ী, ওড়িয়া → ভাউজ), ভগিনীপতি > বহণই,

অব > অউ — নবতন > লউতন,

ওই > গই > অই — গোবিষ্ঠা > গঁইঠা, যৌবন > জউবন > জইবন।

২. অউ ঃ আউ > অউ — ভাতৃজায়া > ভাউজি > ভউজি,

ঔ এর বিশ্লেষিত উচ্চারণ ঔষধ > অষুধ।

আই

আদিতে আছে — আয়ু > আই; আলি > আইড়

মধ্যে — বাইগন < বেগুন, মাইচা,

অন্তে — কোথায় > কাই, মাই, সাই,

উৎপত্তি ঃ

আঈ > আই — স্থায়ী > থাই, শিলাবতী > শিলাই, জাতীফল > জাইফল

আঅ > আই — ঘাত > ঘাই, আইঅ > আপিত,

আউ শব্দের আদিতে আছে — হাঁটু > আউঠ,

মধ্যে — সুধুকারী > সাউকারী,

অন্তে — মামাউগা

আও — বাঁওল, গাঁওলা, চাঁওলা

ইআ — এর > ইআর; একে > ইয়াকে, পেয়ারা > পিয়ারা, হাঁড়িয়া,

ইই — লিই, দিই

ইউ — বিউগুল

ইএ — য-যুক্ত-লিয়ে

উঅ — টুঅর, টুবর

উআ — সুয়াদ < স্বাদ, ধানুয়া, ভাতুকা,

উই — উই, টুঁই, হুই, শুই

এই — বিলেই, ফলেই

এউ — তেউড়

ত্রিস্বরধ্বনি

আইঅ — মাইয়া, দাড়াইয়া

আওয়া — আওয়াছি

ইআই — ই এই, লিয়াই, লিয়েই

উএই — শুএই, নুয়েই

চতুঃস্বর

আওয়াই

খাওয়াই

আনুনাসিক স্বরধ্বনি অ (অঁ)

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষা ও পীরসি উভয় ভাষাতেই স্বরধ্বনির উপর আনুনাসিকতা দেখা যায়। ফলে পীরসি ভাষার যে ঝাড়খন্ডী বাংলার উপর পড়েছে তা চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ব্যাকরণ মতে সংস্কৃতের প্রতিটি স্বরের নাসিক্যভবন সম্ভব। কথ্যভাষাতে বাংলাতেও। পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গে নোয়াখালী চট্টগ্রামের কথ্যভাষাতে নাসিক্যভবনের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাসিক্যতার 'আগম' কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায় গেছে বলা শক্ত। স্বাধীনভাবেও থাকতে পারে আবার একের প্রভাব অন্যের উপরে পড়তেও পারে।

অ (অঁ) - খন্ড > খঁড় — জলে পালয়ের খঁড় গুলা ভিজে গেলছে।

বঁঠা (বৃন্ত), ভঁতা — কাঁঠালের ভঁতাটা গরুটায় খঁচ খঁচ করেঁ চিবাচ্ছে।

মটতি > ঝঁট, করি > কাঁচি

আনুনাসিক আ (আঁ)

শব্দের প্রথমে আনুনাসিক — আঁউছা, আঁট, আঁক। অঙ্ক

শব্দের মধ্যে আনুনাসিক — ছাঁচা, জাঁতাঁল, পাদাঁড়, পালাঁই, হিলাঁই

যৌগিক কালের ক্রিয়াপদে — যাঁয়েছে, যাঁয়েছিলি, খাঁয়েছিল,

উৎপত্তি ঃ

সংযুক্ত নাসিকা ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে — কান্ড > কাঁড়, অঙ্কুশিকা > আঁকুড়শি, কণ্ঠী > কাঁঠি, ভঙ্গ > ভাঁগড়, খন্ড > খাঁড়রা

ম (নাসিকা ও ব্যঞ্জন ধ্বনি) লুপ্ত হলে — আমলকী > আঁউলা, চামর > চাঁঅর,

স্বতোনাসিক্যীভবন — কর্কটক > কাঁকড়া, কক্ষ > খাঁক, ছায়া > ছাহরা, বাহু > বাহি

আনুনাসিক ই (ইঁ)

আদিতে ইঁ এর উচ্চারণ — ইঁদ, ইঁঝল, পিঁঝল,

মধ্যে ইঁ এর উচ্চারণ — বিঁড়া, বিঁড়ি,

অন্ত্যে ইঁ এর উচ্চারণ — পাইঁ, লিইঁ।

উৎপত্তি ঃ সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন যদি লুপ্ত হয়ে যায় — হিন্দু > হিঁদু, নিশ্চিন্ত > নিচিঁত

অনুস্কার লুপ্ত হলে — হিংসা > হিঁসা,

স্বতোনাসক্যীভবন হলে — তিক্ত > তিঁতা, বীজক > বিঁঝা,

আনুনাসিক উ (উঁ)

শব্দের আদিতে আছে — উঁদুর, গুঁদুর, হাঁড়ি > উঁধি

শব্দের মধ্যে আছে — ঠুঁঠি, ধুঁন্দা,

শব্দের অন্তে আছে — কুঁচ > বুঁজ, হুঁড়রা

অসমাপিকা ক্রিয়ায় — শুয়ে > শুঁই

উৎপত্তি ঃ

সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে — সুন্দরী > সুঁদরী, কুম্ভ > কুঁদা

ম-লুপ্ত হলে — ভূমি > ভূঁই, ধূম > ধূঁয়া (হিন্দিতে নাসিক্যভবন 'য়া' (আ) র উপর। কিন্তু বাংলা উপভাষাগুলিতে ধ-ড় র উপর মান্যচলিত ধোঁয়া)।

স্বতোনাসিক্যাভবন হলে — কুপ > কুঁই, রোজি > রুঁজি, যূথী > জুঁই, ক্ষুদ্র > খুঁদি।

আনুনাসিক এ (এঁ)

শব্দের আদিতে — এঁড়, এঁড়রি,

শব্দের মধ্যে — কেঁদ, কেঁদরি, কেঁড়রি

শব্দের অন্ত্যে — খাঁয়েঁ

উৎপত্তি ঃ সংযুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে — গ্রন্থি > গেঁট

স্বতোনাক্যিভবনে — ধৃষ্ট > বৈঁটা, √ হেঁশরা।

অলুপ্ত ঃ স্বরলোপ

আদি স্বরলোপ — অরণ্যে > রণে অর্থে বনে; ঈর্ষা > রিষা (বর্ণ বিপর্যয়), অপিধা > পিঁধা,

মধ্য স্বরলোপ — জীবন্ত > জীমতা; ফুটন্ত > ফুটনা, বল্কল > বাকল, কোটর > কটর

স্থান নাম — প্রস্তর > পাথরা, কদম্ব > কদমা,

ব্যক্তিনাম — হেমন্ত > হেমতা, অনন্ত > অন্তা

আ লুপ্ত — সাধারণ শব্দে-পতাকা > ফতকা, প্রচার > পচরা, জিলিপি > ঝিলিপি

গ্রাম নামের ক্ষেত্রে — বেনা > বেনদা, শিলা > শিলদা,

যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে — তেড়-বাঁকা (তেড়া, বাঁকা)

রা-লা-লি অথবা স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হলে — আমাদের > হামাদের, ডাঁশলা, ঢেশরা, ঠুঁটরা

দার প্রত্যয় যোগে — মাহিনাদার > মাহিন্দার, থানাদার > থানদার।

সমীভবন গত — পুরাণা > পুন্না (পুন্না চাল ভাতে বাড়ে)

ই লুপ্ত —

সাধারণ শব্দে — সূতিকা > ছুঁতকা, কুটিল > কুটিল্যা, কাহিনী > কাহনী।

আদরর্থে ও তুচ্ছার্থে — নাতিন > নাতনি, নাপিত > নাপত্যা।

দিক নির্দেশক সর্বনাম শব্দে — এদিকে > ইদ্‌গে, ওদিকে > উদগে (ঘোষীভবন)

বহুবচনে গিলা বিভক্তির যোগে নির্দেশক সর্বনামে — এগুলি > ইগলা, সেগুলি > সেগলা।

সমীভবনগত দ্বিত্বত্বের পূর্বে — হরিতকী > হত্তকী, সজিনা > সজ্না > সন্না।

উ লুপ্ত

সাধারণ শব্দে — কুখড়া, খুকড়া < কুক্কুট, অঙ্কুর > আঁকরি, সিন্দুর > সিঁদর।

ব্যক্তিনামে — আঁকশি (অঙ্কুশিয়া), কাবুলি > কাবলি।

গ্রামনাম — ডুমুর > ডুমর্‍্যা, পুখুর > পুখর্‍্যা

এ লুপ্ত — সেঠেকার > সেঠকার।

ও লুপ্ত — কপোতী > কপতি।

অন্ত্যস্বরের লোপ —

অ লুপ্ত — কুম্, বিত্ < বিত্ত।

আ লুপ্ত — লতা > লত্, আশা > আশ, ধাক্কা > ধাক্, খোঁচা > খোঁচ্, ত্বরা > তর্, শাল > শাল্, পাতা > পাত্, মাপা > মাপ্, চাষা > চাষ, কষা > কষ্, সজ্জা > সাজ্, বন্যা > বান্, জিহ্বা > জিভ্, মোহানা > মুহান্, ধাক্কা > ধাক।

ই (ঈ) লুপ্ত — যোগিনী > যুগইন, রোহিনী > রইনি, রীতি > রীত, পিরীতি > পিরীত > প্রীতি।

স্ত্রীবাচক — ভগ্নি > বহিন, গতি > গত, ইনী > ইণী।

শেষ স্বর লুপ্ত — তাঁতিনী > তাঁতিন, গুলীন > গোয়ালিনী।

উ লুপ্ত

চঞ্চু > চঁচ, আকু > আঁক, ইক্ষু > আখ।

স্বর বিপর্যয়

রুমাল > উরমাল, আঁচল > অঁচাল।

স্বর বিকল্প

একই শব্দ একাধিক বিকল্প স্বরে উচ্চারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে

অ/এ — খকরা/খেকরা

অ/উ — খসনা/খুসনি

অ/এ — মজুর/মেজুর

আ/এ — খাজাড়ি/খেজাড়ি, হাবড়/হেবড়

আ/ই/এ — দাঁড়কা/দিঁড়কা/দেঁড়কা

ই/এ — খিয়াস/খেয়াস, কিরাট/কেরাট, খিসড়/খেসড়।

সাঁওতাল পরগণার হড়্-রড বা পীরসি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঐ ভাষাগুলির চেয়ে শিষ্টতর বলে বিবেচিত হয়।

ব্যঞ্জন ধ্বনি ভিত্তিক পরিবর্তন ঃ

কণ্ঠ্যধ্বনীয় ভবন ঃ মুজ্জিত > মিজকা (ত > ক); ছড়াছড়ি > কেরেকাট (ছ > ক) (শ, স > ছ দক্ষিণবঙ্গেও লভ্য)

তালব্যীভবন ঃ সম্মুখ > ছামু (স > ছ); শ্রী > ছিরি (শ > ছ) ঘন > ঘেঁচো (ন > চ)

দন্ত্যমূলীয় ভবন — ছাড়াকামড়া > ছিলাকামড়া (ড় > ল); ছিনিমিনি > ছিলিবিলি (ণ > ল)

র-কারীভবন — ছাড়কাঠ > কেরকাট (ড় > র), ভন্ডুল > ভোঁড়ের (ল > র)

উষ্মীভবন — উদাস > উসাস; হাল্কা (দ > স) উদ-অম্বল > উসমুলিয়া (দ > স), বধূ > বহু (ঘ > হ), লতা > নহ (ত > হ), মুখড়া > মহড়া (খ > হ)

মূর্ধণ্য ধ্বনির ওষ্ঠ্য ধ্বনিতে রূপান্তর ঃ ঘুটঘুটিয়া > ঘুপঘুপিয়া (ট > প)

মূর্ধন্যীভবন ঃ পাতন > পাটন; যেথাকে > জেটকে; সে স্থানে > সেঠানে > সেঠে/ সেঠকে; বজ্র > বজোড়, ছাঁদনা > ছামড়া, কুত্র > কুঠে/কঁঠে; নারিকেল > নাড়িয়া, লাঙ্গল > নেঁগড়, কত > কেড়ে, ফালা > ফাড়া, হরিৎ > হড়র; খচ্চর > খ্যাঁচড়

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি মাত্রই মহাপ্রাণ।

একক ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঃ

অল্পপ্রাণ থেকে মহাপ্রাণে পরিবর্তন ঃ

যেতাম > যাইথম, করিতাম > কইরথ্‌ম, ডোবা > ডভা, দাঁড়িয়ে > দাঁড়াঞে, পারবে > পাইরবেক, বাঁটি > বাঁটিন, জবাই > জভই।

মহাপ্রাণ থেকে অল্পপ্রাণীভবন ঃ শাঁখা > সাঁকা, গুম্ফ > গোম্ফ, গোঁফ > গোঁপ, সাধ > সাদ, ক্ষুধা > খিদা, ভিখারী > ভিকারী, চোখ > চইক, পাখি > পাইক, খোদাই > কুদা, নিভ > নিমা।

কক্ষ > কাঁক, কুঠার > কুড়াইট, গ্রন্থি > গাঁইট, কুম্ভকার > কুমার, বাহু > বাজু।

মহাপ্রাণ থেকে উষ্মীভবন ঃ কুম্ভীর > কুমহীর (> কুমির), মধুয়া > মহুয়া মহুল (> মোল)

অল্পপ্রাণ থেকে উষ্মীভবন ঃ পুয়াল > পুহাল, আড়াল > আহড়, সিদ্ধ > সিজহা > (সিজা)।

ঘোষীভবন ঃ বক > বগ, শাক > শাগ, দিক > দিগ, ফোকলা > ফগলা, বৈশাখ > বইসাগ, ধোপা > ধবা, নাপিত > নাবিত।

অঘোষীভবন ঃ হুজুক > হুচুক, রসগোল্লা > রসকল্লা, বাদালি > বাতালি, খবর > খপর

বিপর্যাস ঃ ব্লাউজ > লাবুজ, রিক্সা > রিকসা, বাতাসা > বাসাতা, লোকসান > লুকসান, আবর্জনা > জবরা, ফোঁটা > ঠঁপা।

হ-এর বিপর্যাস ঃ হাঁটু > আঁঠু, কাঁধ > খাঁদ, কক্ষ > কক্‌খ > কংক্‌খ > কাঁখ।

বিষমীভবন ঃ

নাসিক্যধ্বনির ঃ যমুনা > জবুনা, সঙ্গ > সঙ, নাতি > লাতি > লাইতণা, নূতন > লইতণ, (অর্ধ তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার)

দন্ত্যধ্বনির পরিবর্তন ঃ কৃষ্ণ > কিসট্, বিষ্ণু > বিষটু, নদী > লদি, থান > ঠান।

মূধণ্য ধ্বনির পরিবর্তন ঃ খচ্চর > খ্যাঁচড়।

অন্যান্য ধ্বনির পরিবর্তন ঃ পেঁপে > ফিপা, লাঙ্গল > নাঙ্গল > নাঙল।

সমীভবন ঃ অদ্য > অজ্জ > আজ, ভর্তি > ভত্তি, সেচ > ছেঁচ, নল > লল, যাচ্ছি > যাচ্চু (ওড়িয়া)। করছিস > করচু, সজনা > সণ্যা, হরিতকী > হরত্বকি > হত্তুকি।

মূধন্যীভবন ঃ গ্রন্থি > গাঁইট, তির্যক > ট্যাঁড়া, স্থান > থান/ঠান, গর্ত > গাঢ়া, উদর > ঢোডর, ঢড়া > ধড়া (গর্ত)।

চুঁইথা > চঁথা ।

তালব্যীভবন ঃ ভেদ > ভেজা, সন্ধ্যা > সইন্‌ঝা (সইঞ্ঝা) > সন্‌ঝে, ব্যথা > বাজা, মধ্য > মাঝ, লালসা > লালচ, ফর্সা > ফারচা, শ্রী > ছিরি, শুষে > চুঁষে, শুষ > চুস, সেচ > ছেঁচ >ছ্যাঁচ।

ক > প — সড়ক > সড়প।

ন > প — নীল > লীল, নালা > লালা, নাতি > লাতি, নিয়ে > লিয়ে, নরম > লরম। নবার > লবাব, নগদ > লগদ, নজর > লজর,

নড়া > লড়া, নতুন > লইতন, নড়ে > লড়ে, নিয়ে > লিয়ে/ লিয়ে।

ল > ন — লুচি > নুচি, লোহা > নোওয়া, লবন > নুন, লাঙ্গল > নাঙল,

র > ল — রথ্যা > লচ্ছা (loccha) > লাছ — লাছ দুয়ারে হুকুড় কুটুম লাছ লাগেছে। উগার > উগাল (জমিতে উগাল হইয়েছে পাখনা দিয়া হয় নাই।)

ল > ড় — অর্গল > আগুড়, কলি > কুঁড়ি, দামাল > দামড়া

ড > ড় — গর্ত > গাড্ডা > গাঢ়

প > ড় — ঝোপ > ঝাড়

ছ > ড় — পাছা > ফইড়া

ড় > ঢ় — আড়া > আঢ়া, বুড়ি > বুঢ়ি, বুড়া > বুঢ়া, গাড়া > গাঢ়া

ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ ঃ

হ ধ্বনির লোপ — উহার > উয়ার, হাঁটু > আঁঠু

য় লোপ — বায়ু > বায় > বাউ, ক্ষত্রিয় > ছত্রিয় > ছত্রি, নারায়ণ > লারাণ

স লোপ — কার্পাস > কাপাস > কাপা

ন লোপ — অস্ট্রিক শব্দে ন এর লোপ ঝাড়খন্ডী বাংলায় প্রভাব পড়েছে যেমন, — ন > ল, নিলাম > লিহলাম, লীলাম > নীলাম। মনকেরা তিরি যদি ইলামে যায় ত জলকেরা জমিবিকি বিচার বসিব।

সমধ্বনির লোপ — গান্ডিববান > গান্ডিবান, শ্বাশুড়ি > সাউড়ি (শব্দদ্বৈত)

ব্যঞ্জণধ্বনির আগম ঃ

ক ধ্বনির আগম — আছাড় > কাছাড় (বেশী কাঁইদ্‌লে তুইলে কাছাড়ে দুব)

গ ধ্বনির আগম — ঝাড়গ্রাম > ঝাড়েগ্‌গেরাম।

ঘ ধ্বনির আগম — উলটা > ঘলটা।

ট ধ্বনির আগম — ডগা > টগা।

ন ধ্বনির আগম — বটি > বটিন।

ল ধ্বনির আগম — নাল > লাল।

হ ধ্বনির আগম — জুয়াল > জুহাইল, পালা > পাল্‌হা, লালা > লালহা।

গায়ক > গাহক, পোনা > পহ্‌না। আমি > হামি, আড় > আহড়।

রূপতত্ত্ব

কারক ও বিভক্তি ঃ

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষায় কারক কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, নিমিত্ত, সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদও দেখা যায়।

কর্তৃকারক —

শূণ্যবিভক্তি, এ বিভক্তি, য় বিভক্তি কর্তৃপদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শূণ্যবিভক্তি ঃ

'ছানা কাঁদে হরগরল'—

'শাশুই বাঁটে দুটি দুটি ভাত গো'।

'ঝিরিহিরি বইছে লদী দু ধারেতে কাতা যায়'

এ বিভক্তি ঃ

বিড়াইলে ধইরেচে উঁদুর

বিড়াইলে হাঁড়ি খাঁইয়েছে বউ এর কি দোষ।

মানুষে পায় নাই ভাত কাগে খায় ভাত।

য় বিভক্তি ঃ

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়।

কন ভোঁদায় লিয়ে গেল শুকনা গামছা।

কালায় বাজায় আড়বাঁশী।

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর হড়রড়ে নামপদের সম্বন্ধ বাচকতা ছাড়া আর অন্যান্য বাচকতার দরকার হয় না। পীরসিতে কর্তা ও কর্ম বোঝানোর জন্য কোন শব্দ বা শব্দাংশ জুড়ে দেওয়া হয় না। শুধু কর্তার বা কর্মের চিহ্ন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

কর্ম কারক ঃ

শূণ্য কে, য়, এ, রে বিভক্তি যুক্ত হয়, তাছাড়াও করে, করি, ভরে অনসর্গও দেখা যায়।

শূণ্য বিভক্তি ঃ

পাইরা মাইরতে যাব

জামাই বইলে চুমালি বুড়া কাড়া।

কে বিভক্তি ঃ

আমরাকে ডাইকবেক।

বাছুরটাকে চইরতে দে।

য় বিভক্তি ঃ

তুমায় আমি ধুয়া ব ঘষে ঘষে।

যাও কালাচাঁদ তুমায় আর ডাইক না।

ছানায় কাঁদছে আর ভাত খাইচ্ছে বইসে বইসে।

'রে' ঃ যারে ভালবাসি তারে দুব পানি।

করে অনুসর্গ ঃ মন করে ঘরের বিতরে সামাই।

করি অনুসর্গ ঃ মনে করি শিলচর জাব।

ভরে অনুসর্গ ঃ জল ভরে আনা যায় নাই।

আবার নামপদের সঙ্গে ণ্ বা অন প্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন —

এমন নাচন নাচাইল। (অন)

এমন গান গাউয়ালি। (ন)

সমধাতুজ কর্ম

নিমিত্ত কারক ঃ

কে বিভক্তি এবং লেগে, তরে, জন্যে, থেকে, বইলে, কইরে, অনুসর্গ যুক্ত হয়। আবার এগুলির পূর্বপদে 'র' 'এর' শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়।

লেগে — তোর লৈগে আঞ্জির আইনেচি (এনেছি)

মধুর লেগে আঞ্জির আনা হঁইনচে (হয়েছে)

এর — রামের লাইগে আমার খুব কষ্ট হয়।

শূণ্য — *ঠেঁটা গুরুকে বাউরি বাগাল।*

বইলে কইরে — দুদিনের জন্য ঘরটাকে দেখার জন্য অতনুকে বইলে কইরে আই্‌ল্‌ম।

করণকারক ঃ

দ্বারা, দিয়ে অনুসর্গ ছাড়াও এ, য়, এর, র বিভক্তি এবং কইরে অনুসর্গ দ্বারা করণ কারক গঠিত হয়।

দ্বারা — আমার দ্বারা উ: কাজটা হবেক নাই।

দিয়ে — তকে দিয়ে আমার কাজ না করানটাই ভাল।

— ডাং দিয়ে গরুটাকে পিটা।

এ বিভক্তি — টগর ফুলে তোর মন ভুলাব।

মাগা দুধে কি ছানা মানুষ হয়।

গরমে গরম কাটে।

বিষে বিষ কাটে।

বিহা ঘরে মাইয়া রাজা।

য় বিভক্তি — ছানাপনায় তোর ঘর ভর্তি।

দুধি লতায় ছামড়া বাঁধব।

র বিভক্তি — ঝাঁটার মুঢ়ায় পিটে তোর পিরিত ছাড়াব।

এর বিভক্তি — তুই ধনি ঘুমের মরা, ঘুমাই ভুলে জাইস না।

করে অনুসর্গ — খেলাটা গলাবাজি করে জিতে গেল।

অপাদান কারক ঃ

বিভক্তি ও অনুসর্গহীন অপাদান কারকের পদগুলির মধ্যে সাঁওতালী মুন্ডারীর প্রভাব আছে। থিইকে / থেইকে / থাইকে / থাকুন, লে অনুসর্গ এর-র শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়।

থিইকে — বন থিইকে/ থেইকে/থাইকে বাইরাল্ল হাতি।

থাকুন — পুকু্ঁর থাকুন মাছ বাইরাচ্ছে।

লে — মায়ের লে মাউসির দরদ বেশি। মেঘের লে হুঁল পড়ইছে।

এর — নদীর জলে ভাইসে আই্‌সেচে।

অদিকরণ কারক ঃ

'এ' 'তে' কে, যে, য, শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়। কইরে, বইলে, দিগে অনুসর্গও ব্যবহৃত হয়।

এ বিভক্তি যোগে — ঘরে নাই নুন তার বেটা মিঠুন।

তে বিভক্তি যোগে — ঘরেতে মন নাই, মাথাতে টুকরী।

কে বিভক্তি যোগে — ঘরকে চল।

য়ে বিভক্তি যোগে — কুলহিয়ে লোক চলে।

য় বিভক্তি যোগে — কুলহি মুড়ায় মাদইল বাজে।

শূণ্য বিভক্তি — আইজকে বন জাব।

কইরে — পালই কইরে ধান রাখ।

বইলে — ঘর বইলে কথা দুটা টাকা রাখ।

দিগে — ঘর দিগে চল।

সম্বন্ধ পদ ঃ

সাঁওতালী গানে ও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুন্ডারী সম্প্রদায়ের কথ্য বাংলায় লুপ্ত বিভক্তির সম্বন্ধ পদের ব্যবহার অনেক বেশি। সাঁওতালী ভাষায় বুরুচেতান (পাহাড় উপরে), গাঢ়া তালরে নদীর মাঝে প্রভৃতি পদ রীতির প্রয়োগ বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ওড়িয়াতেও

তাই। রামর ঘর ⟶ রামঘর = সম্বন্ধ পদবাচক বিভক্তি লোপ পায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বলেছেন — "ডমজুড়ি (ডমজুড়ির) ডমা আখড়া ভিতরে পনামুদি ধারায় দিল' বিটি কড়িল ফাতু (ফাতুর) কুটুম নাই লাগে"।[৪]

সম্বন্ধপদে র, এর, কা, কার, কে, শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয় —

র বিভক্তি যোগে —

আমার টুসু গোঁসা কইরেছে গোঁসার কপাট খুইল্য না।

কুলি মুঢ়ার ফুদকু ধূলা উড়ল্য বাতাসে। (ঝুমুর)

এর বিভক্তি যোগে —

ধুরের কুটুমের খাতির বেশি।

আগ ডালের ডাঁসা আঞ্জির আগেভাগে পাউড় না। (ঝুমুর)

কার বিভক্তি যোগে —

আইজকার ভাত, কাইলকার বাসি ভাত।

কের বিভক্তি যোগে —

আইজকের বটেত। সাঁওতালীতে বন কেরি আগুন, মায়কেরি দুধ, বনকেরি বাহা। স্ত্রীলিঙ্গে কার > কেরি। হিন্দি, সাদড়ীর প্রভাব আছে।

কা বিভক্তি যোগে —

বাট সাসুই আপনিকা ভাত গো। (জাওয়াগীত)

কে বিভক্তি যোগে —

লাজ নাই যাকে রাজা ডরায় তাকে। (প্রবাদ)

শূণ্য বিভক্তি যোগে —

জামাই দেখে বিটির আমার মাথা দুখা জ্বর গো। (ঝুমুর)

অন্য গাঁয়ের ছেইলার সঙ্গে ফুল পাতাব।

বাহা লেকান বহু, (সাঁওতালীতে) ফুলের মতন বৌ।

সম্বোধন পদ ঃ

নারী এবং পুরুষদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ ব্যবহার করা হয়।

১. নারী/নারীদের উদ্দেশ্যে পুরুষদের সম্বোধন —

গো — কী গো তুমরা কুথায় গেছলে। (সম্মানার্থে)

লো — কী লো তরা কুথাকে জাবি। (ইচ্ছার্থে)

নারীর উদ্দেশ্যে নারীর সম্বোধন —

গো — কী গো তর ভাত রাঁধা হইল। (রাঁন্ধা > রাঁধা - নাসিক্য স্বর + নাসিক্য ব্যঞ্জণ)

গে — এ গে মাই তর পাটা এত ফুলেছে।

লো — কী লো জলকে যাবি।

ধন — আমার ধন দেইখে খারাপ লাগছিইল।

২. পুরুষের উদ্দেশ্যে নারীর সম্বোধন পদ-এর ব্যবহার —

হে — কী হে কুথা জাবি?

রে — কী রে তুই কুথা জাবি?

বে — কী বে কুথা জাবি?

ব — কী রে ব কলেজ যাচ্ছু না কি?

নিকট আত্মীয়দের ও এর পরিবর্তে এ-এর ব্যবহার করে এবং ঘনিষ্ঠার্থে অ্যা সম্বোধন বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়।

অনুসর্গ ঃ

নামপদ ও অসমাপিকা ক্রিয়া পদ রূপে অনুসর্গগুলি ব্যবহৃত হয়। অনুসর্গগুলির পূর্বপদে-র এ, এর, শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়।

আগু, আগুয়াণ —

আগু ঃ আমার আগু আগু তুমরা চল্।

আগুয়াণ ঃ আমার আগুয়ানে লকটা দাঁড়াইছিল।

উপরে — তর উপরে আমার অনেক রাগ হঁয়েছিল।

এক — গুচ্ছেক লক্ জড় হইয়েঁছে।

কাছ — আমার কাছে একদম আসবি নাই।

কাছ — উয়ার কাছ থেকে টাকা ধার লিতে হবেক।

টাক — ঘন্টাটাক পরে আসবি।

টেক — ইখানে আইসতে ঘন্টাটেক সময় লাই্গল

ঠিন/ঠিনে — সেইঠিনে তাল বন।

ঠিক — আমি ঠিক চই্লে যাইতে পাইরব।

ঠে — তোর ঠে অকে পাঠাব।

তক — আইজ তক উদিগে কেউ যায় নাই।

তরে — তর তরে এমন হলি।

থানে — চাবিটা মাথাসিথানে রাখ।

দিগে — ওই দিগে জাইস না।

ধারে — ওর ধারে জাইস না।

পেছু — উয়ার পেছু খরচ কইরে লাভ নাই।

পাশে — উয়ার পাশে এখন কেওনাই।

বাট — বাড়ি বাটে খেদতে গেলে পাঁদাড়বাটে জাছে। (ঝুমুর)

বিণু, বিণা, বিনে — তেল বিণু/বিনে/বিনা মাথায় জটা।

ভিতর/ভিতরে — উ ঘর ভিতর/ভিতরে আছে।

মাঝু/মাছে — কুলির মাঝে/মাঝু হুকুড় কুটুম লাচ লাগাঁয় দুব।

লে (চাইতে) — মায়ের লে মাউসির দরদ।

সঁগে/সনে — তোর সঁগে/সনে মিছাই ভাব করা।

সাথে — তার সাথে দেখা হইলে বইলে দিবি।

সমতে — ফুল সমেত ডালটা ভাঙ্গে আন।

অসমাপিকা অনুসর্গ ঃ

কইরে (করে) করিয়া > কইরা > (করে) অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির মাঝের অবস্থা — দুটা ভাত কইরে খাবি।

থেইকে/থাইকে/থিকে — তোর থেইকে আমি বড়।

দি — ছুরিটা দি করি কাট।

ভইরে — ঝুড়ি ভইরে ধান লিয়ে আয়।

লেগে — তোদের লেগে আইনেছি।

হতেতে — (দ্বারা, দিয়া) আতে / আনতে

লাগিত — (জন্য) খন, ঠেন, রেণ, প্রাণীবাচক-এর ক্ষেত্রে রেণা ঃ অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে, রে, তে — ওড়ারে (ঘরে), আতোরে (গ্রামে)

রেণ — রামরেণ হপন (রামের সন্তান), আলেরেণ মেরমা (আমাদের ছাগল)

রেয়া — ওড়া ঃ রেয়াধন (ঘরের ধন)

রেণা — আতো রেণা ঃ কাথা। (গ্রামের বিষয়ে কথা)

মেনতে > মনতে — এমনত কাউকে দেখিনি।

কাতে > তে — কাঁদতে কাঁদতে চলেছিলি।

খান — খান কতক লুচি দে।

লেখান — আমেম চালা ঃ খান ইঞহঁ লাইয়ঞে মে — তুমি সেটা জানলে আমাকে বলো

(সাঁ > বা)

ক ঃ ও কে — মধ্যসর্গ, প্রত্যক্ষবাচ্যের বাক্যে সম্ভবপরতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়

অ ঃ এবং গান ঃ মধ্যসর্গের দুটির একটি। এর সঙ্গে অবশ্য ধরতে হবে

গ ঃ — *বিচারের নওয়া কাথা লৌইলেখান গানঃকওয়া।*

পুরুষবাচক সর্বনাম ঃ

উত্তম পুরুষ ঃ

উত্তম পুরুষ একবচনের পদ আমি, হামি এছাড়াও আমা, হামা, হম, মো, হামি রূপটি পাওয়া যায় পুরুলিয়া জেলার চান্ডিল, নিমডি, ইচাগড়, পাতকুম, রামগড় ঝাড়খন্ডের রাঁচী জেলাতেও বুন্ডু, তামাড় এলাকায় ও সাঁওতালী গানে। যেমন —

কিসের টাকা হামি জানি নাই। ব্রজবুলিতে যদিও হামির রূপ পাওয়া যায় এবং ঝাড়খন্ডী বাংলায় মুঞ > মুই এরও প্রচলন আছে যেমন — মুই ত নাই যাবরে। হামকে ছাইড়ে জাইস না।

মকে — বেশি মকমকাইস না।

আমা (আমার) — আমার ঘরে বঁধা নাই কে বাজাইল বাঁশি। (ঝুমুর)

আমারকে (আমাদিগকে) — আমাদেরকে দেখার কেউ নাই।

মধ্যম পুরুষ ঃ

তুই — তুই দাঁড়াল আমি তর সঁগে যাব।

তুঁই — তুঁই ত আলি তোর সঁগের লকটা কুথায় গেল।

তুঁই আনখা কথায় রাগালি।

তুঁই-এর সাথে 'হ' যোগ করে নিশ্চিত করা হয়। যেমন — দাদা তুঁহিই সাঁগাকর সম্মানার্থে

তুমি (তুযমাভি > তুমি) যেমন — তুমি রইলে বন্ধু বিদেশ বিভুঁয়ে।

'রা' (সাধারণ অর্থে) যেমন — তরা আসব বললি কাইলকে আলি আইজকে।

তখে — তখে ভুলতে যে ল নাই পারি। (ক্রিয়ার আগে না-বাচক বা নঞর্থীভবনের উদাহরণ)

তুমাকে — যতনে রাখেইছি মধু সব দিব হে তুমাকে।

তর — তর লাইগে মোর প্রাণ কাঁদে সখাহে।

তর বহুকে কে দিল কাদা।

তহর — তহর ঘরে হামে আর নাই জাব। (ক্রিয়ার আগে না-বাচক বা নঞর্থীভবনের উদাহরণ)

তুমার — কুথার তুমার ঘরবাড়ি।

কর্তায় বহুবচনে তর, তরহা

তর — তর বাড়ি জাঁইছিলি।

তরহা — তরহা কন পথটা দিয়ে আলি।

তুম / তুমরা — তুমরা কে কেমন আছ।

গৌণ সম্প্রদানে তরাকে — মাছপাড়ায় তরাকে ভুলাইঁছে।

সম্বন্ধের বহুবচনে তদের — তাদের ঘরে বইসতে গেলি।

তরাদের — তরাদের লাজ নাইখ/ রাইখ / রাখ।

সাধারণ নির্দেশক ঃ

সেহ — সেহ নৌকায় নদীয়া পাইর দিব।

সেগিলর — গরুগাকে আনতে ছিলি সেগিলর পেট তখনও ভরে নাই।

নিকট নির্দেশক ঃ

প্রাণীবাচক ই — ইসালা শুধুই বকর বকর করে।

অপ্রাণীবাচক ই — ই মিঠাইটা কি দিবার বটে।

সাধারণ নির্দেশক ঃ

সকঃ, = সঃ > সে, নিশ্চয়াত্মক 'হ' যোগে 'সেহঃ' স্বাভাবিক বাংলায় দলান্তে তথা শব্দান্তে যে ব্যঞ্জনটিকে আদৌ সহ্য করা হয় না, তাহল (h) । হয় এটি লুপ্ত হয়, যেমন — আল্লাহ-আল্লা, বাদশাহ্-বাদশা, দরগাহ-দরগা ইত্যাদি ক্ষেত্রে না হয় এর সঙ্গে একটি অন্ত্য অ (উচ্চারণে ও) যোগ করে তাতে খানিকটা ঠেকা লাগানো হয়। যখন দলান্তের হ-এর সঙ্গে দলাদ্যের ব্যঞ্জন এসে লগ্নব্যঞ্জক হ+c তৈরী করে, তখনও এই লোপ এবং স্বরভক্তি এই দুধরনের বৈকল্পিক পরিবর্তন দেখা যায় যেমন তহবিল-তবিল, তহশিল-তশিল, তহকিক-তকিক, তহ্রম-দরম, সংস্কৃত থেকে 'আহ্বান' আজকাল কিমূত 'আহোবান' এই কারণেই শোনা যাচ্ছে (পবিত্র সরকার, বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দেজ পাপলিশিং, ২০০৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৭)। 'সেহ লুভে ল দিদি ঘুরি বসিল' বহুবচনে সেগা-সেগিল, সেগাকে, সেগুলাকে, সেগার, সেগিলার, সেগলায়, সেঁঠে, সেঠিন, সেঠ্কে।

নিকট নির্দেশক ঃ

'ই' — হল নিকট নির্দেশক ইদম > ই — ই দিগে আয়।

প্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে — ই সালা জনমের কুড়ি।

অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে — ই গাড়ীটা যাবে বাঁকুড়া। ই দেশে পন্ডিত নাই।

নিশ্চয়াত্মক অব্যয় যোগে — ইহ, ইহেই — পর কি আপন হয় ইহ জান মনে।

তির্যক কারকের প্রাতিপদিক ইআ — ইআ ছাড়া আমাদের গতি নাই।

গৌণকর্ম সম্প্রদানে ইআকে — ইয়ার লাজ নাই।

অধিকরণে ইঠে, হঠকে, ইঠিনে, হঠনে (সব কটিই নিকট নির্দেশক)

বহুবচনে ইয়ারা (এরা) ইগা, ইগলা, ইগিলা (এগুলো)

সম্প্রদানে প্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে ইআরাকে; ইগাকে, ইগলাকে।

সম্বন্ধে ই আদের, ইগার, ইগিলার, ইগায়, ইগলায়।

হেই (এই) হেই খান টায় বইস। হেইটা, হেইগিলা, হেইগা, হেইগিলার, হেইঠিনে।

হাই (ওই) হাই লকটা হাটে গেছইল। হাইটার, হাইগার, হাইগিলায়, হাইঠে

দূরনির্দেশক ঃ

উ (সাঁওতালী, নাগপুরয়া, পাঁচ পরগণিয়া ও কুড়মালীতে আছে) — ই দিগে বাঁকুড়া উ দিগে মেদনীপুর। ই ঘর কাছে উ ঘর দূরে।

নিশ্চয়াত্মক অব্যয় যোগে উহেই — পুরুলিয়া ও ঝাড়খন্ডে হ-এর আগমে হু।

তির্যক কারকের প্রাতিপদিক উআ — উআকে আমি বলিনি।

গৌণকর্ম সম্প্রদানে উআকে — বইলে দিবি হে আমার সঁয়াকে, দুধিলতায় বাঁধব উআকে

সম্বন্ধে উআর — উআর টুসু সিনাই আলে খাতে দিব কি।

অধিকরণে — উঠে, উঠকে, উঠিনে বহুবচনে উআর — তরা আসলি, উআরা কই।

গৌণকর্ম সম্প্রদানে — উয়ারাকে — উয়ারাকে আইসতে বইলেছি।

সম্বন্ধে উআদের, উগার, উগিলার — উআদের বসার জায়গা দিয়েঁছি।

হই (হোই) হইটা, হইগা, হইগিলা, হইগিলাকে, হইগার, হইগিলার, হইটায়, হইঠিনে।

সম্বন্ধ নির্দেশক ঃ

কর্তায় যে, যেগা যেগলা, যাকে, যেগাকে, যেগলাকে, যার, যেগার, যেগলার, যেঠে, যেঠিনে যন > কন — যন বনে শাল নাই সেই বনে ঝুনঝুনিযেই বড় গাছ।

য, যউ, জিসে — জিসে নাই তিসে দড়, ধান ভাঙতে খর খর।

সংগতিসূচক ঃ

তাউ — তাউ হলি চইখের বালি।

তাহেই — এতটুকু জল আছে তাহেই অত মাছ।

তিসেই — জিসে হয় তিসেই কর।

তন — যনগা ভাল তন গাই কর।

অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নবাচক ঃ

কে, — কুল্‌হির ধারের তেঁতুল গাছটা কে হিলাল।

কা — কার ঘাড়ে দুটা মাথা!

কাখে — কাখে খাবি রে বাঘ বলবি আমাকে।

কিস — (কিসে) — কিসের জন্য এত আকুপাকু।

কই — তুই কই দিলি রে বস্তাটা।

কউ (কেউ) — বিপদ কালে কউ নাই রে।

কন — কন গায়ে সামাইছে হাতি।

নাম সূচক ঃ

ফান্না, ফান্নী — উ ফান্না লকের ঘর গেছে। (ফলানা > অমুক)

যৌগিক সর্বনাম ঃ

ই-সব, উ-সব — ই-সবের দরকার নাই।

উ-সব — উ-সব কথা আমাকে বই্‌ল্যে লাভ নাই।

সর্বনাম জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ ঃ

রীতিবাচক ও গুণবাচক ঃ

জেইসে, জইসনে — জেইসে শব্দ হইল।

কইসে, কইসনে — কইসে ঘর যাবি।

কেনে, কেনি — তর ঘাট কেনি লম্বা।

সাদৃশ্যবাচক ঃ

যেমনু, যমনু, তেমনু — যেমনু ধরা তেমনু সরা।

তেমনি, তম্‌নি — যেমন জাইকল তেমনি বাইরাল।

অমন — অমন দুয়ারচর লক আমি দেখিনি।

কমন — কমন লককে বললি ?

পরিমাণবাচক ঃ

যতক, যতকে, যতকু, যেতকু (সংখ্যায় য) য বার বকি ত বারই কাঁদে।

এতেক, এতক, ইত, ইতু (ইতটুকু ছানার কথা শুন)।

কতেক, কতক, কতি, কেতি — (কতক ধূরে যাইঞেঁ আইটকে গেলি)।

ততেক, ততকে, ততক, ততকু, তত — (যত ধূর যাবি আমিও তত ধূর যাব)।

অতক, অতকু — অতক কথা আমার আর ভালো লাগে নাই।

স্থানবাচক ঃ

কুথা — কুথা হতে আলে বঁধূ কুথায় তুমার ঘরবাড়ী ?

অথা — অথায় একটা ভালাই গাছ ছিল।

এথা — এথা আমরা গাইব।

ইঠে — ইঠে আইজকে পূজা হবেক।

সেআড়ে (ওড়িয়ার প্রভাব) — আমার সেআড়ে তুই চলবিশনা।

কালবাচক ঃ

এখনি, এখনু, অখন — অখন ভোর হইতে অনেক বাকি।

যবকে, যবে, যভে, কবে — যবকে আমি গেছলম্।

ধাতু ঃ

তদ্ভব সিদ্ধ ও সাধিত ধাতুকে বাদ দিলেও কিছু দেশী উপাদান নিয়ে ঝাড়খণ্ডী বাংলার ধাতুকোষ গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে তদ্ভব সিদ্ধ ধাতুগুলির ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অথবা অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি নতুন ধাতুরূপের সৃষ্টি করেছে। ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষায় দেশী শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি। এটা মূলত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ

সান্নিধ্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সাধারণত ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার তুলনায় বেশি পরিমানে দেশী ধাতুর ব্যবহার হয়েছে। তদ্ভব মৌলিক ধাতুগুলিও ধ্বনি পরিবর্তনে অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছে এবং প্রত্যয় গ্রহণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

সিদ্ধ ধাতু ঃ

তদ্ভব সিদ্ধ ধাতু ঃ

√ খা (খাদ্) —

√ রু (রুহ্) —

√ দল (দুল) —

√ ফিঁক (ক্ষিপ্) —

√ শু (স্বাপ্) —

√ মহ (মথ্) —

√ ছুঁ (ক্ষুভ্) —

√ মাঁখ (ম্রক্ষ্) —

√ জির্ (জৃ) —

√ ঝড়ু (ক্ষর) —

√ কান (ক্রন্দ) —

√ চর্ (চর) —

√ লা (স্মা) —

মূল ধাতুর সঙ্গে একিভূত হয়ে নতুন ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে।

√ সিঝ্ (সিধ-য়ু) — আলতি গুলা সিঝাই রাখ।

√ ঘিণ (গ্রহ + ণ) — ঘিন ঘিন করে খাইস্ না।

উপসর্গ যুক্ত হয়ে ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে —

√ উলগ — উগল (উৎ-গল)

√ অদূর — (অব-তৃ নামিয়ে আনা)

√ নিমজ — (নি-মুদ-য-স্লান হয়ে যাওয়া)

√ নিম — (নি-বহ)

√ উচর — উৎ-চারণ করা বা আরম্ভ করা)

√ পিঁধা — (অপি-ধা)

√ পিহ্ন — (অপি-স্না)

√ পা — (প্র-আ-)

√ সাঁধা — (সম-ধা)

দেশি অথবা অজ্ঞাতমূল উপাদান ঃ

লেস (লেপা) (√ লিপ্) — কঠা টাকে মাটি দিয়ে লেস। লাদনা (হিন্দি)

লাদ (চাপানো) — ছা টাকে পিঠে লাইদে সারাদিন ঘুরালি।

রাঁপ (চেঁছে নেওয়া) — দাড়ি চাঁইছতে যাইঞেঁ গালটা রাঁপাইদে।

রুচ (টেনে ছেঁড়া) — সননা পাতাগুলো ভাল করে রুচ।

খঁজ (যোগ করা) — পরীক্ষায় খঁজায় খঁজায় লেখবি।

বিড় (পরীক্ষা) — আমি উয়াকে বার বার বিড়েছি।

হুড় (গুঁজে দেওয়া) — হুড়-কা টা ভাল কইরে দিয়েছি।

টিপ্ (চাপ দেওয়া) — আমার পা টা একটু টিপ্ দিখনি।

পাজ্ (শান দেওয়া) — পথে পাঞঁয়েছি কামার হাল পাজায় দে আমার। (প্রবাদ)

সাধিত ধাতু ঃ

নিজন্ত ধাতু ঃ

মূল ধাতুর সঙ্গে আ যোগ করে √ খেঁতা (খিদা) শোষা, মেলা, √ দল (দলা)

উপসর্গ সহ ঃ সাঁতা (সম-তাপ), নিকা (শি-কৃষ)

নামধাতু ঃ গবা (গর্ভ), ইংতা - হঁতা (ইঙ্গিত), পুহা (প্রভাত), রিসা (ঈর্ষা), লহরা (লহর) উথলা (উত্তাল), উধা (উৰ্দ্ধ), টং (তুঙ্গ)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ মেমা (ছাগালের ডাক), গাঁ, গাঁ (গরু-মহিষের চিৎকার), ভেবা (ভেড়ার ডাক), দুম কেঁচ, দুম, গগা, চেঁচা, থুপ, ফুস, থাস

অজ্ঞাতমূল ধাতু — কেঁদা (ব্যাঙ্গার্থে), ধাদা (অহঙ্কারে কান্ডজ্ঞান হারানো), জিজা (শুকিয়ে যাওয়া), জোসা (নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো), ধাড়া, ঢাড়া (হঁড়ে মারা), থীনা (থিতিয়ে যাওয়া), ফেদা (বার বার বলে ক্লান্ত হওয়া), বেঝ (গাঁইট), ভেস্তা (বাদ), লবধা (মারা), গুড়দা (দৌড়ানো), ঢুসনা (খাওয়া), ঢেসমা (মোটা)।

সংযোগমূলক ধাতু ঃ মূল শব্দের সঙ্গে কৃ, দা, লাগ, হ্ যোগ করে ঃ

স করা (গুছিয়ে দেওয়া) গপ্ কর, সইর করা, সাঁগা হওয়া

কয়েকটি ধাতু একসাথে মিলে ঃ

লেগা (√ লভ্ + √ গম) — নিয়ে যাওয়া। বহয়া √ বহ্ + √ গম) বয়ে নিয়ে যাওয়া

শব্দ ও ধাতু মিলে ঃ

গাধা — (√ গা + ধুয়া)

না বাকে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

লার √ না + — না পারা।

প্রত্যয়যুক্ত ধাতু ঃ

সিদ্ধধাতু, নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে যেমন — ক, ড়, র, ল, স, প, চ, জ

জর-ক (ক্ষর), ফর-ক(স্ফর), ভদ-ক (ভিদ), দল্-ক (দুল), হুল-ক (হুলুক), সাঁদ্কা (সঁম-ধা), সামক (সম্-যা), পারক (পার-কা), ভরকা, তুলকা, উটকা ইত্যাদি।

নাম ধাতুতে ঃ দঁড়ক, দেঁড়ক (দন্ড-) ঢেঁড়ক, জনক, মহক, ঢলক

ধ্বন্যাত্মক শব্দে ঃ দুলকা (দুল দুল শব্দে মারা), ফটকা, ফুটকা, বজক, পুচক, ভুঁকা, পুচকা,

অজ্ঞাত মূলক — লটকা (হি. লটক্না), লেদক, বাউক, মুলুক, টাটকা, উসক, জাবক, ভড়ক

ড়-প্রত্যয় সিদ্ধধাতুতে ঃ

ফেঁকড়া, নিগড়া, জবড়, লেভড়

ড় প্রত্যয় নামধাতুতে ঃ

আঁন্দাড়, মহল

ড় প্রত্যয় ধ্বন্যাতমক শব্দে ঃ

খসড়,

ড় প্রত্যয় সন্দেহমূল ধাতুতে ঃ

গিজড়া, বেঁচড়, রগড়া, লগড়

র-রা প্রত্যয় ঃ

টিহরা (উত্তেজিত), এঁড়রা (বড় চোখে), থড়র (পিছলে), চঁটরা (ঘষে), খেঁটর (খুটা)

নামধাতুতে ঃ গঁড়রা, ছেপরা, ঝঁকরা, পেটরা, খেঁচরা, ছিতরা।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে ঃ হাপর, খসর, হুঁড়ুর, খঁকর, হেঁটর, পটর, ফটর

ল-প্রত্যয় যোগে ঃ

ছেগল, খিজলা, ছাপল, খুঁপল, গেঁজল,

ধ্বন্যাত্মক শব্দে ল প্রত্যয় ঃ ফুসল, হামলা (হাম্বা, হাম্বা আওয়াজ করে)

স-প্রত্যয় যোগে ঃ ধড়সা, ধপাস, হাল্‌স (কুকুরে কামড়) খেঁকস, টুঁসা,

প-প্রত্যয় যোগে ঃ তুড়প, সুরপ,

চ-প্রত্যয় যোগে ঃ ভেংচা, কাউচ (কাউ কাউ উত্যক্ত করা)

জ-প্রত্যয় যোগে ঃ মেউজ (নুয়ে কাজ), হাবজ (হেলে পড়া)

কালরচনা

কাল বিভক্তি সব পুরুষেই এক। বর্তমান কালের কোন বিভক্তি নেই, সামান্য ঘটমান, পুরাঘটিত অতীতকালে 'ইল' এবং সামান্য ভভিষ্যতকালে 'ইব' ও ঘটমান, পুরাঘটিত ভবিষ্যত কালে 'ব' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ বর্তমান (উত্তম পুরুষ / আমি পক্ষ)

ক্রিয়াপদ	ক্রিয়ারূপ	ক্রিয়াপদ উচ্চারণ	ক্রিয়ারূপ	বচন
বলি	√ বল+ই	কহুঁ	√ কহ্+অঁ	এক
বলি	√ বল+ই	কহি	√ কহ্+ই	বহু

ঘটমান বর্তমান

ক্রিয়াপদ	ক্রিয়ারূপ	ক্রিয়াপদ উচ্চারণ	ক্রিয়ারূপ	বচন
বলছি	√ বল্+ছ্+ই	কহটঁ	√ কহ্+অট+অঁ	এক
বলছি	√ বল+ছ্+ই	কহিটি	√ কহ+ইট+ই	বহু

পুরাঘটিত বর্তমান

ক্রিয়াপদ	ক্রিয়ারূপ	ক্রিয়াপদ উচ্চারণ	ক্রিয়ারূপ	বচন
বলেছি	√ বল্+এছ্+ই	কহিচঁ	√ কহ্+ইচ +অঁ	এক
বলেছি	√ বল্+এছ্+ই	কহিছি	√ ক্+ইছ্+ই	বহু

সাধারণ অতীত

ক্রিয়াপদ	ক্রিয়ারূপ	ক্রিয়াপদ উচ্চারণ	ক্রিয়ারূপ	বচন
বললাম	√ বল্+ল্+আম	কহিন (সাদড়ীর প্রভাব)	√ কহ্+ইণ্	এক
বললাম	√ বল্+ল্+আম	কহিলি (ওড়িয়ার প্রভাব)	√ কহ্+ইল্+ই	বহু

ঘটমান অতীত

ক্রিয়াপদ	ক্রিয়ারূপ	ক্রিয়াপদ উচ্চারণ	ক্রিয়ারূপ	বচন
বলছিলাম	√ বল্+ছ্+ইল্+আম	কহিথিনু (প্রাচীন রূপ)	√ কহ্+ইথ্+ইন্+উ	এক
বলছিলাম	√ বল+ছ্+ইল্+আম	কহিথিলি (ওড়িয়া)	√ কহ+ইথ্+ইল্+ই	বহু

পুরাঘটিত অতীত

বলেছিলাম	√ বল্+এছ্+ইল্+আম	কহিথিনু (ও)	√ কহ্+ইথ্+ইন্+উ	এক
বলেছিলাম	√ বল্+এছ্+ইল্+আম	কহিথিলি (ও)	√ কহ+ইথ্+ইল্+ই	বহু

নিত্যবৃত্ত অতীত

বলতাম	√ বল্+ত্+আম	কহিথাওঁ (ও)	√ কহ্+ইথ্+আঁও	এক
বলতাম	√ বল্+ত্+আম	কহিথাই (ও)	√ কহ+ইথ্+আই	বহু

সাধারণ ভবিষ্যত

বলব	√ বল্+ব্+ও	কহিমু (ও.)	√ কহ্+ইম্+উ	এক
বলব	√ বল্+ব্+ও	কহিবা (ও.)	√ কহ্+ইম্+উ	বহু

ঘটমান ভবিষ্যৎ

বলতে থাকব	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব+ও,	কহিতে থামু	√ কহ্+ইত+এ, থাম+উ	এক
বলতে থাকব	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব+ও,	কহিতে যাবা	√ কহ্+ইত্+এ, থা+ব+আ	বহু

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বলে থাকব	√বল্+এ, √থাক্+ব+ও	কহি থামু	√ কহ্+ই, থাম+উ	এক
বলে থাকব	√বল্+এ, √থাক্+ব+ও	কহি যাবা	√ কহ্+ই, থা+ব+আ	বহু

সাধারণ বর্তমান (মধ্যম পুরুষ / তুমি পক্ষ / শোতৃপক্ষ)

বল	√বল্+ও	কহও	√ কহ্+অও	এক
বল	√বল্+ও	কহও	√ কহ্+অও	বহু
বলিস (তুচ্ছার্থে)	√বল্+ইস্	কহ্	√ কহ্+ই	এক

বলিস	√বল্+ইস্	কহও	√ কহ্+অও	বহু
বলেন	√বল্+এন	কহও	√ কহ্+অও	এক
বলেন	√বল্+এন	কহও	√ কহ্+অও	বহু

ঘটমান বর্তমান

বলছ	√বল্+ছ্+ও	কহওট	√ কহ্+অওট+অ	এক
বলছ	√বল্+ছ্+ও	কহওট	√ কহ্+অওট+অ	বহু

পুরাঘটিত বর্তমান

বলেছ	√বল্+এছ্+ও	কহিছ (ও)	√ কহ্+ইছ্+অ	এক
বলেছ	√বল্+এছ্+ও	কহিছ (ও)	√ কহ্+ইছ্+অ	বহু

সাধারণ অতীত

বললে	√ বল্+ল্+এ	কহিল	√ কহ্+ইল্+অ	এক
বললে	√ বল্+ল্+এ	কহিল	√ কহ্+ইল্+অ	বহু

ঘটমান অতীত

বলছিলে	√ বল্+ছ্+ইল্+এ	কহিথিথ	√ কহ্+ইথ্+ইল্+অ	এক
বলছিলে	√ বল্+ছ্+ইল্+এ	কহিথিলি	√ কহ্+ইথ্+ইল্+অ	বহু

পুরাঘটিত অতীত

বলেছিলে	√ বল্+এছ্+ইল্+এ	কহিথিল (১ম পু.)	√ কহ্+ইথ্+ইল্+অ	এক
বলেছিলে	√ বল্+এছ্+ইল্+এ	কহিথিল	√ কহ্+ইথ্+ইল্+অ	বহু

নিত্যবৃত্ত অতীত

বলতে	√ বল্+ত্+এ	কহিথাও	√ কহ্+ইথ্ +আও	এক
বলতে	√ বল্+ত্+এ	কহিথাও	√ কহ্+ইথ্ +আও	বহু

সাধারণ ভবিষ্যত

বলবে	√ বল্+ব্+এ	কহিব	√ কহ্+ইব্ +অ	এক
বলবে	√ বল্+ব্+এ	কহিব	√ কহ্+ইব্ +অ	বহু

ঘটমান ভবিষ্যৎ

বলতে থাকবে	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিতে যাব	√ কহ্+ইত্+এ, √ থা+ব+অ	এক
বলতে থাকবে	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিতে যাবা	√ কহ্+ইত্+এ, √ থা+ব+অ	বহু

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বলে থাকবে	√বল্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিথাব	√ কহ্+ই, √ থা+ব+অ	এক
বলে থাকবে	√বল্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিথাব	√ কহ্+ই, √ থা+ব+অ	বহু

সাধারণ বর্তমান প্রথম পুরুষ বা সে পক্ষ

বলে	√বল্+এ	কহে	√ কহ্+এ	এক
বলে	√বল্+এ	কহে	√ কহ্+এ	বহু

ঘটমান বর্তমান

বলছে	√বল্+ছ্+এ	কহেটে	√ কহ্+এট্+এ	এক
বলছে	√বল্+ছ্+এ	কহেটে	√ কহ্+এট্+এ	বহু

পুরাঘটিত বর্তমান

বলছে	√বল্‌+ছ্‌+এ	কহেটে	√ কহ্‌+ইট্‌+এ	এক
বলছে	√বল্‌+ছ্‌+এ	কহেটে	√ কহ্‌+ইট্‌+এ	বহু

পুরাঘটিত বর্তমান

বলেছে	√বল্‌+এছ্‌+এ	কহিছে	√ কহ্‌+ইছ্‌+এ	এক
বলেছে	√বল্‌+এছ্‌+এ	কহিছে	√ কহ্‌+ইছ্‌+এ	বহু

সাধারণ অতীত

বলল	√ বল্‌+ল্‌+ও	কহিলা	√ কহ্‌+ইল্‌+আ	এক
বলল	√ বল্‌+ল্‌+ও	কহিলা	√ কহ্‌+ইল্‌+আ	বহু

ঘটমান অতীত

বলছিল	√ বল্‌+ছ্‌+ইল্‌+ও	কহিথিলা	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আ	এক
বলছিল	√ বল্‌+ছ্‌+ইল্‌+ও	কহিথিলা	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আ	বহু
বলছিলেন	√ বল্‌+ছ্‌+ইল্‌+এন্‌	কহিথিলান	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আন	এক
বলছিলেন	√ বল্‌+ছ্‌+ইল্‌+এন্‌	কহিথিলান	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আন	বহু

পুরাঘটিত অতীত

বলেছিল	√ বল্‌+এছ্‌+ইল্‌+ও	কহিথিলা	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আ	এক
বলেছিল	√ বল্‌+এছ্‌+ইল্‌+ও	কহিথিলা	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আ	বহু
বলেছিলেন	√ বল্‌+এছ্‌+ইল্‌+এন্‌	কহিথিলান	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আন	এক
বলেছিলেন	√ বল্‌+এছ্‌+ইল্‌+এন্‌	কহিথিলান	√ কহ্‌+ইথ্‌+ইল্‌+আন	বহু

নিত্যবৃত্ত অতীত

বলত	√ বল্+ত্+ও	কহিথায়	√ কহ্+ইথ্+আয়	এক
বলত	√ বল্+ত্+এ	কহিথায়	√ কহ্+ইথ্+আয়	বহু
বলতেন	√ বল্+ত্+এন	কহিথান	√ কহ্+ইথ্+আন্	এক
বলতেন	√ বল্+ত্+এন	কহিথান	√ কহ্+ইথ্+আন্	বহু

সাধারণ ভবিষ্যত

বলবে	√ বল্+ব্+এ	কহিবে	√ কহ্+ইব্+এ	এক
বলবে	√ বল্+ব্+এ	কহিবে	√ কহ্+ইব্+এ	বহু
বলবেন	√ বল্+ব্+এন্	কহিবেন	√ কহ্+ইব্+এন্	এক
বলবেন	√ বল্+ব্+এন্	কহিবেন	√ কহ্+ইব্+এন্	বহু

ঘটমান ভবিষ্যৎ

বলতে থাকবে	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিতে থাবে	√কহ্+ইত্+এ, √থা+ব+এ	এক
বলতে থাকবে	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিতে থাবে	√কহ্+ইত্+এ, √থা+ব+এ	বহু
বলতে থাকবেন	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব্+এন্	কহিতে থাবেন	√কহ্+ইত্+এ, √থা+ব+এন্	এক
বলতে থাকবেন	√বল্+ত্+এ, √থাক্+ব্+এন্	কহিতে থাবেন	√কহ্+ইত্+এ, √থা+ব+এন্	বহু

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বলে থাকবে	√বল্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিথাবে	√কহ্+ই, √থা+ব+এ	এক
বলে থাকবে	√বল্+এ, √থাক্+ব্+এ	কহিথাবে	√কহ্+ই, √থা+ব+এ	বহু
বলে থাকবেন	√বল্+এ, √থাক্+ব্+এন্	কহিথাবেন	√কহ্+ই, √থা+ব+এন্	এক
বলে থাকবেন	√বল্+এ, √থাক্+ব্+এন্	কহিথাবেন	√কহ্+ই, √থা+ব+এন্	বহু

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার সঙ্গে স্বরসঙ্গতি রক্ষা করে তাই যেখানে কিহ্-এর সঙ্গে 'ই' বা 'উ' যুক্ত হয়েছে। আবার অস্ট্রিক ভাষায় ক+অ = ক > কো (ক + ও) হয়েয়ে কহিটি > কোহিটি কহু কোহু। সুতরাং উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

মূল ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় এবং স্বরান্ত ধাতুর সঙ্গে 'ওয়া' প্রত্যয় যুক্ত করে নিজন্ত ধাতু গঠন করা হয়। তার সঙ্গে কালবিভক্তি, প্রকার বিভক্তি, পুরুষ বিভক্তি যোগ করে নিজন্ত ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়।

খাওয়ান, পড়ান, শিখান, ধরান, বাজান, সাজান ইত্যাদি। তবে পুরুষ এবং কালে প্রযোজক ক্রিয়াপদের বিভক্তি আলাদা আলাদা। যেমন —

বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
আমি পড়াই	আমি পড়াইলম	আবি পড়াব
তুই পড়াস	তুই পড়ালি	তুই পড়াবি
সে পড়ায়	সে পড়াইল	সে পড়াবে
আমি পড়াইচি	আমি পড়াইছিলম	আমি পড়াই থাই্কব
তুমি পড়াইচ	তুমি পড়াইছিলে	তুমি পড়াই থাই্কবে
সে পড়াইচে	সে পড়াইছিল	সে পড়াই থাই্কবে

আমি পড়াই্থম

তুমি পড়াইথে

তুই পড়াথি

আপনি পড়াই্থেন

সে পড়াই্থ

যৌগিক ক্রিয়া ঃ

'ইয়ে' অন্তক তবে ইয়ে-র 'ই' মূল ধাতুর মাঝখানে চলে আসে এবং 'আই' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয় —

বইসে পড়, খাইয়ে জাঅ্, ঘুমাই জাঅ্, ফেইলে দাঅ্ / ফ্যালাই দাঅ্, ধরাই দাঅ্, ধইরে খাঅ্, পালাই জা, দাঁড়াই থাক।

যৌগিক ক্রিয়ার বিকল্প সহায়ক ব্যবহার হিসেবে —

পইড়ে, হইঞে / হইয়েঁ, বিকে দিব।

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ ও অস্ট্রিক ভাষার ক্রিয়াপদের মিল

ক্রিয়াপদ

সমাপিকা	অসমাপিকা	
অসমাপিকা	তে / ইতে অন্ত	অসমাপিকা লে /
এ / ইয়া অ--	অসমাপিকা ক্রিয়া	ইলে অন্ত
পূর্বকালীন	(নিমিত্তার্থে)	শর্তসাপেক্ষ

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষায় যেভাবে এ/ইয়া অন্ত অসমাপিকা পদ গঠিত হয় হড়রড়তে ঠিক সেইভাবেই কাতে অন্ত পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

যেমন —

মিহির সাহেব উনিআ অনাক কাঁহনি ইরাছি পাঁরমিতে তর্জমাকাতে উছানলেদায় অর্থাৎ মিহির সাহেব তাঁর ঐসব পাঁরসিভাষার কাহিনী ইংরেজিতে তর্জমা করে প্রকাশ করেছিলেন।

খান / লেখান / লেনখান ঃ ঝাড়খন্ডী বাংলায় শর্তসাপেক্ষে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয় লে / ইলে প্রত্যয় যোগে। এরকম ক্ষেত্রে হড়রড় তে দাড়ে কাথা বা কাজ শব্দের পরে খান, না হলে লেখান, না হলে লেনখান শব্দাংশ যুক্ত হয়ে থাকে যেমন —

বাজারেম চালাঃ খান লৌডু আগুইমে

বাজারে গেলে মিষ্টি লিয়ে আইন্‌বে।

আম কৌমিম সুসীরলেখান কাউভিম এ্রামা — তুমি কাজটা সম্পূর্ণ কইল্যে টাকা পাবে।

খান ঃ আগে শেষ হওয়ার শর্ত, লে অন্ত অসমাপিকার মতো। প্রত্যক্ষ বাচ্য।

লেখান ঃ আগে শেষ হওয়ার শর্ত, লে অন্ত অসমাপিকার মতো। প্রত্যক্ষ বাচ্য সরাসরি কথা বলার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে যুক্ত হয়।

লেনখান ঃ আগে শেষ হওয়ার শর্ত, লে অন্ত অসমাপিকার মতো। সপ্রত্যক্ষ বাচ্য এবং অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শেষে যুক্ত হয়।

ইতি / তে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হড়রড়-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় — ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় দ্বিত্ব প্রয়োগের সময়

চালা ঃ চালাঃতে = যেতে যেতে

এ্রেল এ্রেলতে = দেখতে দেখতে

জম জমতে = খেতে খেতে

রাঃ রাতে = কাঁদতে কাঁদতে

হড়রড় - অসমাপিকা

কাতে (আগে শেষ হয়েছে)	সম্পন্নতার শর্তসূচক (ইলে/লে)	তে (পরিস্থিতি বাচক)
খান	লেখান সকর্মক ক্রিয়াতে যুক্ত হয়	লেনখান অকর্মক ক্রিয়াতে যুক্ত হয়

সেন এবং দেচ অকর্মক এবং লেন কালসূচকটিও অকর্মক ক্রিয়াপদেই যুক্ত হয়। লেনখান শর্তসূচকটি অকর্মক ক্রিয়াপদের পরে বসে সম্পন্নতার শর্ত ইলে/লে

প্রকাশ করে। তাছাড়া ঞামা এবং তিয়োগা অপ্রত্যক্ষবাচ্য প্রকাশ করে।

খান ঃ আমেম চালঃখান ইঞহঁঞ সেন ঃ আ = তুমি গেলে আমি যাব।

আম বড়ায়খান ইঞ হঁ লাইয়ীক্রমে = তুমি জানলে আমাকেও বলবে।

সুতরাং সম্পন্নতার শর্তসূচক হিসাবে খান শব্দাংশটি সকর্মক এবং অকর্মক দুই রকম ক্রিয়াপদেই যুক্ত হয়। তাছাড়া বাচ্য যেখানে প্রত্যক্ষ কাজটি করছে সেখানেই খান শব্দটি যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

সম্ভাব্য সামর্থ্য সূচক শব্দ তিনটি গঃ অ, অঃ অ, এবং গান ঃ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন —

গঃ অ — নোয়া কলমতে অলগঃ আ = এই কলম লেখা যাবে।

অঃ আ — নোয়া কলমতে অলঃ আ = এই কলমে লেখা যায়।

গানঃ — নোয়া কলমতে অলগানঃ আ = এই কলমে লেখা সম্ভব।

তিনটিই সম্ভাব্য সামর্থ্যসূচক। অপ্রত্যক্ষ বাচকতাও আছে

ক্রিয়াপদ গঠনে আরো যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে পরিস্থিতি সূচক শব্দাংশ বলা হয়।

যেমন —

এক গ্লাস জল আন / আনো / আনুন।

মিৎ গ্লাস দা ঃ আগুই মে। (সাঁওতালী)

অনুজ্ঞা সূচক

একবচন	দ্বিবচন	বহুবচনে
সে	মে	পে

ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব শব্দার্থ ও ক্রিয়া ব্যবহারে অস্ট্রিক ভাষার সঙ্গে একটা মিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি।

তথ্যসূত্র

১। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা : অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা : রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-১।

৩। Material for A Santali Grammer-Vol-I, The Rev. P.O. Bodding, Page-I।

৪। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা : অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা : রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১৪৩।

চতুর্থ অধ্যায়

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার সমন্বয়ের প্রেক্ষাপটে ঝাড়খন্ডীতে কিভাবে অস্ট্রিক ভাষার পারস্পরিক প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষার উপাদানগুলি কিন্তু আগন্তুক নয়। ঝাড়খন্ডী বাংলার শব্দ ভান্ডার শুধুমাত্র যে পুষ্ট হয়েছে একথা বলা যায় না। বরং বলা যায় ঝাড়খন্ডী বাংলার শব্দ ভান্ডার পুষ্ট নয় সৃষ্ট হয়েছে। ঝাড়খন্ড অঞ্চলে শব্দগুলি বাইরে থেকে আসেনি, এগুলি এখানকার প্রাচীনতম অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর। অস্বীকার করার উপায় নেই এই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর শব্দসম্ভারকে আশ্রয় ও উপজীব্য করে ঝাড়খন্ডী বাংলার যাত্রা শুরু এবং সময়ের সাথে সাথে এই ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষা একটা অবয়ব ধারন করেছে। ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষা যখন আত্মপ্রকাশ করেছিল তখন অস্ট্রিক শব্দের আধিক্য অনেক বেশি পরিমানে ছিল। বর্তমানে ঝাড়খন্ডীর উপর একদিকে রাঢ়ী, ওড়িয়া ও অন্যদিকে সাদড়ীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে এই অস্ট্রিক দেশি শব্দগুলি দ্রুত প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। তবুও গ্রামাঞ্চলের কথ্য ভাষায় আজও এই অস্ট্রিক শব্দগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে "ঝাড়খন্ডী বাংলা জন্মগতভাবে অন-আর্য ভাষাভিত্তিক বলে এখানকার দেশি শব্দগুলি সম্পূর্ণ আত্মিক যোগসূত্রে শব্দভান্ডারের সঙ্গে একান্তভাবে সমাসবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে এগুলিকে বাদ দিলে ঝাড়খন্ডী বাংলার মৌল প্রকিৃতিও অক্ষুন্ন থাকে না"।[১] ঝাড়খন্ডী অঞ্চল রুক্ষ পাথুরে মাটির দেশ। এই অঞ্চলটি অনার্য অধ্যুষিত। অনার্যরা ছিল আদি অস্ত্রাল (প্রষ্ঠো-অস্ট্রালয়েড) জাতি। এই প্রটো-অস্ট্রালয়েড জাতিই এখানকার ভাষার বুনিয়াদ গঠন করেছিল। আদি অস্ত্রালগোষ্ঠীর ভাষা মূলত অস্ট্রিক ভাষা। আজও এমন বহু সংখ্যক ভাষা এখানে প্রচলিত যেগুলির

উৎস এই অস্ট্রিক ভাষা। আধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — "বাংলা খাঁ খাঁ (করে ওঠা), খাঁপার (দেওয়া), বাঁখারি (বাখারি বা চেরা বাঁশ), বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো), জাং (জঙঘা), ঠেঙ্গ গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, কলি (চুন) ছোট পেট খোস (পুরাতন বাংলা কচ্ছু), ঝোড় বা ঝোপ, পুরাতন বাংলায় চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাংলার ডোম্বা-ডোম্বী), চোঙ, চোঙা, মেড়া (সংস্কৃত মেঢ় থেকে) (= ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা বা দাও, বাইগন (বেগুন = সংস্কৃত বাতিঙ্গন, বাতিগন), গড়, বরজ, লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ"।[২] এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু দ্রাবিড় ভাষার শব্দ — যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীগুলি আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীর পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিল।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় তৎসম শব্দ কম। তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দগুলি এই উপভাষার প্রধান উপাদান। সমপরিমাণে দেশি শব্দ ঝাড়খণ্ডী শব্দকোষকে সমৃদ্ধ করেছে। নিরক্ষর মানুষের নিত্যদিনের বাক-ব্যবহারের ভাষা। সহজেই উচ্চারণ সাধ্য তদ্ভব ও দেশি শব্দের মাধ্যমেই তাদের ভাবমুক্তির অবকাশ বেশি থাকে।

দীর্ঘকাল থেকে একমাত্র ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিগুলির মধ্যে থেকেই সাহিত্য ভাবনার পরিসর সীমিত ছিল। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই লৌকিক। যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার সময় থেকেই (বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের কাঁকিল্যা) ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষার স্বরূপটি ধরা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার সংস্কৃতি যেমন স্মার্ত-ব্রহ্মণ্যতা বর্জিত, ভাষাও তেমনি তৎসম উৎসর্জিত বাংলা। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিচার করতে পারি — শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অ-কারান্ত পদের উচ্চারণ 'অ' কারান্তই ছিল এবং তা বোঝা যায় পয়ারের অন্ত্য-মিল দেযে কাহ্ন, দান, চাপ, সন্তাপ শুন, আলিঙ্গন, ধর, ভিতর প্রভৃতি শব্দ দেখে। ই/ঈ এবং উ/ঊ — এই হ্রস্র দীর্ঘ পার্থক্য না রেখে 'ই' বা 'উ' হ্রস্বভাবে উচ্চারণ দেখা যাচ্ছে। 'রি' ধ্বনিরও উচ্চারণ পাওয়া যায় — কিরিপান, পৃয় প্রভৃতি শব্দের মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে না/ণ ধ্বনির পার্থক্য ছিল না। ওড়িয়াতে বহু ক্ষেত্রে 'ন' এর উচ্চারণ 'ণ' (ড়ঁ) হয়। সংলগ্ন বাংলা অঞ্চলেও এই প্রভাব দৃষ্ট। 'য' ধ্বনির উচ্চারণ 'জ' কারের মতোই হত যেমন — জাণ, জখন, জুইয়াঁ। এছাড়া মহাপ্রাণ ধ্বনি পদের শেষে অল্পপ্রাণে পরিণত হয়েছে যেমন মূড়, সাদ, বিন্দ। 'হ' ধ্বনি অনেক জায়গায় অনুচ্চারিত যেমন বহিতে> বৈতেঁ, সুনহ > সুন, নেহ > নে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিকল্প প্রয়োগ হত।

ঙ্গ ঃ ভাঙ্গসি > ভাঁগসি > ভাঙ্গাছি।

ঞ্চ ঃ অঞ্চল > আঁচল

ঞ্জ ঃ পাঞ্জী > পাঁজি

ণ্ঠ ঃ ঠেণ্ঠালি > ঠেঁঠা

ন্ড ঃ ছিন্ডি > ছিড়ি > ছিড়ে

ন্ট ঃ কান্টাব > কাঁঢ়ার > কাড়ার

ন্ত ঃ কান্তী > কাঁতি > কাঁইতি

ন্থ ঃ গান্থি > গাঁথি > গাঁইতি

ন্দ ঃ কন্ধ > কান্ধ > কাঁদ

ম্প ঃ চম্প > চাঁপা

ম্ব ঃ চুম্ব > চুম

ংস ঃ মাংস > মাঁস

তদ্ভব শব্দ ঃ

শাবক > ছাবঅ > ছা, প্রহেলিকা > ফলেই, দেবপূজারী > দেহরি

উদূখন > উঘুল — উদূখুইলা শব্দটিও ঝাড়খন্ডী বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

এমন উদূখুইলা (বেহায়া)। ক্ষীরবতী > ছীরই > খীরাই। (মাকে আইনতে যাব খীরাই নদীর কূলে) ছায়ামন্ডপ > ছামড়া (বিহা ঘরের ছামড়া)

তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃতের সম এগুলি হল —

ধেণু, বেণু, কানু, জল, ফল, বেলা, দিন, চাঁদ, সূর্য, বিষ্ণু, সন্ধ্যা প্রভৃতি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ ঃ

কৃষ্ণ > কিষ্ট — 'উপাড়ায় আইজকে কিস্ট যাত্রা হইছ্ছে'।

বিষ্ণু > বিষ্টু — বিষ্টুপুরে দেখে আইলম ঝিঙ্গাতে ফুল ফুটেছে'। (ভাদুগান)

বৈষ্ণব > বষ্টম — 'জাগ-জগ্‌গি (যাগ-যজ্ঞ) ছাড়া, যাবি বষ্টম পাড়া'। (প্রবাদ)

সূর্য > সুরজু — তর কথা শুইনে ল মনে হচ্ছে সুরজুটা পচ্‌চিম দিগে উঠেছে।

সন্ধ্যা > সাঞ্ঝা > সাঁজ — 'সাঁজবেলা জলকে গেলে আঁচাল ধরে কালা'।

একই শব্দের একাধিক রূপ পাই যার অর্থ একই এই রকম শব্দগুলি হল —

কদলী > কদল > কঅল > কলা (হিন্দি কেলা) — 'ঘোল মহি ঘিরঘির কলাপাতে দই' (ঝাড়খন্ডী ঝড়া)

গর্ত > গাড়া, গাড় — 'ইঁদুরে গাড়া করে, সাপে দখল করে'। (প্রবাদ)

ক্ষদ্র > খুঁদি, খুদী — 'এতদিন চরালি বাগাল কচায় বন খুঁদিএ'। (বাঁধনা পরবের গান)

ক্ষুদ্র > ছেঁড়া, ছঁড়া — 'ই কালের শিস্তছঁড়া, মন ত রাইখতে বলে'। (পাতা নাচের গান)

সন্ধ্যা > সাঁইঝ, সঞ্ঝা — 'সাঁইঝে ফুটে ঝিঙাফুল, সকালে মলিন গো'। (পাতা নাচের গান)

দেশি শব্দ ঃ

ঢড়া (গর্ত) — উপর কুলির হড়হড়ানি নাম্‌হকুলির ঢড়া'। (পাতা নাচের গান)

গাজাড় (ঝোপ) — 'আম গাজাড়ু ন রে জাম গাজাড়ু'।

ডাঙ্গুয়া (অবিবাহিত লোক) — 'ডাঙ্গুয়া লোকের অলমা ধুতি' (প্রবচন)

লেদা (বাঁকা) — 'লোদাগাছে ভালুক নাচে'। (প্রবাদ)

ডহর (পথ) — 'ছাড় বাঘ আমারি ডহর' (ঝুমুর)

ডুংরী (ছোট পাহাড়) — 'ইডুংরি উড্ডুংরি পিয়াল পাইক্‌ল'। (ঝুমুর, বাঁকুড়া)

আদাড়-বাদাড় (ঝোপঝাড়) — টাঁইড়ের মহুল চাঁইড়ে শুকাইল।

কচা (সংকীর্ণ জায়গা) — 'এতদিন যে চরালি বাগান বন খুঁদিএ' (বাঁধনা পরবের গান)

ঝাটি (শুকনা ডাল) — 'ডুংরি কা উপরে কে রে মোর ঝাটি কাঠে'।

ডুভা (পাথরবাটি) — 'সতীন মাগী মাগতে আলে ডুভা ভরতি দিব'। (ঝুমুর)

কুম্‌হা (পাতার তৈরী কুঁড়ে ঘর) — 'দেখে বাপ বিহা দিলে দাঁড়াইতে নাই পাত কুম্‌হা' (বিহা গান)

ডাহি (মাঠ) — 'ডাহিধানের আবার কাঢ়ান দহরান' (প্রবাদ)

টঁকা (বাঁশের ছোটো পাত্র) — 'ননদ গরী কমরে বাঁধইল টঁকা' (ঝুমুর)

পিঁড়হা (কাঠের তৈরী বসার আসন) — দুশমনকে উঁচু পিঁড়হা (প্রবাদ)

ঢেঁঠা (ডাটা) — শালুকে ঢেঁঠার ঘর তুলেছি, হেঁকের পেঁকের করে রে। (ঝুমুর, বাঁকুড়া)

চটা (একধরনের পাখি) — 'পস্তুগাছে চটা বইসেছে আর, অই চটাকে মাইর না ভাই'। (ভাদারিয়া ঝুমুর)

টাটর (বাঁশের পাতির চাঁচ) — টাটি ভাঙ্গ্যে খালেক ননী' (সুমুং)

ডিঙ্গর (বদরাগী) — ডিঙ্গর ডিঙ্গর খালভরাদের বিনা দোষেই হাসি'। (ঝুমুর)

ধাকড়া (মোটা, সাঁওতালীতে ধাকেড়) — কাড়াবাগাল বাকড়া জুয়ান। (ঝুমুর)

খুঁখুঁড়ি (কুক্কুট > কুঁখড়া, মুরগী) — বিহাই আইলে খুঁখঁড়ি মরাব গো বিহাই আইলে খুঁখঁড়ি মরাব'। (করম গীত)

খব্‌ড় খব্‌ড়া (ভোঁতা সাঁওতালীতে থবড়ে) — হিজু মেঁ থবড়ে বুড়া চালাঃ কানা।

নেগা (বাম সাঁওতালীতে লেঁগা) — অরা ল আধরাইতে আল ধরি নেগা ধারে সিতা কাটিল।

আগু (সামনে) — আগুদিগে খঁপাটি তার পেছু দিগে সিঁথা। (ঝুমুর)

পট্‌ম (পাতার দৈরী পাত্র) — পটম ঝটম বাঁধ্যে দে। (ঝুমুর)

বুদা (ছোট ঝোপ) — যাইছিলি ভুলাবাদা দেখে আলি মগু বুদা।

বাসিয়াম (বাসি ভাত) — নলদীল হামি যাব লিজেই বাইসাম দিতে। (ঝুমুর)

ডিলি (ধান রাখার পাত্র) —

পংড়া (কচি চারাগাছ) — 'শালগাছের শাল পংড়া কদমগাছের কঁড়ি হে'। (ঝুমুর)

কেরা (পুরানো) — দুয়ারে দাঁড়ালি বুঢ়া ঢকরা'। (ঝুমুর)

ঢঢোর (মাঝখান ফাঁকা) — 'গাছের ঢঢোরে হাত সাম করাবি নাই'। (ঝুমুর)

ঢঢ্‌র (শূণ) (ফাঁকা গাছের গুড়ি) — কাট কাটতে গেলি বুঢ়া কাইটে আনলি ঢঢর মুঢ়া'। (ঝুমুর)

ঢাকল (বড়) (মুন্ডারিতে বারাই সাঁও বারাহি) — 'ঢাকল বিহাই শ্বাশুই শ্বাশুই বাটে'। (ঝুমুর)

আগুড়/আগড়/আগল (বাঁশের কপাট) — 'তালপাতার আগুড়টা হাড়ার হুড়ুর করে'। (ঝুমুর)

সুয়াং (শারীরিক অঙ্গভঙ্গী) — 'আমার সুয়াঙে সুয়াঙে বঁধু আছাড় পাছাড় লাগে গো'। (ঝুমুর)

গেঁঢ়া (বৃহৎ শামুক, মুন্ডারী) — 'গেঁঢ়া খুলির পদক বানাইদে'। (ঝুমুর)

লেলা (বোকা, হাবা) — লেলা মুউয়া একটা ব্যাটা ছানাকে দাঁড় করাঞঁ দিল।

ভুগা (ছিদ্র, সাঁওতালীতে ভুগা) — একফালি কাপড় লিয়ে ভুগা খাঁইচে, দাঁড়াইছিল আমার পাশে।

ধঁদা (মোটা) — বাইগুণের মতন দকড়কচা হলি।

হাড়হাজা — (দুর্বল)

সুইটকা — (রোগা)

উইড়কসটা — (বেকার)

ফফর পঁইদা — (ফালতু)

তেড়েতেপড়া — (বেঁকে)

সিঁধা — (প্রবেশ)

বেবায় — (চিৎকরা)

কঁড়চে — (কোমরের কাপড়ে পুঁটলি)

কঁড় (কলি, মুন্ডারীতে কন্ড)। কেঁড়রি (মুন্ডারীতে কেকঁড়রণ)। পেলকা (ভীতু), আঁইড়চা (বদমেজাজী), বুলান (বড়নালা), ঢেমনা (অস্ট্রিক শব্দ) দুষ্ট, খেঁচড়া (বদ), গিরা (গাঁট), বাখর (হাঁড়িয়া তৈরী করার ঔষধ), চিরকুন (পেত্নী)।

একটি শব্দ থেকে একাধিক শব্দের সৃষ্টি —

ডুমা, ডুমকা, ডুবক্া, ডিমা, ডেমরা, ঢিমা। ভাঙ্গা, ঢেঙ্গা, ডঙ্গা। ঝাড়, ঝাড়ি, ঝুড়ি, ছাটা।

ব্যক্তিনামে ঃ

ঠুমপু (বেঁটে), ঢুলি (মোটা স্ত্রীলোক), ঢুলকি (মোটা), খ্যাঁদি (নাক বোঁচা), ধুঁদি ফুদকি (বেশি কথা বলে)।

গ্রামনামে ঃ

গ্রামনামের মধ্যে অস্ট্রিক শব্দ নিহিত আছে। গ্রামের নাম পরিবর্তন হয় না বলেই এখনো শব্দভান্ডার থেকে লুপ্ত হয়নি। এমন অজস্র দেশী শব্দ পাওয়া যায়।

১) বৃক্ষ-বন-ফল-ফসল সম্পর্কিত ঃ

জজবেড়া, জজডি (তেঁতুল), মুরগাডি (পিয়াশাল), বাড়ে-ডি (বট), এদেলবেড়া (শিমুল), লোয়াডি (ডুমুর), মাতকমডি (মহুল), সারজমডি (শাল), কুদাকুচা (জাম), উলদা (আম), তিরুলডি (কেঁদ), কাইরা কচা (কলা), লুপুংডি (বহেড়া), হেঁসেল বিল (ধ) শশডি (ভালাই), বারু ডি (কুসুম), জানে গড়া (কদ), জুনবনি (তৃণ), কুশবণি শারুলিয়া (সাল), চিরু গড়া (ঘাস), পিড়রা বাইদ (ফল), বীরবাইদ (জঙ্গল), পড়াশিয়া।

২) পাহাড় পর্বত সম্পর্কিত ঃ

চিরুল ডি, বুরু ডি (পাহাড়), ডংরি ডি (ছোট পাহাড়), বাদাঢ়া,

৩) আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কিত ঃ

জিলিংগড়া (লম্বা), ডাহি গড়া (মাঠ), চাক দহ (কাদা), বালি ডি (বালি), কাদ ডি (কাদা) পাইথা পাড়া, তুষ কুটরী, ঢেলা জি, হাঁসা বেইড়া,

৪) পশুপাখি জীবজন্তুর নাম সম্পর্কিত ঃ

সিম ডি, বানালুকা (ভালুক), কেঁদা ডাংরি, ডাংরি পোষ (গরু), কেড়ু কচা (ছোট মহিষ), উরু বেড়া (কটু পোকা), কুটাম-ূড, নাকাই জুইড়া, বাঁদরীশোল, বার পাখান, চপেরডাঙ্গা, কুকড়াখুপি, কুখড়া খোঁদড়, উরুবেড়া।

৫) অন্যান্য ঃ

সেরেংডি (গান), বঁগা ডি (দেবতা), সারেং গড়, সারেঙ্গা, গুড়িগাই কচা (ছোট), বাক্‌ড়া কচা, ধীরি ঘুটু (পাথর), মুরগা ঘুটু, রাহেড় গড়া (গোড়া), ছলাগড়া, বহড়াগড়া, ধ-ডাঙ্গা (শুষ্ক জমি), তেঁতুল-ডাঙ্গা, আম ডাঙ্গা, জান ডাঙ্গা, সুরাল ডাঙ্গা, চপের ডাঙ্গা, কাদ ডি (ডিহি), মাটিয়াল ডি, পাথর ডি, করণ ডি, বেঙ্গাই ডি, টুমাংডিংরি (গরু), টুয়ার ডাংরি, শাল ডাংরি, জামডোল, বামডোল, আমদা (জল), বাবুই দা, জামদা, কাশিদা, দামদি, সুরদা, খড়দা, প্রভৃতি।

সনাহাতু (সাঁ-আতু = গ্রাম), বেড়াহাতু, এছাড়াও আড়া, শোল, তড়া, দিয়ে গ্রামগুলিতেও দেশী শব্দের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়।

শব্দদ্বৈত ঃ

আকুপাকু (অস্থির) — অত আকুপাকু করছু কেনে?

রিলামালা (সুন্দর) — আজ রিলামালা বাজারের দিন।

হালুই হুলুই (এদিক সেদিক) — রান্নাঘরে হালুই হুলুই করলে রান্না হবেক নাই।

লিবুই লিবুই (ফাঁস ফুঁস) — রাগে সত্য লিবুই লিবুই করছে।

চিরি বিরি (চঞ্চল) — চিরি বিরি করে কোনো লাভ নাই।

তুড়িঘুড়ি (তাড়াতাড়ি) — তুড়িঘুড়ি হাতটা চালা।

ঝেঁগের ঝেঁগের (চিৎকার) — সকাল থেকে ঝেঁগের ঝেঁগের করলে মাথা ঠিক থাকে না।

খ্যানের খ্যানের (নাকে কথা) — ছেইল্যাটা সকাল থেকে খ্যানের খ্যানের করছে।

কুঁহরে কুঁহরে (কুহুর কুহুর ডাক ছেড়ে) — কুঁহরে কুঁহরে দুধ খাচ্ছে বাছুররা।

খুচুর খুচুর (অল্প অল্প) — খুচুর খুচুর কইরে দোকানে যাওয়া ভাল লয়।

গাঁই গুঁই (ইতস্তত করে) — গাঁই গুঁই কইরে পড়াশুনা হয় না।

গিজির পিটির (কাছে) — গিজির পিটির লেখা ভাল লাগে নাই।

গড়গড়্যান (ঢালু) — গড়গড়্যানে ভাল করে চইল্‌বি।

চেরে বেরে (কলরব) — চেরে বেরে কাজটা কর।

ছুঁচরা ছুঁচরী (লোভী) — আজকাল ছেইল্যেটা ছুঁচরা ছুঁচরী হইয়েছে।

ছাতিলাতি (ছড়ানো) — ধানগুলা ছাতিলাতি হইয়ে গেছে।

ছাপাছাপি (গোপন) — অন্ধকারে ছাপাছাপি খেইলতে নাই।

ছিঁচিবিচি (ছেঁড়া) — বইগুলান ছিঁচিবিচি কইরে ফেইল্যেছে।

আবার এমনও কিছু কিছু শব্দ আছে যা অপরিচিত মনে হলেও ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শব্দগুলি শুধুমাত্র যে ব্যবহারিক কথাবার্তার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা নয় এইসব শব্দগুলি এখানকার ঝুমুর, জাওয়া, করম, কাঠি নাচের গান, বিবাহের গীত ও আহিনী গানে ব্যবহৃত হয়। শব্দগুলি হল —

কড়া, কুড়ি (ছেলে, মেয়ে) — 'বারশ কড়া তেরশ কুড়ি ঘাটশিলারে ধরা পড়িল' (ঝুমুর)

দারাহারা (ধন) — 'দারাহারা ঘরে দলমাদল বেটা বাঢ়িল'।

অরকি (মদ) — অরকি খায়েঞেঁ রে ছড়া ফইরকে দাঁড়ালি।

আহার (পুকুর গড়া) — মিত্তন আহারে গরুগিলা ছাইড়ে আলি।

নেড়ে (দিন) — 'তিন হাজার টাকার তিরি বিনা নেড়ে আইলে রে কেনে' (ঝুমুর)

মারাং (ঠাকুর) — কামি জমনু ঃ 'মারাং বুরু হিলারে' (কড়া ঝুমুর)

অড়া (ঘর) — ও না চিকায় না অড়া দুয়ার লান্দু চাবায়না। (কড়া ঝুমুর)

গাজাড় (ঝোড়) — বীর গাজাড় রে সারি বঙ্গা (কড়া ভাষায় ঝুমুর)

গাড়া (গর্ত) — হেংলা গাঢ়া, অজয় গাঢ়া, দা দাআ মেশায় না। (কড়া ঝুমুর)

তথ্যসূত্র

১। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা : অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা : রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১৪৩।

২। বাঙালীর ইতিহাস : (আদিপর্ব) নীহার রঞ্জন রায় : দে'জ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৫৯।

পঞ্চম অধ্যায়

ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষা ও অস্ট্রিক ভাষার পারস্পারিক প্রভাবের কারণে পরিবর্তনের রূপরেখাগুলির চিহ্নিতকরণ

অস্ট্রিক ভাষার মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে ওড়িয়া*, বাংলা, নাগপুরি, ভোজপুরি মিলে বাংলা ভাষার একটি বিশেষ উপভাষার রূপ গঠন করেছে যাকে আমরা ঝাড়খণ্ডীবাংলা উপভাষা বলি। ঝাড়খণ্ডীবাংলা ভাষা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এই ভাষায় বিভিন্ন দেশি শব্দ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর শব্দ ঝাড়খণ্ডী ভাষায় একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যবাংলার উপকরণ বলতে আমরা যা পেয়েছি, তার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের প্রত্যেকটি উপভাষারই অল্পবিস্তর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কারণ দুটি প্রথমতঃ তখনকার দিনে আলাদার কোনো ছাপ স্পষ্ট করে দেখা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ এখনকার মতো সাধুভাষা আর চলিত ভাষার পার্থক্য ছিল না। আর এই সাদৃশ্যগুলোকেই গ্রীয়ারসন সাহেব বাংলা ভাষার (তাঁর ভাষায় 'পশ্চিমা') প্রাচীনত্বের চিহ্ন বলে ধরেছেন। অস্ট্রিক ভাষা বহু পূর্ব থেকেই উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।** আবার অন্যধারে প্রাচীন বাংলার পূর্বেকার অবহটের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডী ভাষার মিলও দেখতে পাওয়া যাবে, তবে তা ব্রজবুলির পথ দিয়ে এসেছে। কারণ ঝাড়খণ্ডী গানের রচনাদর্শ এবং কুড়মালির মধ্যে ব্রজবুলির প্রভাব আছে।

---

* ধ্বনি পরিবর্তনের দিক থেকে ওড়িয়া ভাষা বাংলা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। তবে ওড়িয়া ভাষায় কিছুটা দ্রাবিড় এবং মারাঠী প্রভাবের পরিচয় আছে। পূর্বাঞ্চলীয় অপর ভাষাগুলির তুলনায় 'ওড়িয়া ভাষা' অধিকতর রক্ষণশীল, তাই ভাষাবিদ্যার অনুশীলনে এই ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ওড়িয়া ভাষায় পদমধ্যস্থ ও পদান্তে 'অ' ধ্বনি বর্তমান রয়েছে (বাংলায় পদমধ্যে 'ও' এবং পদান্তে লুপ্ত হয়েছে)। ...শিসধ্বনিগুলি বাঙলায় 'শ' উচ্চারিত হলেও ওড়িয়ায় 'স'।

—শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১১০ (পুনর্মুদ্রিত)

শব্দগত ; ধাতুগত, ধ্বনিগত ও ধাতুরূপগত আলোচনা করলে এর স্বরূপটি নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

শব্দগত ঃ

অকট (অকট জোইআ' চর্যা) ঃ অকাট আকাট (ঝা : মূর্খ)। ঋজু > উজু 'উজুরে উজু ছাড়িয়া মা লেহু রে বঙ্ক' চর্যা—উজা (ঝা)। কুড়ারী চর্যায় ঝা : কুঢার। খম্ভা > খাম্বা (ঝা) গরাহক > গ্রাহক আইল গরাহক অপশে বহিআ চর্যা) টাল (টালত ঘর মোর নাহি পড়িবেষী চর্যা ৩৩) টিলা (ঝা) দঙ্গাল > দঙ্গল (ঝা) থাহী (দু অন্তে চিখিল মাঁঝে ন থাহী চর্যা) থাহ (ঝা)। বেণ্ট চর্যা—বেঁট ঝা সাঙ্গ (আলো ডোম্বী তত্র সম করিব ম সাঙ্গ চর্যা—সাঙ্গা (ঝা:) > সাঁঘা।

ধাতুগত ঃ

ঘিন্ (কাহেরি ঘিনি মেলি আচ্ছুহু কীস চর্যা—ঝাড়খণ্ডীবাংলায় ঘিন্ ফেড় (জোই ভুসুক ফেড়েই অন্ধকারা চর্যা) ঝা : ফেড়। রুন্ধ > রুঁধ আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা চর্যা) ষামা (কা অ বাক চিঅ জসুন সামায়'। সামায় (ঝা)

ধ্বনিগত ঃ

নাসিক্য যুক্তবর্ণ ন্দু, হ্ণ, স্থ ঝাড়খণ্ডীতে পাওয়া যায়। নিস্থাপ > চিস্থাপ, অমহে, নামহ্।

ধাতুগত রূপ ঃ

ক) সাধারণ অতীকালের প্রথম পুরুষে সার্থিক 'এক' প্রত্যয়ের ব্যবহার চর্যায় কত্রলেক ঝাড়খণ্ডীতে করলেক, খালেক।

**'কোন সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে অস্ট্রিক জাতি ভারতে এসেছিল, তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি সমষ্টির মধ্যে এরাই যে প্রাচীনতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অস্ট্রিক জাতীয় মূল বাসস্থান কোথায় ছিল এবং কোন পথ দিয়ে ভারতে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতান্তর লক্ষ্য করা যায়।'

—শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১১৪ (পুনর্মুদ্রিত)

প্রজা হি তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাতিস্রঃ

অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।[১]

(ঐতরেয় আরণ্যক ২-১-১-৫)

এখানে আমরা বয়াংসি শব্দটি পাই। বয়াংসি অর্থাৎ যে সকল মানুষ পাখির মতো কিচির-মিচির করে কথা বলে। বঙ্গ, মগধ এবং চোরাজাতি অধ্যুষিত চেরোপাদ অর্থাৎ সমগ্র পালামৌ অঞ্চল জুড়ে খেরওয়াল জাতি বসবাস করতো। অর্থাৎ কোল ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, খেড়িয়া, খেরোয়াল, অসুর, জুয়াং, শবর, হো, তুরি প্রভৃতি জাতি তারা হল খেরোয়াল; খের অর্থাৎ পাখির বংশধর। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ বলতে আমরা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রায় সমগ্র ঝাড়খণ্ড বুঝি। এই সমস্ত অঞ্চল নিয়েই গড়ে উঠেছিল ঝাড়খণ্ডী বাংলা। সিংভূম, মানভূম, ধলভূম, ধানবাদ, হাজারিবাগের পূর্বাংশ প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষাই মূলত ঝাড়খণ্ডী বাঙলা। বাকি অংশের ভাষা মাগহী, সাদরি, পাঁচপরগনিয়া ও কুড়মালি যাতে আমরা পাই প্রাচীন বাঙলা চর্যাপদের ভাষার স্বাদ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার নানা নিদর্শন দিয়ে বলেছেন—'সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্ততঃ তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাঙলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"[২] এই যে সভ্যজাতির বঙ্গদেশে বাস করার কথা বলেছেন। বর্তমানে তারা কোথায়? বাঙালির উচ্চারণ শুধুমাত্র অসংস্কৃত নয়, কোল ভাষাগোষ্ঠীর উপর স্থাপিত। ফলে ছন্দ গঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও গড়ে উঠেছে সাঁওতাল মুণ্ডাদের syllabic metre বা দলবৃত্তরীতির উপর। ঝাড়খণ্ডী বাংলা গদ্যের বাক্যবিন্যাস কখনই সংস্কৃত, এমনকি প্রাকৃতকে অনুসরণ করতে পারেনি। প্রাচীন বাঙলায় অস্ট্রিক শব্দের পরিচয় পেতে হলে আমাদের চর্যাপদের উপর নির্ভর করতেই হবে। যদিও পূর্ব মাগধী ভাষাগোষ্ঠীর সমস্ত শাখাই চর্যাপদের দাবিদার। চর্যাপদে যে উচ্চারণ বৈশিষ্ট রক্ষা করে মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রাকৃত ছন্দানুসারী। বনজঙ্গল ঘিরে হরিণ শিকার, ভাত পচিয়ে হাড়িয়া-মদ তৈরির আয়োজন, শুড়িখানায় মাতালদের ভিড়, পাহাড়ের উপর শবরী বালিকার সুসজ্জিত পোসাকে ঘুরে বেড়ানো আদিবাসী

পাড়াকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তের সংখ্যার চর্যাপদে কাহ্নপদ বিবাহের রূপকের সাহায্যে পরমার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

ভবনির্ব্বানে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেণি করগু-কসালা।।
জঅ জঅ দুংদহি সাদূ উচ্ছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চরিলা।।[৩]

ভবজগতে নির্বাণের পথে মাদল বাজছে। মনপবনকে করা হয়েছে করতাল আর কাঁসর। জয় জয় দুন্দুভি শব্দে উচ্ছল হয়ে কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলল। এই পদে চিত্রিত অংশটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যেন কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের বিবাহ যাত্রাকে। ছয় সংখ্যক পদটিতে যে হরিণ শিকারের ছবি আছে, তা আজকের অযোধ্যা পাহাড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন 'সেঁদরা পরব' বা শিকারের ঘটনাকে সামনে এনে দেয়।

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ল চৌদীস।।
আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুক আহেরী।।
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী।।
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এবন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।।
তরঙ্গতে হরিণার খুব ন দীসই
ভুসুক ভনই মূঢ়া হিঅহি ন পইসই।।[৪]

দশ সংখ্যক পদে রয়েছে একটি নগরের বর্ণনা। নগরের মানচিত্র দেখে মনে হয় নগরটি বেশ সাজানো। নগরের একপ্রান্তে ডোমদের পাড়া। ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী অঞ্চলে নিম্নবর্ণ সমাজের একপ্রান্তে বসবাস এর প্রচলন আছে আর পাড়ার উঁচু ধনীক

শ্রেণির লোকেরা রাত্রে বিনোদনের জন্য আসে।

আঠাশ সংখ্যক পদে রয়েছে ছোটনাগপুরের ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণির ডুমরীর চমৎকার ছবি। আর তার উপর শবর সুন্দরীদের আনাগোনা—

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিধানা সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উনমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহড়া তোহারি।
নিঅ খরিনী নামে সহজ সুন্দরী।।[৫]

কিম্বা তেত্রিশ সংখ্যক চর্যার যে ছবি পাই তা দেখার জন্য শিলদার কাছে শবর ভুলিয়া একটা টিলার উপর খেড়িয়া পল্লীর অবস্থানকে অনেকটাই মনে হওয়ায় স্বাভাবিক। এই সমস্ত পদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যাই থাকুক না কেন, সেগুলি যে জীবন্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রাকৃতিক চিত্র পরিবেশনের মাধ্যমে এটাই হল সবচেয়ে জরুরি কথা। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের পূর্ণ পরিচয় এইভাবেই পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। চর্যাপদে বর্ণিত জীবন যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেরই জীবনমান।

পঞ্চাশ সংখ্যক চর্যার শবরজীবনের দৈনন্দিন চিত্রটি পরিস্ফূত হয়েছে। চমৎকার সাজানো ঘর, কাপাস ফুল ফুটে জ্যোৎস্নার হাট বসেছে। বুনোধান পেকে ঝরে যাচ্ছে সেদিকে শবর-শবরীর কোনো খেয়ালেই নেই। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। মাতাল শবর মরেই গেল। তারপর বাঁশের খাটিয়ায় শুইয়ে তাকে পোড়াতে নিয়ে গেল সবাই— দূর থেকে শেয়াল শকুনের দল কাঁদল। তার শ্রাদ্ধ হল দশ দিকে দেওয়া হল পিণ্ড। শবর-শবরী নির্মূল হয়ে গেল। বাংলা শব্দভাণ্ডারের মূল ভিত্তি তদ্ভব শব্দ। বাংলা শব্দভাণ্ডারে তদ্ভব শব্দ ছাড়াও তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দ আছে। অধিকাংশ দেশি শব্দই অস্ট্রিক। নিষাদ ভাষা থেকে এসেছে, তদ্ভব শব্দগুলো তৎসম শব্দ থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়েছে। সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। আবার প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা উদ্ভবের মূলেও কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশি। তদ্ভব

(তৎ মানে তার ভব মানে সৃষ্টি বা জন্ম) কিছু তদ্ভব শব্দ সংস্কৃতে মূল অর্থ থেকে সরে এসেছে। 'পর্ণ' মানে পাতা, কিন্তু তদ্ভব 'পান' একটি বিশেষ ধরনের পাতা। 'দণ্ড' মানে যষ্টি কিন্তু দাঁড়ের অর্থ দাঁড়াল বৈঠা। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত— মূল শব্দে আনুনাসিক বর্ণ নাই কিন্তু তদ্ভবতে ঁ এসেছে, যেমন ইষ্টক > ইষ্ট, উচ্চ > উঁচু, পুস্তিকা > পুঁথি, যুথিকা > জুঁই ইত্যাদি। ভারতের অন্য প্রদেশের কিছু শব্দ বাংলায় এসেছে। হরতাল < গুজরাটি হটতাল (হড়তাল), চুরুট < তামিল শুরুট, রুটি < হিন্দি রোটি ইত্যাদি। কিছু কিছু বিদেশি বা দেশি অস্ট্রিক শব্দগুলোরও আজকাল সংস্কৃত মূল ধরে বুৎপত্তি দেখানো হয় যেমন, 'হিন্দু' এই ফারসি শব্দটিকে সংস্কৃত ধরে নিয়ে বুৎপত্তি দেখানো হয়েছে হন্ডিকাকে। তেমনি লুচির উৎস ধরা হয়েছে 'লোচিকা'কে। আর্যেতর দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ— কালো, কুলো, খড়, খেয়া, চিংড়ি, ঝিঙা, ডাগর, ডিঙি, ডাঁকা, ঢেঁকি, ঢোঁড়া, ধুচনি, ফিঙৈ, বাদুড়, পাঁঠা, ভিড়, ঢিল, ঢাল, ঢোল, কিছু কিছু ধাতুকেও এর আওতায় ফেলা যায় √এড়া, √বিলা, √ঢাকা, বহু পারসি শব্দও এসেছে যেমন ওত, আড়, খাড়া, উল্টা, √কড়া, √কুলা।[৬]
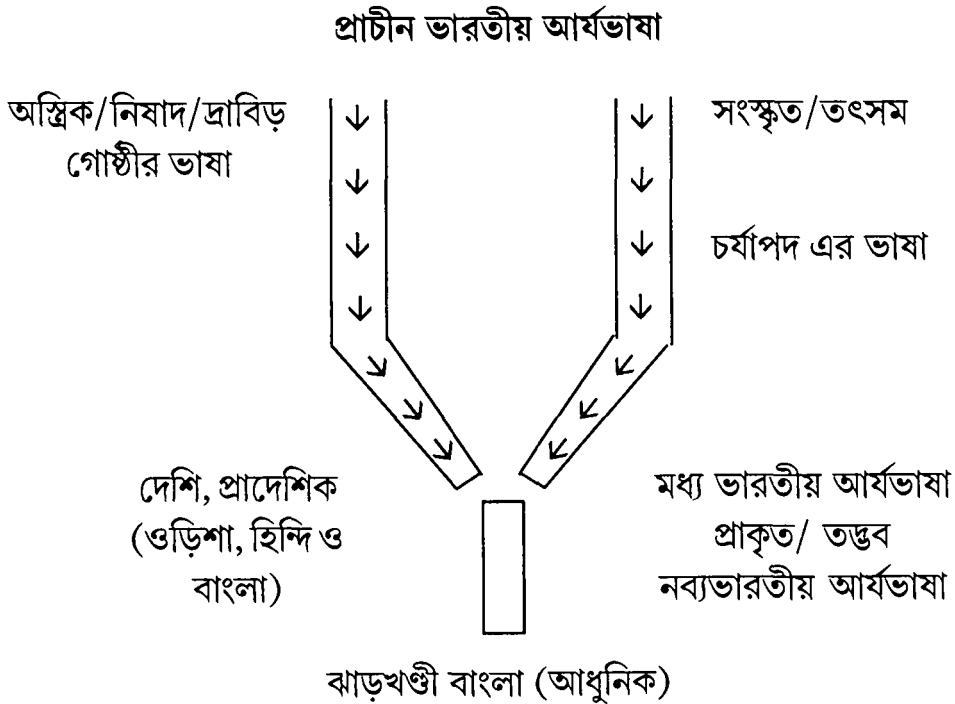
প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ শতক) সংস্কৃত/তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হত পাশাপাশি অস্ট্রিক/নিষাদ বা দ্রাবিড় ভাষা (অঞ্চল বিশেষে যেখানে দ্রাবিড়িয় ভাষী গোষ্ঠীর মানুষের বাস বেশি সেখানে দ্রাবিড়িয় ভাষা ও যে সব অঞ্চলে অস্ট্রিক ভাষী বা নিষাদ গোষ্ঠীর মানুষ বেশি) তৎসম শব্দের পাশাপাশি ব্যবহৃত হতে থাকে পরে ধীরে ধীরে উচ্চারণের ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন হতে থাকে।

চর্যাপদের পর আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে আসতে হয়। ফলে আমরা একদিকে যেমন বাংলা ভাষার ক্রমপরিণতির একটা ধারা পাব ঠিক তেমনি ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার গঠনগত সাজুজ্যকে দেখে নিতে পারবো—

মো আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী সুরোঁ মো কদমতলে বসী।।
চতুর্দ্দিকা চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।[৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন : চণ্ডীদাস বিরচিত বসন্তরঞ্জণ রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ; ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, পঞ্চম সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-ভূমিকা-১/৯০

মাগধী ও অর্দ্ধমাগধীর কিছু variation-এও আছে।ঁ চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যেতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহের অন্যতম বিশেষত্ব। 'অনার্য ভাষা সম্ভূত এমন কতকগুলি শব্দ আছে, এবং যেগুলি সংস্কৃত ভাষার দীর্ঘ সাহচর্য্যে এতটা আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে যে, সে-সব শব্দ আর্য্যেতর বলিয়া হঠাৎ ধরা পড়ে না; যেমন কাল (কৃষ্ণবর্ণ), নীর পূজা, মলয়, মীন মুকুট প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষীর শব্দ এবং কদলী, গঙ্গা, ডমরু, তাম্বুল, নারিকেল, পণ (সংখ্যাবিশেষ), পান, মুকুট, ময়ূর (অস্ট্রিক) কোল গোষ্ঠীর শব্দ।'[৪]

ধ্বনির ক্ষেত্রে শব্দের অন্ত্য অ-কারের স্পষ্ট উচ্চারণ, যা বর্তমানে ঝাড়খণ্ডী

বাংলার বৈশিষ্ট (ওড়িয়াতেও হয়ে থাকে এর এরই প্রভাব পড়েছে) শব্দের আদিতে 'অ'কারের 'আ'কারের প্রবণতা অ'র প্রাচীন উচ্চারণের প্রভাব। যেমন আঙ্গ, অঞ্চল, আতিশয় ইত্যাদি। সন্ধির ক্ষেত্রেও অ-কারের পর আ কার থাকলে আ কারের লোপ ঘটেছে। যেমন— ফুটিল + আছে = ফুটিলছে, রহিল + আছে = রহিলছে। প্রাকৃতের আদর্শে ঃ বিসর্গের লোপ, যেমন— উরুস্থল, বক্ষস্থল। প্রথমার একবচনে এ বা ই প্রত্যয় মাগধীর মতো—

প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োচ্ছিল।

ভ্রু হি' কাল শাপ যুগল তাহাতে

শোভএ নিচল হোই।।[৯]

(হি = ই)

পতী, মুনী, গুরূ, বাউ প্রভৃতি শব্দগুলি প্রাকৃতের মত।

যেমন— ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।

সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী।

ঝাড়খণ্ডী বাংলাতেও দ্বিবচন নাই। বহুবচনে নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের অভাব 'গণ', 'সব', 'সকল', 'যত' প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচন গঠিত হয়। রা দিয়ে বহুবচনের পদ পাওয়া গেছে—

বিকল দেখিআঁ তথা রাখো আলগনে।

পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মনে।।

আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।।

আহ্মারা মরিব শুনিলেঁ কাঁশে।[১০]

আহ্মার তোহ্মার গৌরবার্থে যুক্ত হয়। ঝাড়খণ্ডীতে আম্‌হার, তুম্‌হার ব্যবহার হয়, অর্থাৎ তৎকালীন রূপ অনেকটাই রক্ষিত (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)। প্রাচীন বাংলা ভাষার বহু জিনিস এই উপভাষায় এখনও রক্ষিত আছে।

সম্মোই-ই নিশ্চয়ে ঝাড়খণ্ডীতে সন্মাই, সমাই, সামাই।

চিণ্ডিআঁ- ঝাড়খণ্ডীতে - চিণ্ডিএাঁ, হাসিএাঁ, লএা।

হাতে - রায় কারে - রা-কাতে সমস্তই ব্যবহৃত হয়ে আসছে অবিকৃতভাবে।

সুতরাং ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা আজকের নয়। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই এর একটা আলাদা ভাব ও ভাষা আছে যা অস্ট্রিক শব্দকোষ যুক্ত হয়ে ঝাড়খণ্ডী বাংলাকে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করেছে।

তথ্যসূত্র

১। ঐতরেয় আরণ্যক : ২-১১-৫ : মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ (অনুদিত ও সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, ১৩৭১ সাল, পৃষ্ঠা-৪৬১।

২। বাঙলাদেশের ইতিহাস : ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১ম খণ্ড) : কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১২।

৩। চর্যাগীতি পদাবলী : সুকুমার সেন : আনন্দ, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৫৯।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৫।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬

৬। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি : জ্যোতিভূষণ চাকি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৪।

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন : বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত) : বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, দশম সংস্করণ, ১৩৮৫, পৃষ্ঠা-১/৯০

৮। তদেব. পৃষ্ঠা-১/৯০।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৫।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রবাদ প্রবচণে ঝাড়খন্ডী বাংলা ও অস্ট্রিক ভাষার সমন্বয় — একটি প্রস্তাবনা

প্রবাদ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন (প্র (বিশেষ) বদ (বলা) + অ (ভা) = পরম্পরাগত বাক্য, জনরব, লোককথা, জনশ্রুতি। (১) অভিধান প্রণেতা রাজশেখর বসুর মতে প্রবাদ অর্থে চলতি কথা। জনশ্রুতি, কিংবদন্তীকে বোঝায় (২) আভিধানিক সুবলচন্দ্র মিত্র বলেছেন — প্রবাদ হল পরম্পরা বাক্য, জনরব, জনশ্রুতি, অপবাদ (৩) লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে 'প্রবাদ'এর গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। চিরকালেই শিক্ষিত সমাজ দ্বারা অবহেলিত হলেও প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে। ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলটি জীবনরসে পুষ্ট। প্রবাদ সাধারণত এখানকার মানুষের শিরায় শিরায় প্রবাহমান। একদিকে বিভিন্ন খেরওয়ালী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ আর অন্যদিকে অখেরওয়ালী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ এদের প্রত্যেকের জীবনেই কঠিন ঘাত-প্রতিঘাত আর বাস্তব জীবনের চলমানতাকে রঙ্গ-রসে ভরিয়ে রাখে প্রবাদ ও প্রবচন। ফলে দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি সহাবস্থানের দরুণ একরকম মিশ্র-প্রবাদের চল দেখা যায়। অধিকাংশ অশিক্ষিত মানুষের পাঁচ-মিশালি জ্ঞানগর্ভ ছড়া ও প্রবাদ শুধু আনন্দই দেয় না এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে প্রবাহিতও করে।

সাধারণত পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই প্রবাদ-প্রবচন বেশি ব্যবহার করে থাকে। মহিলাদের সঙ্কীর্ণতাবোধ, প্রতিবেশিনীদের প্রতি বিদ্রূপ আর হিংসা, বাপের ঘর থেকে সদ্যবিচ্ছিন্না নতুন বৌ-এর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহহীনতা, সতীনের প্রতি হিংসাভাব, ঘর-জামাই-এর উপরেই নির্ভর প্রবাদ-প্রবচন। ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে লোককথার

শেষ নেই। আঞ্চলিক ভাষায় যা মাটির সঙ্গে মাখামাখি করে ফুটে ওঠে আপনা-আপনি ভাবে। গন্ধই আলাদা। ভাষা, উচ্চারণ, ইতিহাস, ভুগোল, সমাজ, সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট, সব কিছুই ঢুকে পড়েছে এর স্বরূপ নির্মাণে। এ সমস্ত বিশ্লেষণ না করলে এর প্রাসঙ্গিকতা ও রসসৃষ্টির ক্ষমতাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। সারা বাংলায় প্রচলিত মান্য ভাষায় যা স্বীকৃত সেই সার্বজনীন বোধগম্যতা ও স্বীকৃতি ঝাড়খন্ডী বাংলায় নেই। সুবোধ বসুরায় এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন —

> টীকা ও ব্যাখ্যা ছাড়া নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। আঞ্চলিকতা
> জনিত দুর্বোধ্যতা না হলে কিছুতেই কাটবে না।"[১]

(বৃহত্তর সমাজের বোধার্থে আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্ট যে কোন রচনাকেই কোষ গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যবস্থা করতেই হবে।) এর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করবে আঞ্চলিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে মূল সংস্কৃতিও। ভাষার প্রসঙ্গই আগে ওঠে। ভাষা হল ভাবের মাধ্যম। এ যে কত প্রাণবন্ত হতে পারে এই নীরস পাথরের দেশে অশ্বত্থ বৃক্ষের মত রসিক হতে পারে, একটিমাত্র নিদর্শনই তা প্রতীত।

যেমন — 'একটা হর্তকী, সারা গাঁয়ে আদ্দাসী'। 'অর্জ' এবং 'দস্ত' দুটি যুক্ত হয়ে সমস্ত পদ গড়ে ওঠে ব্যুৎপত্তির ক্রমপর্যায়ে বিশ্লেষণ হয়ে রূপ নিয়েছে আদ্দাসী। আরবী শব্দ 'অর্জ' এর অর্থ প্রার্থনা। আদালতে প্রার্থনা করলে এখনও আর্জি শব্দটির প্রচলন আছে। Petition শব্দটি বাঙালি নেয়নি। দ্বিতীয় শব্দ দস্ত ফার্সি অর্থ হাত। দস্তানা, দস্তখৎ, দস্তাবেজ খুবই পরিচিত। 'অর্জ' এবং 'দস্ত' মুসলমান শাসনে আইন-কানুনের সঙ্গেই চলে এসেছে ইতিহাসের অধ্যায় সৃষ্টি করে। এই অর্থে বিদেশী বহিরাগত শব্দকে বলা হয় Milestones of History। এখানেই শেষ নয়। বহুদিন পরে আত্মীকরণ ঘটেছে। ইসলামী সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। কোন ভক্তিমতি নারীর করধৃত শুভকর্মের প্রতীক একটি হরতকী। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সখা। গুণীন, গণকের স্কন্ধে তখন আবির্ভাব হবে দৈবশক্তি। পূরণ হবে অভীষ্ট প্রার্থনা। সুপুরী নয়, হরিতকী কেন? আমলকী, বহড়া, হরিতকী ছোটনাগপুরের বনভূমিতে সর্বত্রই পাওয়া

যায়। চাইবাসায় মস্ত বড় বাজার। আর সুপারি এই লালমাটিতে হয় না। তাই এই অঞ্চলে মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে হরিতকীর ব্যবহার। শাস্ত্রে এই ফলটিকে দক্ষিণা হিসাবে বা ঘটের উপরে স্থাপন করে পূজা করার নির্দেশ আছে। সঙ্কল্প বা দক্ষিণা সমর্পণে এটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানকার ভাষা নিরাভরণ, নিরাবরণ, সৌন্দর্যময় আবেদনটা সবটাই আত্মিক, বেশভূষার কাছে নয়। প্রবাদ, হেঁয়ালি, ছড়া, লোককথা বা লোকগীতি সবক্ষেত্রেই একই আর্তি —

— এক ডুঙা বাসি মাড় তলায় দুটি ভাত রে
সেই দেখে বঁধূ হামার কাঁদে সারা রাত রে।।

এত সরল স্বচ্ছ যে, মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে এর ভাব ও ভাষার মধ্যেকার ব্যবধান। আঞ্চলিক ভাষার আলোচনা মানেই উৎপত্তির অনুসন্ধান। প্রবাদের উৎসে পৌঁছতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই sayings এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবেই। ধরা যাক ঝাড়খণ্ডী বাংলায় অতি পরিচিতি একটি প্রবাদ 'ব্যাঙ মাইত্তে সনার কাঁড়'। সঙ্গে সঙ্গে মান্য বাংলায় প্রচলিত 'মশা মারতে কামান দাগা' মনে পড়বেই। এর মাইওে সনা কাড় শব্দ উচ্চারণ এবং উচ্চারণানুগ বানান দেখেই হোঁচট খাবেন বহিরাগত মানুষ। মারিতে, মারতে এখানে হয়েছে মাইওে। 'ই' ধ্বনি এগিয়ে এসেছে। 'র' ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে, স্বরসঙ্গতি অনুযায়ী 'ত' ধ্বনির দ্বিত্ব হয়েছে। ও ধ্বনি অ ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে। 'সোনা' হয়েছে 'সনা' কাঁড় ও কাঁড়বাশ (বাঁশের তৈরি ধনুক) সাঁওতালদের শিকারের প্রিয় প্রহরণ। মশা যেমন অতিপরিচিত হলেও তাচ্ছিলার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যাঙ কিন্তু ততখানি নয়। উপজাতি জীবনে ব্যাঙ জীবটি বহুভাবেই জড়িত। বহুবিধ কথা ও কাহিনির উদ্ভব হয়েছে ব্যাঙকে নিয়ে। লোককথা, লোকগীতি, খেলাধূলাতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইন লক্ষ্য করেছেন — জীবজন্তু নিয়েও বেশ গল্প আছে আদিবাসীদের একটি ব্যাঙ স্ত্রী হিসাবে উইওকে (অদৃশ্য আত্মাকে) গ্রহণ করেছে।[২]

স্থানীয় কুর্মালী লোকগীতিতে দেখা যায় —

> পঞ্চসখী মিলি পানিকে গেলা হো
> হে মাইরি, ব্যাঙ্গা রাজায় ঢেকই পানি ঘাটে রে।।
> ছাড়ু ছাড়ু ব্যাঙ্গা রাজা ছাড়ু পানি ঘাট রে
> খৈলা ডুবায়ে ঘরে যাব রে।।
> নাহি হাসি ছাড়ব এহে পানি ঘাট রে
> হে মাইরি দানয়া লেকৈ ছঠকি ননদি রে।।
> নহি তর হাথ নেহি তর পাও রে
> কেইসে করব প্রতিপাল রে।।
> এক লাথি মারলি দুয় লাথি মারলি
> হে মাইরি তিন লাথিই ব্যাঙা টিড়য়াল রে।

সাত ভাই-এর এক বোন। খুব আদুরে তা দেখে সাত বৌ হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে। ভায়েরা কাজে বেরিয়ে গেলে ভারি ভারি কাজ বোনের উপর চাপিয়ে দেয়। একবার ফুটো কলসিতে জল আনতে দেয়। কিন্তু জল ভরে ঘাট থেকে বেরিয়ে যেতেই সব জল পড়ে যায় তা দেখে বোনটি খুব কাঁদে। মেয়েটির কান্না দেখে একটি কোলা ব্যাঙ মেয়েটিকে বললে — কাঁদছ কেন, কন্যা? সব শুনে ব্যাঙ কলসির ফুটোতে গিয়ে বসল ও মেয়েটি জল নিয়ে ফিরে এল।

বাংলার সর্বত্র ছেলে ভোলাতে এখনো পাঁচটা আঙ্গুল নাচাতে নাচাতে বলে মাছ ধর, মাছ ধর, মাছ ধর। তারপর বুড়ো আঙ্গুল ধরিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলে — ওঃ ব্যাঙটাই ধরলি। অর্থাৎ অখাদ্য। আরো ভাল করে ফুটে উঠেছে মুন্ডারি প্রবাদ — 'সকেন হাইকো চখখানা'। মানে সব মাছ ব্যাঙ হয়ে গেল। অর্থাৎ সব প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে গেল। সাহিত্য কেন, প্রবাদটির জন্মকথা আদিবাসী জীবনচর্চার মধ্যেই নিহিত আছে। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এখনও এক সাধারণ দৃশ্য তীর মেরে মাছ শিকার করছে উপজাতিরা।

ঝাগুড়, ঝাগুড়, ঝাগুড়

বাপ থাকতে ব্যাটার লেগুড়

ঝাড়খন্ডী বাংলায় লেগুড় মানে ল্যাজ (লেঙ্গুড় শব্দটি লেজ অর্থে হিন্দি ও প্রাচীন বাংলার অন্য উপভাষাতে উপলব্ধ)। ব্যাঙের নেই, ব্যাঙাচির আছে। ধাঁধা লাগবে যেন বারো হত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। আরো জোরালো করতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঢোল কর্তালের আওয়াজ ঝাগুড়, ঝাগুড় ঝাগুড়। বাপকে ডিঙ্গিয়ে ছেলে যেন নিজের বিক্রম দেখাতে ব্যস্ত।

কুড়া খাঁয়ে মইল্য বাপ

তার ব্যাটার বিদ্যাপ।

বিদ্যাপ অর্থাৎ বিদ্যাবত্তা। প্রতাপ দেখানোর অনুসঙ্গও জড়িয়ে আছে?

অনেক ভাপাইলে মহুল সিঝে

অনেক কথায় কুড়মি বুঝে।

মহুল = মউল, (মহুয়া ফুল), সিঝে = সেদ্ধ হয়। শালমহুয়ার দেশের ভূ-প্রকৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বত্রই এর অবাধ বিচরণ। অনেকক্ষণ জাল দিলে তবে মহুল সেদ্ধ হয়। কুড়মি সম্প্রদায়ও তেমনি অন্যের কথা চট করে মেনে নিতে চান না।

ঝাড় ঝাড়, উছের ঝাড়।

অর্থাৎ অশুভ সূচক। ঝারি আর্থাৎ রাশি রাশি। ঝারি, ঝাড় (শব্দটি অন্য জায়গাতেও চালু— 'বজ্জাতের ঝাড়'— বাঁশঝাড় বা বাঁশবনের মতো ব্যবহার এখানে), ঝান্টি, ঝাটি — বাংলায় ঝাড়, ঝাঁটা — নানারূপে ঝাড়খন্ড অঞ্চলে হাজির রয়েছে এই সাঁওতালি শব্দটি।

ঝাড়খন্ডী বাংলা ভাষার লৌকিক প্রবাদ ঃ

(য-এর উচ্চারণ — জ এবং শ, ষ-এর উচ্চারণ স হবে, ণ-এর উচ্চারণ সংস্কৃতের মতে হবে)

১. অভাগার কপালে সুখ হিনে দিয়াসী ঘর যায়।

২. অন্যের খেতি (ক্ষেত্র) অন্যের গাই, তাঁতি বেটা লম্বা যায়।

৩. অস্তাদের মাইর সেস রাইতে।

৪. অজইধ্যার রঘু আর ক্যাঁদ্ বনের ঘুঘু।

৫. অল্পধন বিকল মন।

৬. অবলার সঙ্গে চাস, অদ্যাখ্যার সঙ্গে গৃহবাস।

৭. অড়তল বড়তল, সেই বুড়ির পঁদতল।

৮. আউল (এলোমেলো) সুতার খি, খুঁজে পাইঞেছি।

৯. আখ বাড়ির শিয়াল রাজা, বনের রাজা বাঘ।

১০. আগে পেছনে সামলাই, তারপর পাট্টা দেখাব।

১১. আঘোল (ভরপেট) বগ্লা তিতা পুঁঠি।

১২. আঁচে পিঠা, চটে চিঁড়া।

১৩. আইজ মইল্লে কাল দুদিন।

১৪. আঁটকুড়ার আঠার মন, বাঁজার সোল মন।

১৫. আদা আই্নতে মুড়িই ফাঁক।

১৬. আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায়না ভাতর চায়।

১৭. আঁধড় কুকুর বাতাসে ভুকে।

১৮. আমে ধান, তেতুলে বান।

১৯. আয়তির (এয়োতির) সিঁন্দুর দেইখে রাঁড়ির (বিধবা) ছটপটি।

২০. আকাশকে খুঁট নাই, বড়নোককে উত্তর নাই।

২১. আনাড়িকে নাড় কাটতে বললে, ছার এঁড় কাটে।

২২. আঁড়িয়া-আঁড়িয়া নঢ়েই নাগে বাছুর ছার ঠ্যাং ভাঙ্গে।

২৩. আখু গটায় দেয়নি, গুড় পাহায় দেয়। (অস্থানে গুরুত্ব)

২৪. ইদিকে টিকপকা, ঘরকে গেলে মহুল ভাজা।

২৫. ই বাঁহি কামড়ালেও দুখায়, উ বাঁহি কামড়ালেও দুখায়।

২৬. উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়া।

২৭. উবগাব্যার পঁদে সেঁক।

২৮. উইঠ্‌ল বাত ত কটক জাই।

২৯. উদ্ খাতে খুদ নাই কলমি সাগে জিরা।

৩০. উই, উঁদুর কুজন, গড়া ভাঙে তিনজন।

৩১. উথলি উৎপাত, মরণের আধবাট।

৩২. উঠতি গাছ দু পতরে মালুম (উঠন্তি মূলো পতনে চেনা যায়)।

৩৩. উঠ বললে কাঁধে বগচা। (বোঁচকা)

৩৪. উশাস মাটি এ বিলেই হাগে।

৩৫. এঁড়োর দৌড় বান্নার-মুড়া।

৩৬. একাকে বকা।

৩৭. এক উড়িযায় গাঁ উজাড়; এক বুঢ়িয়ায় বন উজাড়।

৩৮. এক মাইয়া কে আনাখানা দু মায়াকে ছিঁড়া টানা।

৩৯. এক ছ্যাদামের পিড়িং সাগ, জ্যমন মুরাদ ত্যামন থাক।

৪০. এমন কথা বলবি, যেমন কেউনা বলে উঠ।
এমন কথা বলবি, যেমন কেউ না বলে ঝুট।।

৪১. ওলের সাখি মান।

৪২. কপালে নাই ঘি ঠকঠকালে হবে কি।

৪৩. কলির বহু ঘর ভাঙানি।

৪৪. কলহুড়ি কল করেনি, জোহো জালি কল করে।

৪৫. কপালে নাই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। (এটি রাঢ় এবং বাগড়ীর উপভাষাগুলি ও বরেন্দ্রীতেও উপলব্ধ

৪৬. কচা কলা বাই নাই, ওষুধ কথা পাই।

৪৭. কপাল গুণে কাপাস ফুটে, ভাগ্যগুণে বৌ খাটে।

৪৮. কাজ নাই থিনে মাটিয়া ধান বাছা।

৪৯. কাজ সাইরে বসি সত্তুর মাইরে হাঁসি।

৫০. কাডা মরে হদে, মানুষ মরে মদে।

৫১. কানা একবারই লাঠি হারায়।

৫২. কোপনিয়ার বচন খুশি।

৫৩. কুঁঢ়া খাইঞে মরিল বাপ
তার ব্যাটার কি উৎপাত।

৫৪. কুথাকার কে, না আমড়া ভাতে দে।

৫৫. কাঁচায় ঘিন ঘিন পাকায় নক নক।

৫৬. কার-বাটনে ঘষণে পিঠা, কার চুলহায় হাগনে পিঠা।

৫৭. কাঁধে কুড়ার বনে হারা।

৫৮. কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।

৫৯. খাইল না খুলি, মুলখা ছাঁটি।

৬০. খায় যায় কাজে, যম যায় পছে।

৬১. খাই না বাটি এক পাই, খাবার সময় পাহাড় ধসকাই।

৬২. গাই কিনতে না কিনতে ঠেক-ই কিনে।

৬৩. গাধা পানি খায় গুলেই ঘাঁটেই।

৬৪. গাঁর কণিয়া সিগন নাকী।

৬৫. গায়ে গু মাখলে যম ছাড়ে না।

৬৬. গুয়ে বিষ দিনে মানুষ মরেনি।

৬৭. গেঁয়ো যোগী ভিক পায় না। (সমগ্র বাংলায় প্রচলিত)

৬৮. ঘর সর্বস তোর কুঁচিখাড়িটি মোর। (এর সঙ্গে একটি গল্প জড়িত আছে)

৬৯. ঘরে নাই নুন, ছামড়া হবে মিঠুন।

৭০. চিন্তা রোগের ইলাজ নাই।

৭১. চাষি ঠকনে বছরে, হাটুয়া ঠকনে খেয়ায়।

৭২. চড়কা পড়নে শ্রীরাম ভজে।

৭৩. চোরকে আল্‌হো সয়নি।

৭৪. চোরের সাতদিন তঃ গিরহস্তের একদিন।

৭৫. চোরে কাম্‌হারে ভেট নাই।

৭৬. ছাট নাহিনে পাঠ হয়নি।

৭৭. জমির ভিতা, মায়ার সিঁতা।

৭৮. তিন মুঁড় থার, বুদ্ধি নিবু তার।

৭৯. ডিহি কুকুরের ভুকা সার।

৮০. ডেঙ্গা ঘাই খুঁজি থিলা, গলা ঘাই পাইলা।

৮১. ঢেঁকশালেতে যাবি, না পাটরা কুড়ায় খাবি।

৮২. দড়া মাজনে সরু, কথা মাজনে মটা।

৮৩. ধীর পানি পাথর কাটে।

৮৪. ধানে ধান মিশি যায়, পড়াগড়ি আলদা হি যায়।

৮৫. ধুরকে সোল ভারী।

৮৬. নাকে কাজ না নিশ্বাসে কাজ।

৮৭. নুয়া যুগী ভিখে বাই।

৮৮. নিমনমুহাঁ সর্বসঃ খায়।

৮৯. নিঁয়া খাইনে অ্যাংরা হাগে।

৯০. নাভের বেলা বাপ-পো, হানের বেলা সুসরা জাঁই।

৯১. নিলজের পিছায় গাছ বাহিরণে; বলে ভাল ছাইরা হঁয়েছে।

৯২. নিঁয়া কভু অদা না; পুলিশ কভু দাদা না।

৯৩. নুহা সস্তা হিনে শিয়ালভি ঢাঙ্গি হবে।

৯৪. পয়সা নাই কড়ি, হাট যাবার দৌড়াদৌড়ি।

৯৫. পষ্ট কথার কষ্ট কি।

৯৬. পয়সা নাই থলিতে, ঝাঁপ দিচ্ছে কুলিতে।

৯৭. পঁদে নাই ছাল চামড়া, হাগতে গেছে পাথর মুড়া।

৯৮. পরের ধনে পদ্দারি (পোদ্দারি) — ও/অ

৯৯. পরের মুড় ভাঁড়ারীর ক্ষুর।

১০০. পরের ধনে পরধনী, সুকা বিকা মহাজনী।

১০১. পাইখ পাইরা গাওয়ালী তিনে ছানা মজালি।

১০২. পাতলায় মুলে বলে।

১০৩. বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।

১০৪. বস্যে খাল্যে সমুদ্রের বালিও আঁটায় না।

১০৫. বাঁদরের পুঁজি গানে।

১০৬. বাঙর-ঠিঙর বুদ্ধির মুগর।

১০৭. বাধা নাই মানে গাধা।

১০৮. বাটে পাইনু কামার; ফাল পাজাই দে আমার।

১০৯. বিয়া ফুরালে ছামড়ায় নাচ।

১১০. বিরি বলি কানকুটরি খাইল।

১১১. বিহা ঘরে মাইএঞা রাজা।

১১২. বাঁশ ফুললে মরে, মানুষ বুঢ়ালে মরে।

১১৩. বিধা (কিল) মারি পনস পাক না (পনস - কাঁঠাল)।

১১৪. বুঢ়া কালে ভিমরতি।

১১৫. বুঢ়া কালে কেঁদরা ছো।

১১৬. বেশি নোকে মুসা মরে নি।

১১৭. ভাব জানে না বাপের কালে, খাট বিছাই উনান সালে।

১১৮. ভাতে ক্যান ধান, না ধানসিজা মাগিকে আন।

১১৯. ভূষা কুটতে গেল দিন, নারীজম পরের অধিন। (অধীন)

১২০. ভাগ্যে ভাজ্জা, পুণ্যে পো।

১২১. ভাগ্যবানের বঝা ভগবানে বয়।

১২২. ভাত ছাড়ে, সাঙ্গ ছানেনি।

১২৩. ভিন ভাতে বাপ পড়িশা।

১২৪. ভোকে গরু বেনা খায় (বেনা গাছ)।

১২৫. মরণের সময় হরিনাম।

১২৬. মশা মাইরতে কামান দাগা।

১২৭. মরদ বড় যোধা, মাইএাকে দেয় কাঁড়কাঁশটা নিজে লেয় বোঝা।

১২৮. মলু খুজি থিলা যাহা, ওঝা বাতেই দিলা তাহা।

১২৯. মরি গেনে সরি গেলা।

১৩০. মায়ে ভাল্‌হে মুখটা, বৌয়ে ভাল্‌হে ঘোমটা।

১৩১. মাগারু হীন নাই; দিয়ারু পুন নাই।

১৩২. মাগনার টক ঘোল মিঠা।

১৩৩. মাড়কে দেবতা ডরে।

১৩৪. মামু ঘর যৌটা, আজা ঘর সৌটা।

১৩৫. মা মরণে বাপ মার্ডসা।

১৩৬. মাগা নোকের বারবন্নিয়া পিঠা।

১৩৭. মাছ খাবি লুলি, কুকুর পুসবি ভুলি।

১৩৮. মা বিয়ালনি, বিয়াল মাসি।

১৩৯. যত বড় ঘরটা, তত বড় দুয়ারটা।

১৪০. যখন হবেক ঢাপার ঢুপুর, তখন করবেক পাহার হপুর।

১৪১. যার সাজে, হাগতে গেলে বাজনা বাজে।

১৪২. যার যখন চলে, তার মুতে বাতি জ্বলে।

১৪৩. যার যেমন মন চলছে বৃন্দাবন।

১৪৪. যার মাকে কুমহীর খায়, ঢেঁকি কে তার ডর থায়।

১৪৫. যার পয়সা আছে তার ঘড়ি ঘড়ি, যার পয়সা নাই তার নাকে দড়ি।

১৪৬. যেদি আছে কাজ, বেলা বলুন সাজ।

১৪৭. যে জল বয় সে কি তিষ্টয় মরে।

১৪৮. যেইসা কে তেইসা, দাউদিয়াকে খেউসিয়া।

১৪৯. যে যার ডিহে, সে আঁইড়া।

১৫০. যে সয় সে মহাশয়, যে না সয় তার সর্বনাশ হয়।

১৫১. যৌঠে বথা, সৌঠে কথা।

১৫২. রশির গরু ভোকেই মরে।

১৫৩. লাজ নাই যাকে, রাজাও ভবায় তাকে।

১৫৪. লুকাই খাইলে সুকাই যায়।

১৫৫. সাউড়ি পালায় কি বৌও পালায়।

১৫৬. সব রাইখতে ঘর আছে, ডর রাইখতে ঘর নাই।

১৫৭. সয় সম্পদ থাক সমদি হিনে যায়।

১৫৮. সময়ে নখেই ছিঁড়ে, অসময়ে কদাল-কুড়াইল লাগে।

১৫৯. সটায় পোয় আস, নদীর কূলে বাস।

১৬০. সাকড় মাললে ধকড়, মাছি মাললে পাপ।

১৬১. সাঁঢ়ে ধান খায়, তাঁতি বাঁধা জায়।

১৬২. সিয়ালের গুয়ের দরকার, না পর্বতে হাগে।

১৬৩. সুগনির সাঁপে, পঁদ থর থর কাঁপে।

১৬৪. হাতি চলি থাউ, কুকুর ভুকি থাও।

১৬৫. হিসাবের গরু, বাঘ খায়না।

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষার লৌকিক প্রবচন ঃ

১. অঁটা নুগা সাপ হওয়া — বিশ্বাসঘাতকতা।

২. অরস-পরস — পালচি ঘর।

৩. আঁটকুড়ার আট মুয়াশ — অপুত্রক বেশি সংসারী।

৪. আঁড়িয়া উঠা হওয়া — অনেক বেশি তাগাদা।

৫. আলিসা ধাকুড়ধুমা — মোটাসোটা অথচ অলস।

৬. উলিতল জাপা — ওতপেতে থাকা।

৭. উঠিয়া পিঠিয়া — পিঠোপিঠি।

৮. ওল ঝিঝা ছা — অনেক ছেলে মেয়ে।

৯. কমরে জদি আছে বল, মুঢ়া কদাইল ধর।

১০. কমর-ভাঙ্গা — বিপর্যয়।

১১. কানাকে চাঁদ দেখানো — বোকা বানানো।

১২. কাজের সময় কাজ করে নাই, হাইগ্‌বার সময় পঁদ খঁটরায়।

১৩. কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরাইলেই পাজি।

১৪. কাঁড়ে কাঁড়েইতে নাই — শূণ্য বোঝাতে।

১৫. কাঁড়ে কাঁড়বাসে — নির্ভরশীল।

১৬. কি কইরবেক বেতনে, মাইরে দুর খ্যাঁটনে।

১৭. কুকুর কাঁধে শিখার — পরনির্ভর।

১৮. কুড় মাড়ি রাখা — তথ্য গোপন করা।

১৯. খড় নাই খ আবাদ খায়।

২০. খাছে দাছে মক মকাইছে, কামের বেলায় টৌ টৌ।

২১. গড়েই নুটেই মারা — রামধোলাই।

২২. গরিব মানুষ ফড়িঁ খায়,
ঘঁড়ায় চাইপে হাইগতে যায়।

২৩. গাছের লে গাঁড় ঠেলা বেসি (বেশি)।

২৪. গুরুগুসাঁই — গণ্যমান্য ব্যক্তি।

২৫. গুঁড় ফুটনা — হুলুস্থুল করা।

২৬. গেংটি বিচার — অন্যায় বিচার।

২৭. গেড়ু তাড়ি দিয়া — সমূলে উৎপাটন।

২৮. গোধি আঁদুলা — হতদরিদ্র।

২৯. ঘর ডুবি সাত তাল পানি — চরম সংকট।

৩০. ঘর কাদা করে দেওয়া — প্রচন্ড তাগাদা।

৩১. ঘরের সভা আঁচির-পাঁচির, কলের (কোলের) সভা ছানা।

৩২. ঘরে চুঁইটার কীত্তন, বাইরে কঁচার (কোঁচা) জতন (যত্ন)।

৩৩. ঘরে নাই জা, ছানা মাগে তা।

৩৪. ঘরে নাই খর্‌চি, জনার খাইঞে মরচি।

৩৫. ঘরে ছা ছাইড়ে দিয়ে আসা — খুব ব্যস্তভাব।

৩৬. চাটুয়ার গুড় কোহনিকে আসা — অক্ষমতা।

৩৭. চাল নাইত কি হইঞেচে, ঘি দিয়ে মাড় দিব।

৩৮. চাঁদে আর মিনি বাঁদরের পঁদে।

৩৯. চালুনির পঁদ ঝুরঝুর করে, চালুনি পরের বিচার করে।

৪০. চোরের উপর রাগ করৈ, ভুঁইঞে ভাত খাওয়া।

৪১. চোরের মন পুঁইখাড়ার দিগে।

৪২. চোরের উপর বাটপাড়ি।

৪৩. চোখে পকা পড়া — ইর্ষা।

৪৪. চুতি গড়ায় চোট।

৪৫. ছুঁচল মুচল বা পানি পানি — অবস্থা ভাল হওয়া।

৪৬. ছা-না ছো — বিরক্তি প্রকাশ।

৪৭. ছানা খ্যালাইয়ে দিন গেল, আইজকে বলে ডাইন।

৪৮. জখন ছিলম জুবতি তখন নিত্য আরতি
এখন হইয়েছি ছেইলার মা
এক বিছানায় সুই রইলে
প্রাণ গ্রাহ্য করে না।

৪৯. জার (যার) গয়না তাখে সাজে, অইন্য লোককে ঠরকা বাজে।

৫০. জাচলে (যাচলে) জামাই রুটি খায় না, রাত হইলে পাঁটরা কুঁড়া চাটে।

৫১. জাকেই (যাকেই) করবি হীন, সেই রাইখবে দিন।

৫২. জদি (যদি) দ্যাখ ঘরের টুই, তবু বাঁধ গন্ডা দুই।

৫৩. জার কড়ি তার ঘড়ি ঘড়ি, নি কইড়ার গলায় দড়ি।

৫৪. জার সিল জার নড়া, তারেই ভাঙি দাঁতের গড়া।

৫৫. জার খাই, তার বুকে বইসে দাড়ি উপড়াই।

৫৬. জার টাঁকে ঘা সে বলে বাঁইচবা নাই, জার বুকে ঘা সে বলে বাঁচব।

৫৭. জার সঙ্গে জার ভাব, তার মুখ দেখেও লাভ।

৫৮. জার সঙ্গে জার মন মিসে (মিশে) বিচ (বীজ) ধান কুটে ভাত রাঁধে।

৫৯. জার জ্যামন মন, চইল্‌ছে বৃন্দাবন।

৬০. জার ভাতার জ্যামন খায়, তার মাগ ত্যামন রাঁধে।

৬১. জিনি চিন্তামনি, তিনিই জগাবেন (যোগাবেন) চিনি।

৬২. জোহো বণা হওয়া — কাজের হদিস না পাওয়া।

৬৩. ঝিকে মাইরে বউকে শিক্ষা।

৬৪. টাকা লিবি গুইনে, ঝগড়া করবি শুইনে (শুনে)।

৬৫. ঠগ, মাতাল, তেলি, এদের সঙ্গে না রাস্তা চলি।

৬৬. ঠাকুর ঘরে কে, না আমি কলা খাইনি।

৬৭. ঢেঁকিকে সেই গঢ়ে পড়তেক হবেক।

৬৮. ঢেমনির নাই কোন গুণ, তার কপালে আগুন।

৬৯. ঢিপানের নাম বাবাজি, ঢিপান খাইলেই ডিগবাজি।

৭০. তাল ছাড়ি পিছায় চাপড় — বেতালা ভাবে কাজ করা।

৭১. তাঁতি, কামার, কুমার — এ তিন বড় ছিনার।

৭২. থাকরে কুকুর মাড়ের আসে (আশায়) মাড় দুব সেই মাসের মাসে।

৭৩. দহ্‌তে ঠেলে দিয়া — বিপদে ফেলা।

৭৪. দেবতাকে দন্ডবৎ — মরিয়া অবস্থা।

৭৫. দলমাদল ফুটনা — জাঁকজমক করা (দলমাদল বিষ্ণুপুরে যে কামানটি আছে)।

৭৬. দাম লিবি গুণে, বৌ করবি চিনে।

৭৭. দেইখে শুইনে কালা হাঁসে।

৭৮. দুদ (দুধ) উঠায় ভাত, কাড়ায় (মহিষ) উঠায় ঘাট।

৭৯. দুনিয়া ডুবলে, এক হাঁটু জলে।

৮০. ধন জই্‌বন আড়াই দিন, নজর ভইরে মানুষ চিন।

৮১. ধুলি খুসকি নাই — বেপরোয়া।

৮২. নখ বাজানা — ঝগড়া লাগানো।

৮৩. নদী না দেখেই ন্যাংটা।

৮৪. নাই কাজ ত খই ভাজ।

৮৫. নিজে বাঁইচলে বাপের নাম।

৮৬. নিজের জীবন পরের ধন সবাই দ্যাখে।

৮৭. নিজের মাগ খাইতে পায় নাই, আবার বাপের মাগ।

৮৮. নিজের ব্যালাই আঁটি সুঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি।

৮৯. নিয়া বেনিয়া ছা — বৃদ্ধ বয়সের ছেলে।

৯০. নেড়েই নেড়েই আসা — অবঞ্চিত লোকের আগমণ।

৯১. নেগুড় তুলি দেখা — যাচাই করা।

৯২. নোকে পকা পড়া — প্রচুর মানুষের সমাগম।

৯৩. পঁদে নাই চাম স্যানাপতি নাম (সেনাপতি)।

৯৪. পঁদ নাংটা মাথায় ঘমটা।

৯৫. পাহি ধড়সে নদার মা — গর্তে পড়া।

৯৬. পাইলে না হয় পার্বনে — অনিয়মিত।

৯৭. পুননা চাল ভাতে বাড়ে।

৯৮. বনির (পাখি) বাসায় চ্যমনা (সাপ) পশায় — হৈ হট্টগোল।

৯৯. বঝার উপর সাগের আঁটি।

১০০. বউ, বিড়াল, মাছি, তিন নাই বাছি।

১০১. বইসতে দিলম পিঁড়া, পঁদে লাগে সুলা।

১০২. বাপের কালে নাই গাই, চালুনি লিয়ে হাগতে জায়।

১০৩. বাপ রাজা ত রাজার ঝি; ভাই রাজা ত বুনের কি।

১০৪. বাউরি বাগাল ছাগল ধন, ভূমিজ না কর মুনিস (মজুর) জন।

১০৫. বার ঘরিয়া চাল — অনেক ঘরের।

১০৬. বাহা (বিয়া) (ওড়িয়াতে 'বাহা') ঘরিয় চাল (চলন) — আমোদী চলন।

১০৭. বাঁগি কাটা — এড়িয়ে যাওয়া।

১০৮. বিহার মজা বাজনা, জমির মজা খাজনা।

১০৯. বীরকাঁড় সাজা — মরিয়া ভাব।

১১০. বেগার বুঁচকি বওয়া — ফাল্তু কাজ।

১১১. ভাঙ্গা চাল টেকি ধরা — মহা উপকার।

১১২. ভাংথাপ হওয়া — পরামর্শ।

১১৩. মড়ার উপর খাড়ার ঘা —

১১৪. মরণকালে হরিনাম —

১১৫. মারের চোটে ভূত ভাগে —

১১৬. মাকে মাইরে ঝিকে গড় —

১১৭. মাছিকে মর নাই — গোবেচারা লোক।

১১৮. মুঢ়া মারি দিয়া — শেষ করা।

১১৯. রাইতকে বীত নাই — কঠিন খাটালি?

১২০. রণের বেলা গুণ ছিঁড়া — প্রয়োজনের সময় পালিয়ে যাওয়া।

১২১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা —

১২২. শিয়ালিয়া যুক্তি — বাজে সময় অতিবাহিত করা।

১২৩. সাগ দিয়ে মাছ ঢাকা —

১২৪. হিজল গাছে নাহা বাঁধা — নির্ভয় হওয়া।

১২৫. হাড় গোড় নাই মানা — দুর্দান্ত হয়ে ওঠা।

১২৬. হাতে গোড়ে মালুম — দেখে বোঝা।

সপ্তম অধ্যায়

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে অস্ট্রিক সংস্কৃতির প্রভাব

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলটি পালা-পার্বণ মুখর। যদিও পালা আর পার্বণ শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ আলাদা। পালা-পার্বণ হল বিশেষ তিথিতে পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর উৎসব হল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, যদিও ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির সজীব ধারা এখানকার জনমানুষকে আনন্দ মুখরিত করে তুলেছে। চারিদিকে অজস্র কঠিন শিলাস্তর ছড়িয়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে অসংখ্য শাল, পিয়াল, মহুয়ার সমারোহ। নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলকে প্রাচীন সভ্যতার পটভূমি বলা যেতে পারে। এই আদিম সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসাবে যে সকল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ছিল, কালের প্রবাহে তারা বৃহত্তর আর্য-সংস্কৃতির ধারায় বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও বর্তমানের অন্ত্যজ সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, মাহালি, লোধা, খাড়িয়া, শবর, বিরহো, অসুর, তুরি, এবং উপজাতি গোষ্ঠী — বাগদী, বাগাল, বাউরী, কুমার, কামার, চামার, হাঁড়ি, মুচি, ডোম, সুড়ি এবং উচ্চজাতী হিসাবে পরিচিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি একই অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল সহাবস্থানের ফলে তাদের জীবন যাত্রায় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবনা, রীতিনীতি মিলেমিশে এককার হয়ে গেছে। জনজীবনের দিনচর্চায়, আদিম প্রকৃতি নির্ভর গোষ্ঠীগুলির স্বাভাবিক আত্মিক সম্পর্ক এমন একটা জায়গায় গেছে যেখানে ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি ছন্দে, ঘরদোর বাঁধার ধরন ধারনে, সাজসজ্জায়, ক্রিয়াকর্মে, ধর্মীয় বিশ্বাসে বা আচার অনুষ্ঠানে, মানবকৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহজে নজরে আসে। একদিকে যেমন প্রবল প্রতিপত্তিকতায় গোষ্ঠীগুলিকে আঞ্চলিকতার সঙ্গে অভিযোজনে

সহযোগী করেছে, ঠিক তেমনি একই পরিবেশের প্রভাব তাদের দেহ ও মনে নিয়ে এসেছে আত্মীয়তার বাঁধন। উচ্চশ্রেণী আর্যরা এই অস্ট্রিক শ্রেণীর মানুষের কাছে শিখেছে অনেক কিছু বিশেষ করে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, উৎসব, তন্ত্র-মন্ত্রের নানা ব্যবহারিক প্রয়োগ আর গ্রামজীবনের সমাজ বিন্যাস ও গ্রাম শাসন করার বিভিন্ন পদ্ধতি। কেবল উপজাতি বা উপজাতি উদ্ভূত গোষ্ঠীগুলিই নয়, মাঝি, কোড়া, ডোম, বাগদি, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নহিন্দু ভূমিজ ও মাহাত প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা বিরুদ্ধ পরিবেশ, ব্যবহারিক দ্রব্য-সম্ভারের স্বল্পতা, রোগ, ব্যাধি, অকালমৃত্যু, নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়ানোর জন্য তাদের বিশ্বাসে দেখা দিল অশরীরী বা অতিপ্রাকৃত শক্তি। কালক্রমে ধীরে ধীরে সমগ্র জনসমাজে তা প্রতিফলিত হয়ে পড়ে।

সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি। সম্ এই উপসর্গটি সম্পূর্ণ সুন্দরতাকে নির্দেশ করে আর কৃতি অর্থাৎ কাজ। জীবন ধারণের জন্য যা কিছু করা হয় তাকে সুশোভিত করার চেষ্টাই সংস্কৃতি শব্দে বাংলায় ব্যবহার হয়। বাসস্থান, খাওয়াপরা, জীবিকা, আচার-আচরণ, চিত্ত-বিনোদন, পরিবেশ সমস্ত কিছুই সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতির দ্বারাই বোঝা যায় একটা জাতির ধর্মবিশ্বাস, সমাজ, সাহিত্য, ভাবাবেগ। অর্থাৎ জীবনের অন্তস্থলের নিগূঢ় রূপ তত্ত্বটিই হল সংস্কৃতি। যেটা মানুষের নন্দন তত্ত্বকে প্রস্ফুটিত করে। ড. ধীরেন্দ্র নাথের মতে — "লোকসংস্কৃতি শব্দটির মধ্যে সংহতি, প্রথাগত, গোষ্ঠী নির্ভরতা, সমষ্টি চেতনা যেভাবে বর্তমান, নিছক 'সংস্কৃতি' শব্দে তা নেই। লোকসংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Folklore বা Folk culture — ইংরেজি Folk কথাটিতে একটি অবজ্ঞা ও নিম্নমানের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়"।[১] মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামে-গঞ্জে চারাটানা, ধান নিড়ান, ধান কাটা, আঁটি বাঁধা, ধান বোঝাই করা থেকে বাড়িতে বয়ে আনা আবার ধান ঝাড়াই-মাড়াই করে খামার পরিস্কার করে। পুরুষদের সঙ্গে কাঠ আনা। আজকের দিনে তাদের জীবন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সাহিত্য, নৃত্যগীত সমস্ত কিছুই শহরের জীবন যাত্রার থেকে আলাদা। আদিবাসী অর্থাৎ অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর জীবন যাত্রায় রীতি-

নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের আঙিনায়, ধর্মবিশ্বাস, অশরীরী বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনায় আজও তারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা সজীব রেখে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় জীবন যাত্রার প্রতিটি ছন্দে আদিম সংস্কৃতির ছাপ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে দেখা যায় তেল-মশলার খাবার মোটেই পছন্দ করে না। পোড়া-পাতে পোড়া খাবারই তাদের প্রিয়। যুগ যুগ ধরে তারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা সজীব রেখে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখেছে। ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বলতে সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধা, শবর, বীরহোড়, কোড়া, মুন্ডা, হো, মাহালী, অসুর, প্রভৃতি জাতি বসবাস করে। বেশিরভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ এবং খেতমজুরের কাজ করে। আবার বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় চাকরিতেও নিযুক্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই প্রেক্ষাপটে শিকার প্রক্রিয়ায় জীবন জীবিকার অবস্থা পর্যালোচনা নিতান্তই অস্পষ্ট। আদিবাসী জীবনের কালানুক্রমিক এবং সমসাময়িক অবস্থানে এসবের হদিস পাওয়া যায়।

১. জীবনচর্চা → (জাতি-প্রজাতি)

২. সমাজ-পরিবেশ → পরিস্থিতি-পরিজন

৩. সাহিত্য ও লোকভাষা → (ছড়া, প্রবাদ, প্রবচনকথা, লোকনাট্য, যাত্রা, মন্ত্র) ইত্যাদি

৪. ধর্ম → বারব্রত — গাজন-মেলা-পরব, আচার-অনুষ্ঠান

৫. সংগীত → তুষু-ভাদু-ঝুমুর-বাউল, কবিগান — বিবাহগীতি-কর্মসংগীত)

৬. নৃত্য → কাঠিনাচ, পাতানাচ, ভুয়াংনাচ, নাচনি নাচ, বাঁধনা-করম, শিকারনাচ।

৭. শিল্প → মৃৎ, তাঁত, রেশম, ঢোকরা, শঙ্খ, শোলা, কাঁসা, বেল ও তুলসীমালা।

৮. চিত্র → পট, উল্কি, দেওয়াল চিত্র, পুথির পাটাচিত্র, আলপনা, নক্সী কাঁথা।

৯. বিশ্বাস ও সংস্কার → তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ, দেওয়াল চিত্র, জানগুরু-গুরুমা, সাধুবাবা, জল পড়া, তেল পড়া, নুন পড়া।

১০. দারু ও প্রস্তর শিল্প → পাথরের বিভিন্ন জিনিস, অলঙ্কার।

১১. ক্রীড়া → তাস, ডাংগুলি, মুরগীর লড়াই, ঘুড়ির প্যাচ, বিভিন্ন ধরণের খেলা।

১২. চিকিৎসা → ঝাড়ফুঁক, জড়িবুটি, তাবিজ, কবচ, গৃহরত্ন, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি।

১৩. বাদ্য → ধামসা, মাদল, আড়বাঁশি, ঢাক-ঢোল, কাঁসর, সিঙা।

১৪. উৎসব → ধর্মঠাকুরের গান, মনোহরের মচ্ছব, শিবের গান, চড়ক, ঝাঁপান ও বিভিন্ন মেলা।

১৫. লৌকিক দেবদেবী → সিন্নী, আস্তিক, মনসা, চন্ডী, সত্যপীর, জাহের, সিঙবোঙা, মারাংবুরু, বড়াম (গরাম), শীতলা।

১৬. পুরাতত্ত্ব → প্রাচীন মূর্তি, স্মৃতিফলক, শিলালিপি, মন্দির, মন্দির লিখন।

১৭. নৃতত্ত্ব → মানুষের আদিম পরিচিতি ও আচার আচরণ।

১৮. আচার-অনুষ্ঠান → জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ্ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

১৯. লোকনাম ও জনমানস।

২০. শ্রম ও শ্রমজাত ফসল প্রভৃতি লইয়া ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবনার একটি বিশেষ অঞ্চলে পরিণত হয়েয়ে যা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

আদিবাসী সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনাদর্শ ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যেখানে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনকে আর আলাদা করে ভাববার কোনো অবকাশই নেই। সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে ছড়া, নৃত্যগীত (বিভিন্ন প্রকারের) করম, জাওয়া, ভাদু, টুসু, বিয়ের গান, অহীরা, ধরম পূজায় মাহরা গান, মনসার জাঁত, জিতুয়া বিয়ের গান, জাওয়ানাচ, ছৌ নাচ, ডুয়া গান, পট গান, খেলাধূলা, ব্রতকথা, হাট ও মেলা, তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝুমুর তাছাড়াও উলকি, আলপনা, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের বিভিন্ন আচার — সমস্ত কিছুকে নিয়ে ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে অস্ট্রিক ভাষা ও ভাষী মানুষদের একটা অবদান প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা ভূ-প্রকৃতি,

জীবজন্তু, বৃক্ষলতা পাতা ফলমূল ঋতু বৈচিত্র্য এসবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আদিম মানুষের ইন্দ্রজাল, উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আজও সমানভাবে একটা ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। বলতে বাধা নেই, অস্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদিন আদিম বন্য পরিবেশে গড়ে উঠেছিল ফলে অরণ্য কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে সুলক্ষিত।

ছড়া ঃ

বহু ভাবযুক্ত মুখে মুখে রচিত অন্ত্যমিলযুক্ত ছোটো আকারের পদ্য। এগুলি দুই, চার অথবা ছয়টি পঙ্‌তির হয়ে থাকে। ছড়া মানব জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। এর মধ্যে রয়েছে মাদকতা ও আবেগময়তা যা অপরূপ রোমান্টিক পরিবেশে মানুষের মনকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন —

হাতি ঝুল ঝুল আইল বান।
হাজেএ্যাঁ গেল জলার ধান।।
হাতি যাবেক বর্ধমান।
হাতির খপায় পাকাধান।।
কে খাবে রে? (ছেলের নাম)

বান আসার ফলে জলা জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে। হাতি যেমন করে যাবার পথে ধানের জমিকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। ঝাড়খন্ড, বাঁকুনা, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদনীপুরে ধান পাকার সময় এই হাতির হানাকে স্মরণ করে ছড়াটি রচিত হয়েছে। ঝাড়খন্ডী ভাব ও ভাষায় ছড়াগুলি অনবদ্য রূপ লাভ করে থাকে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর প্রধান অবলম্বন ছড়া। যখন শিশুর মন চঞ্চল, তাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে মা কত রকম ছড়া বলেন — দামাল ছেলে এইসব ছড়া শুনতে শুনতে এক রোমান্টিক পরিবেশের স্বপ্ন দেখে —

১. আয়রে আয় টিয়া লাফ ঝাঁপ দিয়া,

খোকন আমার পান খেয়েছে শাশুড়ি বাঁধা দিয়া।

২. বাছা ঘুমা ভোলা ঘুমা,
নাইচে নাইচে কটাহস পালা।
জাগবে বাছা যখন রে;
আসবি তরা তখন রে।

৩. আয়রে ভালুক আঁদাইড়ে
থাকবে ভালুক পিঁদাইড়ে
ঘুম বাছা বাঁদাইড়ে,
ভালুক সিঁধায় আছাইড়ে।

৪. ধন ধন ধন ধনা
খেপা মোদের সনা
ধনা যখন খেপে
টাঁড় তখন কাঁপে
ওরে ধনা ঘুমা,
দিক তরে নুনা।
ঘুমা খেপা আগে,
মিঠাই পাবি জাইগে।

ছড়াগুলির মধ্যে একদিনে আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে হাস্যরসও পরিবেশিত হয়েছে। শিশুদের কুকুর, বিড়াল, ভোঁদড় প্রভৃতি পশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তাই ছড়াগুলিতে এসবের উল্লেখ বেশি থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে আবার ভয় দেখাতেও হয় তাই মাঝে বাঘ, ভালুক প্রভৃতিকে ডেকে আঁদাড়ে, পিঁদাড়ে লুকিয়ে রাখতে হয়। শুধু ভয়ই নয় প্রয়োজনে শিশুদের লোভও দেখাতে হয়। দুধ, ছানা, গয়না, মিঠাই দেওয়ার আশ্বাস দিয়েও শিশুদের ঘুম পাড়ানো হয়। আবার ঝাড়খন্ডী জনমানসে টুসু অত্যন্ত আপনজন। টুসুকে ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে আনা হয়েছে এই ছড়াটিকে —

টুসু ঘুমাই্ল পাড়া জুড়াইল বর্গি আইল দ্যাশে।
চটা পাইখে ধান খাএ্ঞেঁছে খাজনা দুব কিসে?
টুসু ঘুমাই্ল পাড়া জুড়াইল বর্গি আইল দেশে।
চুই্টা ইঁদুর ধান খাচ্ছে সংসার চইলবেক কিসে?
টুসু ঘুমাই্ল পাড়া জুড়াইল, হাতি নামইল টাঁড়ে।
গাঁয়ের মরদ ঘুটকায় বুইলছে লাঠি ঠেঙ্গাঁ লিয়ে।

ঘুম ভাঙানি ছড়া ঃ

ছেলেকে ঘুম পাড়ানো যেমন কষ্ট ঘুম ভাঙানোও তেমন কষ্ট। শিশুর ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য তো তাকে আঘাত করা হয় না, চিৎকার করেও ঘুম ভাঙানো যায় না। তাই মধুর কণ্ঠে ছড়া কেটে শিশুর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা হয়।

ইসলি দিয়ে রাইত কাটে
আলো ফুটে আকাশে।
মহুল ফুলের বাস ভাসে
সারা আকাশ বাতাসে।

বীরত্ব ব্যঞ্জক ছড়া ঃ

শিশুর মধ্যে মা-বাবা দেখতে পায় ভাবী জীবনের সম্ভবনা তাই শিশু তাদের কাছে গর্বের বস্তু। তাকেও জীবনের স্বপ্নকে এই বীরত্ব ব্যঞ্জক ছড়ায় অনেক সময় ব্যক্ত করা হয় —

আমার ছেল্যা রাজা, খায় তাজা গজা।
সঙ্গে চলে ঘোড়া, মল্লদেবের চেলা।।
লাখে লাখে সেনা গোলাম হয়ে কেনা।
হাতিশালে হাতি, নাইকো তার সাথি।।
ললগড়ের বাবু, এর ভয়ে কাবু।।

সামাজিক ছড়া ঃ

বাস্তব পরিবেশ, পরস্থিতি ও পছন্দের দিকটির থেকে ছড়া মুখ ফিরিয়ে নেয়নি—

দেশ গুণে ভেস দাদা হামার কিব দোষ

টুই-টাইরার ভাজা দাদা কাঁককুকের ঝোস। (টুই-টাইরার-টুরিব্যাঙ, কাঁককুক-জ্যাড়ব্যাঙ, ঝোস-ঝোল)

পারিবারিক ছড়া ঃ

ছড়াতে পারিবারিক জীবনেরও প্রতিফলন ঘটেছে —

মামা ধামা বাজানা কাঠের পুতুল কিনে দিব

শাউড়ি নাচানা।

বর্ণনামূলক ছড়া ঃ

ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চল ঝোপ-ঝাড়, টাঁড়-টিকর, পশু-পাখিতে ভরা জঙ্গল মহল। তাই তার ছাপ পড়েছে —

শাল গাছের শালডহরা কদম কাছের কালি রে,

ওর গায়ে লাল গামছা চটক দেখে মরিরে।

ধর্মীয় ছড়া ঃ

ধর্মীয় প্রভাবও ছড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে —

শিবের ঘরে ভাত নাই বাতাসে লড়ে হাঁড়ি।

দুগ্গা যাবে বাপের বাড়ি পথ ছান দুয়ারী।।

খেলার ছড়া ঃ

শিশুর জীবন খেলায় ভরপুর, খেলাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে প্রচুর ছড়ার প্রচলন আছে —

ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড়

চাম কৌটা মজুমদার

ধেয়ে এল দামুদর

মজুমদারের হাঁড়িকুড়ি

দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি

চাল কাড়তে হল বেলা

ভাত রাঁধতে দুপুর বেলা

ভাত খেয়ে যা জামাই শালা

ভাতে পড়ল মাছি

কোদাল দিয়ে চাঁছি

কোদাল হল ভোঁতা

খা কামারের মাথা।

মন্ত্র ঃ

ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে একটি বিচিত্র সুরে কখনো বাদ্যযন্ত্রের সাহচর্যে আবার কখনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তবে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক করার সময় কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। সাধারণত বিষম ঢাকীর সাহচর্যে ঝাপানের সময় ওঝা মন্ত্রোচ্চারণ করে থাকে। ভূত-প্রেত, ডাইন, সাপের কামড় বা বিভিন্ন শারীরীক অসুবিধা হলে অনেকে আজও ওঝার কাছে চিকিৎসার জন্য ছুটে যায়। ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে ওঝা বিভিন্ন জাতীর হয়ে থাকে সাঁওতাল, কোড়া, ধোপা, বাউরি, মাহাত-কুড়মী প্রভৃতি জাতের। বিশেষত আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃতির রোষানল থেকে সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যই এই ওঝার সৃষ্টি। জ্যৈষ্ঠ রহিনীর দিনে মনসার পুজো করে ওঝারা চেলা বানায় বা শিষ্য নিয়োগ করে। প্রতি সন্ধ্যায় তাদের মন্ত্র শেখানো হয়। ঝাড়খণ্ডীতে এদের গুণী বলা হয়। এই গুণীদের ক্ষমতা অপরিসীম বলে জনমানসে শ্রদ্ধা ও ভয় দুটোই থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় আখড়ায় তুলসী-মঞ্চের সামনে উবু হয়ে বসে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রের শিক্ষাদান চলে। মন্ত্রগুলির মধ্যে সর্প-মন্ত্রই বেশি পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়।

তাছাড়াও ভূত ছাড়ানো, গা বাঁধা, জ্বর ছাড়া, কুনজর লাগা, ধূলো পড়া জল পড়া, হলুদ পড়া, সমস্ত কিছুই পড়া যায় অর্থাৎ ওঝা মন্ত্রপূত করে দিতে পারে, যে অভিলাষী ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মন্ত্রগুলিতে শ্রুতির মাধ্যমেই শিষ্যদের শেখানো হয়। একান্তভাবে যদি এগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে হয় তাহলে তা লাল কালি দ্বারা করাই বাধ্যতা বলে ওঝার কাছে জানা গেছে। সাধারণত অন্যান্যদের কাছে গোপনীয়তার ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণত মন্ত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পূজা-অর্চনা, বিয়ে, শ্রাদ্ধের ক্রিয়াতেই মন্ত্র একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। মন্ত্রের ভাষায় তৎসম শব্দের আধিক্য বেশি কিন্তু অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের সাঁওতাল, কোড়া, মুন্ডা, অসুর প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মন্ত্রগুলিতে দেশীয় শব্দে বিনতী করা হয়। আমরা বিভিন্ন সাঁওতাল ও কোড়া গ্রামে গিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে দেখেছি যে খুব বেশি মন্ত্র নেই তবুও এই মন্ত্রটি দেওয়া হল —

> 'চন্দ্র, সূর্য চানডুবেলা মা ঠিকমত এঞআমে সিমমেন্ডে আলঃ আতি নাম
> ছামড়া বঙ্গা মেন্ডে আতি নাম, হন রে, হপনরে, বীররে, কাঁদাড় রে,
> দাঁড়ানাকু ধিরি লাকা লুআড় হুজুআকু মিএঞঃ জানুম শুদ্ধা কাটারে
> আলঃখকা আন্তি হড় সনঃতানাকুঃ একিদম চিল্কা সনতানাকুঃ ইঙ্কাগেন
> যেমন হুজুকাখো, বাদি বেআদা যেমন সাত সমুদ্র পার তাকাকু আম।

আবার মন্ত্রগুলিরে মধ্যে পৌরাণিক দেবতার প্রসঙ্গ কথা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, শিব, মনসা, কালি, দুর্গা, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবতার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে কোন দেবতার স্মরণ নেওয়ার দরকার তা গুনিরা ভালো করেই জানে। এখানে আদিম মানুষের জীবন স্পন্দনের মধ্যে কুসংস্কারেও দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমে গা বাঁধার একটি মন্ত্র, এই মন্ত্র তিনবার বলে গা বাঁধলে, ভূত-প্রেত, ডাকিনী, অপদেবতার নজর লাগে না, আবার পোকা-মাকড় ও সাপের হাত থেকেও নিস্তার পাওয়া যায় —

ঘর বান্দি, দুয়ার বাঁন্দি, বান্দি ঘরের পাইড়, চৌষট্টি দুয়ার বান্দি দিয়ে লুহার হাড়। বাপ গজ মহাধ্বজ ষোল গজ মাটি বন্দী, কে বন্দি মহাদেব বন্দি, এই বন্ধন যদি লড়ে চড়ে শিবের জটা চন্ডালীর পায়ে ছিঁড়ে পড়ে।

মন্ত্রের মধ্যে সর্পমন্ত্র বিশেষভাবে প্রচলিত। সর্পদংশন নিবারণ করার জন্য সাপের মুখ বেঁধে ফেলা হয়, যাহাতে সাপ আর দংশন করতে না পারে —

টিলহার মাটি দেবীর বাট, লাগ সাপাকে ঠঁটে ঠঁটে দাঁত। আব গায় না ফুটে দাঁত, হাত বাড়াইছে শিবশঙ্কর নাথ। হাত বারং লুহা জারং, সাপ সাপিনীকে অধীন করং। কি খাবি রে সাপা? হাতে আছে দেবী ধর্মের পা। জিরভা তোর হোক অসাড়, দোহাই রাজা গোবিন চাঁদ। মুখে আশি বঁদ আর বঁদ বিষের নলী। হা হা কর‍্যে খাস না মুখে, রাজা বঙ্কের দুহাই তকে। থাক সাপা নিশ্চলে, মুখ বান্দ্যেছি লুহার শিকলে। কার আজ্ঞায়? মা মনসার আজ্ঞায়। মন্ত্রটিতে অনুস্বারের প্রয়োগে সংস্কৃত-এর গন্ধ এনে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

সর্পদংশনের বিষ ঝাড়বার মন্ত্রের সংখ্যা অসংখ্যা। যে কোনো পৌরাণিক আখ্যান থেকে বা যে কোন সময় থেকেই এই মন্ত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে।

"সপ্ত পাতাল তল থেকে বাসুকী হাঁকিছে রব। যখন গুরুর লাম ধরে ডাকি শিরা, উপশিরা হইতে বিষ, নাম উচা হতে নাম নীচু হতে। কার আজ্ঞায়? গরুড়ের আজ্ঞায়"।।

"যখন কালা ঝাঁপ দিল কালিন্দীর জলে, কালিন্দীর জলে নাগ দংশিল গোপালে ঢলিয়া পড়িল সাম বিষের জ্বালায় তখনি গরুড় প্রভু করিল স্মরণ, গরুড়ে স্মরিতে বিষ হল খান খান কার আজ্ঞায়? মা মনসার আজ্ঞায়"।।

এগুলোর মধ্যে রামসার, কৃষ্ণসার, গরুড়সার, লক্ষ্মণসার, শিবচিয়ান মন্ত্র প্রধান। এগুলো খ্যাতিসম্পন্ন ওঝাদের কাছেই থাকে। এই মন্ত্রগুলো সাধারণত কাউকে বলে না। এই মন্ত্রগুলো অনেকটা পালাগানের আকারে ব্যবহৃত হয়। তবে এই গানগুলি ভাষাতত্ত্বের

বিচারে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শিবচিয়ান মন্ত্রটি দেওয়া হল —

"ভূমস্তকে বিষ মহাদেব মথন করিল, অকুটা কলার পাত বিষ আনিয়া রাখিল। অতি যতন কর‍্যে বিষ চার ভাগ করিল, একভাগ বিষ মহাদেব নাগগনকে দিল। একভাগ বিষ মহাদেব খড়ি পিঁপড়িকে দিল, একভাগ বিষ মহাদেব মানুষকে দিল। একভাগ বিষ মহাদেব বাঁচাঞে রাখিল। হাঁসিয়ে খেলিয়ে মহাদেব স্নান করিতে গেল খিরাই নদীর কূলে। জয় বিজয় দুটি ঢাক বাজিতে লাগিল, বিষকে অমৃত বলে মহাদেব ভক্ষণ করিল। কি কর কি কর মামী নিশ্চিন্তে বসিয়ে, তোর মুন্ড খাইগো মামী গণেশের মুন্ড হাত, সত্য ঢলেছেন মামা শিবশঙ্কর নাথ। ডানহাতে অমৃতের ডালা বাঁহাতে সিঁদুরের কাঁটি হাঁসিয়ে খেলিয়ে দুর্গা পোহাইল রাতি। রাত্রি পোহাইল দুর্গার পড়ে গেল মনে, উঠ উঠ নারদ ভাগিনা ঘুমে অচেতনে। তোমরা তিন ভাগিনা সিজুয়াকে যাও, সিজুয়ায় আছে কে, পদুমা কুমারী অহোড়ং চিয়াও চা, যেই চিয়ানে চিয়ায়েছে বালা লখিন্দর। সেই চিয়ানে চিয়াও (অমুক নাম) কার কালঘুম। কাল বেকাল চেক্ষুর চাঁদ, নামে দিশ বিষ দেখুক জগৎ সংসার। বড় ঘরের বউ জলকে যায় কাঁখে কুম্ভ করি, অমকের দের কালকূটের বিষ হল্য গঙ্গার পানি"।

এই চিয়ান মন্ত্র সর্পদংশনের বিষ ঝাড়ার শেষ মন্ত্র। এই চিয়ান মন্ত্র ব্যর্থ হলে রোগীর জীবনের আশা ছেড়ে দিতে হয়।

সাপ খেলানোর মন্ত্র ঃ

১. মাকে আনতে যাব গো সুবর্ণরেখার কূলে,
দুহাতে রক্তজবা চরণে নুপুর।
চাল কাটি চালান কাটি কাটি সিঙ্গার বাণ,
কে কাটে গরু কাটে, কাটি করি খান।
গরুর আজ্ঞায় সিংগার হবে খান খান,
মাকে আনতে যাব গো সুবর্ণরেখার থান।

বিনা অপরাধে কেহ্ করে ঘা,

সাত সিনিবুড়ির দোহাই করি আজ্ঞা।

মাকে আনতে যাব রে সুবর্ণরেখার কূলে

দুহাতে রক্তের জবা চরণে নুপূরে।

২. চল মাকে আনতে যাব ক্ষীরাই নদীর কূল।

হাতে সাজে হাত বালা কানে সাজে দুল।।

চল মাকে আনতে যাব ক্ষীরাই নদীর কূল।

পায়েতে নুপূর সাজে মা শিরেতে সিঁদুর।।

হাতে সাজে বাজু বালা মা, মাথায় রাঙা ফুল।

চল মাকে আনতে যাব ক্ষীরাই নদীর কূল।

ভূত ছাড়ানো মন্ত্র ঃ

১. করাত করাত আসতে কাটে যাইতে কাটে

হরগল রেখে পরগল কাটে,

ডিট কাটে, মিট কাটে কুজ্ঞান কাটে,

ডাইনি-যুগিনীর নজর কাটে, লোহার পাত বেড়ি কাটে।

কাট ছিড়ি বিদ্যা, এত বড়ো গুণ,

কাটলাম ছিড়লাম, তবু না পাইলাম চিন।

গাঁইট কাটাম, গাঁঠলি কাটম,

কাটম লোহার শিক।

ষোলশো ধ্বন্যি কাটে কার আজ্ঞায় — কাউরি কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞায়

কাউরি কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞায়।।

(তিনবার মন্ত্রটি পড়তে হবে। প্রতিবারই রোগীর শরীরে মন্ত্রের শেষে ফুঁ দিতে হবে।)

২. ধুলা ঝাড়, ধুলা বাঁট, ধুলা করলাম সার

আশি হাজার কুহিলী বন্দি বাইশ হাজার লাখ।

মায়াদেবী মনসা কোথাকার করিয়া প্রয়াণ

হামকা সরিয়া যায় হয়ে সাবধান

হাত বন্ধ পা বন্ধ আর বন্ধ গলা

কোটি কোটি চরণ বন্দি মা মনসার স্মরণে

কার আজ্ঞায়? বড়োবাপবীর — লড়সিংহের দোহাই (৩ বার)

(এই মন্ত্র বলে গুণি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে ভূতপ্রেত ছাড়াতে যান।)

হলুদ পোড়া ঃ

হলুদ হলুদ হলুদ তোর উজ্জ্বল বরণ,

উপকৃত হয় নর তোমার কারণ।

মক্কার পির হতে ঈশ্বর মহাদেব,

নরের দেহ হতে দূর কর অশিব।

উমুকের অঙ্গে ভূত করে আছে ভর,

হলুদ পোড়ায়ে তারে দূর কর হর।

উমকার অঙ্গ হতে ওরে ভূত তুই পালা,

নতুবা বড়াম বুড়া করবে হামলা।

কার আজ্ঞায়? বড়াম বুড়ার আজ্ঞায়। (৩ বার)

ধূলা পোড়া মন্ত্র ঃ

ধুলি আমি লইলাম হাতে, কে করে টান?

যে করে এই ধূলা পড়ায় কুজ্ঞান অজ্ঞান।

অনিষ্ট করিবে যে তার মরণ হইবে,

যেবা করে অনিষ্ট সে তখনি মরিবে।

আগে যায় সদা শিব পিছে যায় নন্দি,

বলদেরে লয়ে চলে সেই মহাভৃঙ্গি।

শিব পদ ভরে পৃথ্বি কাঁপে থর থর,

অমূকের অঙ্গের ভূত হৈল জড় সড়।

দিশা নাহি পাইয়া ভূত পলাইয়া যায়;

উমুকের করেছিল ভর, আর নাহি ভয়।

কার আজ্ঞায়? সদা শিবের আজ্ঞায়।

কার আজ্ঞায়? হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞায়।

ডাইনির দৃষ্টি কাটানের মন্ত্র ঃ

বিলুর বিলি শিবের ঝুলি দন্ড সে ব্রহ্মার

ডাইনি দৃষ্টি করে ছেলে

মন্ত্র পড়ি সার বিধির দন্ত রামের

কো দন্ত আর হরের শূল টানিয়া ছিঁড়িয়া

তার তুলে দিল মূল

দেখিয়া তিনের কান্ড ডাইনি ছিল যত

হ্রীং রাং মন্ত্র বীজে ঝাড়নেতে হল সব হত। (তান্ত্রিক প্রভাব)

জলপড়া মন্ত্র ঃ

১. ভজ মন গোবিন্দ, ভজ মন রাম

গঙ্গায় তুলসী শালগ্রাম

ওঁ রিং ত্যাজ্য মন্ত্রে স্বাহা, ত্যাজ্য মন্ত্রে সাহা, ত্যাজ্য মন্ত্রে সাহা।

২. শ্রীরাম ক্রিং বিদ্যাং রিং

ওঁ রিং ত্যাজ্য মন্ত্রে সাহা, ত্যাজ্য মন্ত্রে সাহা, ত্যাজ্য মন্ত্রে সাহা।

৩. কলং নয়ং হুং ফট স্বাহা।

ধর্ম

গাজন ঃ

ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে গাজন খুবই জনপ্রিয়। চৈত্র মাসের শেষে শুরু করে সমস্ত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজন পরব। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদনীপুর, আসানসোল ও বীরভূমের অংশও ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও অনুষ্ঠিত হয়। শিবকে যেমন ধ্বংসের দেবতা হিসাবে ধরা হয় তেমনি সৃষ্টির সূচক বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যবে পরবের সূচনা হয় সেই দিনটিকে কামল্যা ওঠা বলে। সাধারণ ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘন্টা সহযোগে এই কামল্যা ওঠার দিন থেকে দশদিন মহাসাড়ম্বরে শিবের পূজা-পাঠ হয়। সাধারণ গাজনে ভক্ত্যা অনেকেই হয়। যাদের মধ্যে সমস্ত ভক্ত্যাকে নেতৃত্ব যিনি দেন তিনি হলেন রাজভক্ত্যা বা পাটভক্ত্যা। অন্য ভক্ত্যাদের দেউলিভক্ত্যা বলা হয়ে থাকে। পাটভক্ত্যা ছাড়াও নীলভক্ত্যা, ধামাত কন্যা হয়। পূজারি সকলের গলায় উতরী (সংস্কৃতে উত্তরীয়) (সাদা সূতো) পরিয়ে দেয় (শুদ্রজাতি হলে) ব্রাহ্মণ হলে হাতে উতরী পরায়। প্রত্যেকটি ভক্ত্যা দিনান্তে পূজার শেষে সান জল সহকারে পূজোর প্রসাদ গ্রহণ করে রাত্রে খাবার বা পানীয় জল পান করতে পারে। খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন ফলমূল ও রুটি, সুজি, মুগভিজা, ছোলাভিজা প্রভৃতি। সকলের হাতে থাকে একটি করে বেতের কাঠি। প্রত্যেক ভক্ত্যাই প্রধান ভক্ত্যা অর্থাৎ পাটভক্ত্যার আদেশ মেন চলেতে বাধ্য থাকে। এই সময় বিভিন্ন কাষ্টের মানুষ সাঁওতাল, মাহাত, কোড়া, ভূমিজ, ভুইএ্যা, দুলে, বাউরী, চর্মকার, বাদ্যকার, মালাকার, শুড়ি, ডোম, ব্রাহ্মণ প্রত্যেক মানুষেই এই গাজনে শিবের ভক্ত্যা হতে পারে। পুরোহিত পূজো করে পাটকে ধোয়ায় এবং পুকুর থেকে সমস্ত ভক্ত্যা মিলে শিবথানে নিয়ে আসে। পূজো করে পরের দিন মহাসমারোহে বাদ্যযন্ত্র সহকারে অনেক চৌদোলা বানিয়ে পুকুরের ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে বালির শিব তৈরী করে বেলপাতা দিয়ে পূজো করে। পূজা শেষ হলে সকলে মিলে হাততালি দিয়ে বালির তৈরী শিবের চারপাশে ঘোরে এবং ফুল, বেলপাতা সহ পুকুরে বিসর্জন দিয়ে কিছু ভক্ত্যা যাদের জন্য চৌদোলা বানানো হয়েছে তারা পা উপরে ঝুলিয়ে পুকুর থেকে শিবথানে আসে।

গ্রামের লোক এই চৌদোলাগুলিকে বহন করে নিয়ে আসে। পাটভক্ত্যা পাটের উপর শুয়ে থাকে এবং প্রধান পুরোহিত তার বুকের উপর শুয়ে থাকেন এইভাবে পাটভক্ত্যা শিবথানে সকলের প্রথমে থাকেন। এরপর নীলভক্তা যিনি চৌদোলার উপরে টাঙ্গি হাতে তরোয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। বাকি সমস্ত ভক্ত্যা পড়ে আসে অর্থাৎ দন্ডবৎ করে লম্বাভাবে পড়ে আসেন। এই দিনটিকে বলা হয় পাট আসা।

পাট আসার আগের দিন সকাল থেকে সমস্ত ভক্ত বাড়ি বাড়ি গেয়ে প্রত্যেকের কাঁঠাল থেকে একটি করে কাঁঠাল টাঙ্গি দিয়ে কেটে আনে। এই কাঁঠাল দিয়ে রান্না করে শিবকে প্রসাদ নৈবিদ্য নিবেদন করে এবং পরে সকলেই এই কাঁঠালের তরকারী খেয়ে রাত্রির প্রথম প্রহরে একটা পান ও একটি সুপারী দিয়ে শ্মশানে যায় এবং নেমন্ত্রন করে আসে এবং ঢাক বাদ্য সহকারে সকলে গিয়ে মড়া কাঠ সংগ্রহ করে এনে আগুন করে এবং সকালে স্নান করে প্রত্যেক ভক্ত্যা মিলে আগুন নেভায়। এবং সতিভক্ত্যা এক টুকরো আগুনের অঙ্গার মুখে নেয়। এটা সতীর দেহত্যাগের পর দক্ষযজ্ঞ বিনষ্টের স্মৃতিকে বহন করে। এই অনুষ্ঠানের নাম আগুন সন্ন্যাস বলে পরিচিত। পাট আসার সময় গ্রামের অনেকেই শিব, শিবের চ্যালা নন্দী, ভিঙ্গি, ষাড়, ভূত-প্রেত সেজে নৃত্য করে। আবার সাঁওতাল ছেলেরা (যুবকরা) ধামসা, নাগড়া, মাদোল সহকারে শিবথানে ভুয়াং নাচ করে। দুলে-বাউরি, ডোম প্রভৃতি নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মোটা সুঁচ ও লাল সুতোতে হাতে পেটে বুকে, গালে এফোড় ওফোড় করে একসাথে নৃত্যগীত করে থাকে। ভক্ত্যারা যখন মাথা নীচে, পা উপরে করে ঝুলতে থাকে তখন সমস্বরে গান ধরে —

> গম্ভীরের ভোলানাথ মুনি মহাদেব,
>
> গয়ায় গদাধর, কাশীতে বিশ্বনাথ, উড়িষ্যায় জগন্নাথ, বুধপুরে
>
> বুধেশ্বর, শ্বেতবন্দর রামেশ্বর, গোয়ালবাড়ি সাদশিবের চরণে সেবা লাগে
>
> মহাদেব।

শিব মহাদেব

গাজনের মঙ্গল হোক

দেশের মঙ্গল হোক

সেবা করলে সেবা লাগে

হর-পার্বতীর সেবা লাগে

শিব-শম্ভু; ভোলা মহেশ্বর

শিব মহাদেব।

বাজনাদার ও ভক্ত্যারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি যায় এবং বাড়ির লোক বা গৃহকর্ত্রী প্রয়োজনীয় চাল ও পয়সা দেয়। এসময় পূজক ঠাকুর বাড়ির প্রতিটি লোকের গান করে—

অমুকের জয় হোক

শরীর নির্ব্যাধি হোক,

শত্রু ক্ষয় হোক

ধনধান্যে উন্নতি হোক

পুত্রলাভ হোক

বিদ্যালাভ হোক।

এই সময় অন্যান্য ভক্ত্যারা জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক বলে। এই সময় বাড়ির মালিক নতুন ভাঁড়ে করে কিছু চাল দিয়ে থাকেন যা ভক্ত্যারা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে।

গাজনের শেষদিনে কাছিপুড়া অনুষ্ঠানের আগে নানা রকম প্রশ্ন করা হয়। যেমন — ও গাজন সন্ন্যাসী ভাই বল দেখি আমার প্রশ্নের উত্তরটি কী?

১. নাড়া মাথা হাটুমটুম গায়ে উড়ে খড়ি

মা বাপ থাকিতে তদের গলায় কেন দড়ি

কুথার থেকে আস্যে ছু তরা কুথায় তদের ধাম।

মধ্য পথে থাকে যদি অসুর দাণ্ডায়ে

কন পথে যাবি তরা কইয়ে দিস মোরে
তারপর যাইতে পারি শিব পূজিবারে।

২. ঢাকি ভাইয়া ঢাক বাজাও ঘন নাড় মাথা,
কে তদের ঢাক দিল কে দিল ছাইয়ে
ইয়ার বিতান্ত, কথা কইয়ে জাও মোরে
তারপর যাইবে তুমরা কৈলাস আগারে।। (বৃতান্ত - বিত্তান্ত)

সন্ধ্যার সময় আদিবাসী গোষ্ঠীর মুন্ডারা বা সাঁওতালরা এক লম্বা শাল গাছকে পুকুরে ডুবিয়ে রাখে এবং খুটিটি সোজাভাবে পুঁতে রাখে যা ভক্ত্যারা এর চারপাশে ঘোরে। মুন্ডা, সাঁওতালরা ঐদিনে প্রচুর পরিমাণে হাঁড়িয়া, মদ খায় আবার গাঁজা ও সিদ্ধি অনেকে খায়। কেন না গাঁজা ও সিদ্ধি শিবের অত্যন্ত আদরের। মুন্ডাদের কেউ কেউ জিভের মাঝ দিয়ে লোহার কাঁটা বিঁধে দেয় একে জিভ ফোঁড়া বলে। অতিরিক্ত মদ্যপ অবস্থায় থাকার জন্য তখন তারা কোনো ব্যথা অনুভব করে না।

পরির দিন ভক্ত্যারা স্নান করার জন্য পুকুরে যায় এবং পুকুরে পুরোহিত তাদের গলার উতরি খুলে দেয়। স্নান করে সকলে মিলে মন্দিরে আসে ও জয়ধ্বনি দিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে। বাড়ি ফিরে গিয়ে সকলে আনন্দ করে। ঐদিন দুপুরবেলায় সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজন করানো হয়, কিন্তু কোনভাবেই তারা দিনের বেলায় ঘুমোতে পারবে না কারণ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী শিব তাদের ভক্ত্যাদের গা টিপে দেয়।

এই গাজনের মেলায় নানা মানুষের সমাগম ঘটে। আত্মীয়রা সকলেই আসে এবং নতুন করে আত্মীয়তার সূচনা ঘটে। কেউ কেউ আবার 'ধরম কুটুম' বা সাঙাত বা সই পাতায়। গ্রামে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ আসে। আদিবাসী গোষ্ঠী সবাই মিলেমিশে মেলার আনন্দ নেয় এবং আত্মীয়তার সূচনা করে। (সংগ্রহ - সুখাডালী, বাঁকুড়া)

টুসু ঃ

পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রে টুসু উৎসব পালন করা হয়। অঘ্রান মাসের সংক্রান্তিতে টুসুর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমস্ত পৌষমাস জুড়ে টুসুর সান্ধ্যকালীন বন্দনাগীতি গাওয়া হয়। যার নাম টুসুগান। সেই সময় আমন ধান কেটে ঘরে তোলার সময়। সমস্ত দিন মাঠে খেটে কৃষিজীবী নরনারীরা দিনের শেষে টুসুগান গায়। ফলে তাদের জীবনে নিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ। কর্মধারায় আনে ছন্দ ও গতি। তাই ফসল কাটা ও ঘরে তোলার উৎসব হল টুসুগান। 'তুষ' শব্দটির সঙ্গে আদরার্থে 'উ' প্রত্যয় যোগ করায় 'তুষু' নামটি হয়েছে। 'তুষ' এর সঙ্গে 'লা' প্রত্যয় যোগ করে 'তুষলা' কথার সৃষ্টি। তুষলার উ ধ্বনি বিজ্ঞানের নিয়মে গুণ হয়ে তোষলা হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রীতিমাখা উচ্চারণে তুষু হয়েছে তুষলি। ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে 'তুষু'র চেয়ে 'টুসু' নামের চল বেশি। বাঁকুড়ার কিছু গ্রামে 'তুষু'র উচ্চারণ আছে ঠিকই কিন্তু বাঁকুড়ার দক্ষিণাংশ, পশ্চিম মেদনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় 'টুসু' উচ্চারিত হয়। তুষু > টুসু — দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হওয়া নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। "ভাষাতত্ত্বের আইনে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হওয়ার নজির আছে। ম্.ব.ষ ⟶ দ.ব.স এই আইন অনুসারে তুষু নিশ্চয়ই টুসু হতে পারে। অন্তত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নেই"।[২] 'টুসু' নামকরণের পিছনে কোন (Autro Asiatic) গোষ্ঠীর 'টুসা' (টুসাউ) শব্দটির প্রভাব থাকতে পারে। কোল ভাষায় এর অর্থ হল — ফুলের গুচ্ছ। আদিবাসী জীবনে টুসু শব্দের অর্থ 'পুতুল'। রাঁচী, রামগড়, পলামু, সিংভূম প্রভৃতি জায়গায় পুতুল করে টুসু পূজার আয়োজন করে।

টুসু কৃষিলক্ষ্মী, তুষুর ভেলায় ধানের তুষ রাখা হয়। ভেলার মধ্যেখানে এবং চারপাশে মাটির তৈরী তুষুর 'আলোখলা' জ্বেলে ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আলোখলায় অনেকগুলি প্রদীপ বৃত্তাকারে সাজানো থাকে। বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার সুখাডালী গ্রামের কুমোরেরা এইরকম আলোখলা বানায়। বৃত্তের চারপাশে চৌদ্দটি এবং মাঝে একটি দীপাধার থাকে। সাধারণত কুমারী মেয়েরা এই পূজো করে থাকে।

টুসু ব্রতকারিণী কুমারী মেয়েরা মানস শুদ্ধির সঙ্গে ধানের তুষ দিয়ে অগ্রাণমাসের সংক্রান্তিতে টুসুর 'আলোখলা' পাতে। কোনো কোনো জায়গায় ইতু পূজার জল ও ফুল দিয়ে টুসু পাতে। টুসুলি খলায় থাকে এঁড়ে বাছুরের পাঁচটি বা সাততি কিম্বা নয়টি বিজোড় সংখ্যার ছোট ছোট গুলি, দূর্বঘাস, ঘিচিকড়ি, আলো চাল, সর্ষে-মুলো ফুল, গাঁদা-আকন্দের ফুল, সিঁদুর। টুসুখলা ঘরের কলঙ্গা বা তুলসীথানে পাতা হয়। সেই স্থানটিতে খনিমাটির আলপনা দেওয়া হয়। আলপনার লক্ষ্মীর পা, ধানের মরাই, লতানো ছাপ এঁকে অলংকরণ করা হয়। নৈবেদ্য হিসাবে থাকে ঘরে ভাজা খই, মুড়কি, চিঁড়া, গুড়, নারকেল নাড়ু, ঝিলিপি ও বিভিন্ন মিষ্টান্ন। বন্দনা শেষে ব্রতকারিণীরা তা সকলে মিলে ভাগ করে খায়।

টুসুব্রতের পূজার কোন মন্ত্র নেই, নেই পুরোহিতও। ব্রতকারিণীরাই সর্বেসর্বা। অঘ্রাণ সংক্রান্তির রাত থেকে টুসুব্রতের সূচনা। সারা পৌষমাস ধরে চলে আরাধনা। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মেয়েরা নিজের টুসুখলা নিয়ে সমবেত হয় গ্রামেরই কোনো সাধারণ মন্ডপে, তারপর সমবেতভাবে শুরু হয় টুসুর আরাধনা, বন্দনা ও সঙ্গীতের অনুশীলন। আর তার মাঝেই প্রতিফলিত হয় তাদের কামনা-বাসনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার প্রতিফলন। এবং এইভাবেই পুরো মাস চলতে থাকে। অবশেষে পৌষমাসের সংক্রান্তির সমস্ত রাত্রি গান গেয়ে রাত্রি জাগরণ করে ও সকালে সকলে সমবেতভাবে টুসু বিসর্জনের জন্য ঘাটে যায়। বাঁকুড়ার পোরকুলে, মেজিয়ায়, পুরুলিয়ার কাঁসাই ব্রিজের নিচে প্রভৃতি জায়গায় মেলা বসে।

বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদনীপুর জেলায় টুসু কৃষিভিত্তিক আবার যতই পশ্চিমে অর্থাৎ পুরুলিয়া সংলগ্ন ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছড়িয়েছে ততই কামমদির বিহুলতা ও যৌবনের ভাবাবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা আদিবাসী অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল হিসাবেই ধরা যায়। আবাহনের গান হিসাবে তখন ব্রতকারিণীরা গাইতে থাকে —

উঠ উঠ উঠ টুসু তুমায় উঠ্ কারই্তে আইসেছি
আমরা যে সব সঙ্গীসাথী তুমার পূজায় বইসেছি।
চাঁদকে যেমন তরায় ঘেরে, তেমনি ঘেরন ঘেইরেছি

চাইরদিগেতে পদীমশিখা, মাঝে তুমায় রাইখেছি।

আহা কি রূপের বাহার কেউ ত কভু দেখি নাই

হলুদ বরণ রাঙা চরণ এমন রূপে জুড়ি নাই।

আবাহনের পর গীত হয় টুসুর রূপ বর্ণনা, গানগুলির মধ্যে সমাজের সর্বস্তর পরিলক্ষিত হয় —

আদাড়ে বাদাড়ে পদ্ম

পদ্ম বই আর ফুটে না।

আমাদের টুসুর পায়ে পদ্দ

ভ্রমর বই আর বসে না।।

শুধু বন্দনা গানই নয়, কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-অভিমান প্রভৃতি নারীসুলভ মনোভাবেরও প্রকাশ ঘটে টুসু গানে। শীতার্ত রাত্রির নিঝুম নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার মেয়েদের কলহমুখর গানের চাপানুতরে। তবে এ দৃশ্য ধীরে ধীরে কম হয়ে যাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজেও নারী শিক্ষার বেশ অগ্রগতি ঘটেছে।

টুসুগানে বাৎসল্য ভাবনা ঃ

টুসু কখনো দেবী, কখনো মানবী, কখনো স্নেহময়ী জননী, কখনো বা স্নেহের দুলালী। আবার কখানো সহচরী সঙ্গিনী। তার রূপের তুলনা নেই

আমার টুসু দাঁড়ায়ে আছে

কচি আমের ডাল ধর‍্যে

সারা গায়ে ঘাম ঝরিছে

যেমন বিন্দু বিন্দু মুক্তারে।

চালচলনের টুসু অনবদ্য —

এক সড়পে দু সড়পে তিন সড়পে লোক চলে

আমার টুসুর এমনি চলন, বিন বাতাসে গা লড়ে

টুসু বড়ো দুরন্ত তার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই —

উপর কুলহি যাইতন না টুসু
নামহ কুলহিতে যাই-অ না
উ - কুলহিতে কুটনি আছে
পান দিলে পান খাই-অ না।

টুসু বড়োই দুরন্ত মায়ের বাধা নিষেধও মানে না। যখনি সুযোগ পায় তখনই লোকের গাছে উঠে পড়ে —

কদম গাছে চইড়লে কচি কদম পাইড় না,
পাইকলে কদম সবাই খাবেক কেউত বারণ কইরব না।

বালিকা টুসু কিশোরী হয়। যৌবনবতী মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ভালো ঘরে ভালো বরে। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মাঝখানে আটকে পড়ে। সমস্ত আয়োজন করতে বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। বিয়ের পর শ্বাশুড়ি-ননদীর গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অত্যাচর সমস্ত কিছু মুখ বুঝে মেনে নিতে হয়। তার উপর সংসারেতো নিত্য অভাব-অনটন লেগেই থাকে। কখনো স্বামীর রোজগার নেই, মদ্যাসক্ত আবার কখনো বহুপত্নীক হয়ে থাকে।

দুই বেলা যে খেতে না পাই
কারও কাছে বলিনা
ভাতের জোগাড় না কইরে হে
বিহা করা চলে না।
আগে তুমি বলেছিলে
অভাব কিছু হবে না
এতদিনে হে
দাঁড়াবার নাই আস্তানা।

বাংলার পশ্চিমরাঢ় বলে পরিচিত যা ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চল। ঐ অঞ্চলে আজও বাউরি, জেতোড়, মাহাত, ভূমিজ, বাগাল প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর পুরুষেরা একাধিক পত্নী

গ্রহণ করে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই দুই সতীনের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা-কোন্দল, ঝগড়া-বিদ্বেষ লেগেই থাকে। বিশ্বাস করে না কেউ কাউকে, মরণ কামনা করে একে অন্যের।

এক গাড়ি কাঠ দুগাড়ি কাঠ
কাঠে আগুন লাগাব
যখন আগুন হুদহুদাবে
সতীনটাকে ঠেলে দিব।

প্রেম বিষয়ক ঃ

টুসুগানে প্রেম নিবেদন খোলাভাষায় মিলন বিরহের সুখ ও দুঃখানুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। টুসুগানে এই প্রেমের প্রকাশ কখনো স্থূল রঙ্গ-রসিকতায়, আবার কখনো ইঙ্গিতময়তায় —

গাঁথবো মালা — পাইনি খুঁজে ডোর।
বৃথা কাটলো রে যৌবন মোর।।
ফাগুনের পেয়ে সাড়া ফুল ফুটিল থরে থর।
এলোনা ভ্রমারা বঁধূ এলো না মোর চিতচোর।।
ঢল ঢল মধু ভরা আমার এ মিষ্টি অধর।
পবন ভরে পড়ছে ঝরে মধু সদা ঝর ঝর।।
যৌবনের কুঞ্জ বনে হলো না নিশিভোর।
মিষ্ট স্বরে নিত্য বলে ঐ যে পিক কুহরে।। (নিত্যানন্দ মাহাত, আড়ষা, পুরুলিয়া)

আবার —

চপল ভ্রমর কাজল আঁখি।
কারে খুঁজছে হে থাকি থাকি।।
মনলোভা যৌবন মোর, ফুটে আছি একাকী।

গুঞ্জরিয়া এসো কাছে দেখছো কি উঁকি মারি।।

এসো হে মধুভান্ডার দেখ না একবার চাখি।

মিষ্টি মাদ্যা নীরব ভাষায় তাই্তে তোমায় ডাকি।।

খেলে এমন মিষ্টি মধু ভুলবে পরান পাখি।

নিত্য বলে ঢুলু ঢুলু নেশাতে হবে আঁখি। (নিত্যানন্দ মাহাত, আড়ষা, পুরুলিয়া)

টুসুগানে বৈষ্ণব চেতনা ঃ

বৈষ্ণবীয় ভাবতরঙ্গ বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার ঝুমুরগানেই শুধুমাত্র নয়, টুসুগানেও ঢেউ জাগিয়েছে। তাই রঙের টুসুগানে পাই —

কাল ভ্রমর পিরীত জানে না।

রাধার কুঞ্জে যাইতে দিব না।।

যাও ফিরে যাও কালসনা।

রাধার কুঞ্জে যাইতে দিবই না।।

ঝাড়খন্ডী মানুষেরা কৃষ্ণকথা অবলম্বনে প্রচুর গান বেঁধেছে। তবে রাধাকৃষ্ণ তাদের দৃষ্টিতে দৈবী দেব-দেবী নন। একেবারে মাটির। পৃথিবীর স্থূল কামনা বাসনাসর্বস্ব প্রেমিক-প্রেমিকা। তাই তাদের প্রেমও বৈধ নয় —

বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে।

ভাঙে না চুরে না বাঁশী ফেইলে দিক মা নিরলে।।

কৃষ্ণের বাঁশী দিবানিশি শুনি মাগো কানেতে।

বাঁশী শুনে হয় না শান্তি হয় না গো জীবনেতে।।

যখন কৃষ্ণ বাজায় বাঁশী, তখন আমি কাঁদি হাসি।

বাঁশী শুনে হয় গো মনে আমি হই কৃষ্ণের দাসী।।

ব্রজপুরে ব্রজগোপী কৃষ্ণ নামে হয় সুখী।

ওই কৃষ্ণের থাকে নাকি থাকে গো অষ্টগোপী।।
নিধুবনে কৃষ্ণ সখা বাজায় গো মোহন বাঁশী।
বাঁশীর স্বরে যত দাসী আসে গো হাসি হাসি।।

টুসুগানে রামকথা ঃ

টুসুগানে রাম-সীতার আখ্যান এসেছে বার বার। রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, বীর্যবত্তা, পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম-সীতা লক্ষ্মণসহ্ বন গমনের দৃশ্য আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অনবদ্য টুসুসঙ্গীত রচনা করেছে —

রাম ধইরেছেন হরধনু
কাঁধে ঝুলে গান্ডীবান।
হরধণু ভাইঙে দিলেক
জনক করেন সীতাদান।।

রাজা দশরথ —— কৈকেয়ীর প্রতি আক্ষেপ, বীর হনুমানের সাগর পাড়ি এমন কি লক্ষ্মণের পরাক্রমও টুসুগানে ধরা পড়ে —

সমুদ্র পেরাইল হনু,
শ্বেত মাছিটির বেশ ধইরে।
রামের হাতের অঙ্গুরিটি
পইড়্‌ল সীতার আঁচলে।।

রাবণ বধের পর —

এক লক্ষ ব্যাটা রাবণের
সুয়া লক্ষ নাতি।
একটিও রাম রাইখে দেই নাই
বংশে দিতে বাতি।।

টুসুগানে বিজয়ার সুর ঃ

মকর সংক্রান্তির ভোর। টুসু করা কিশোরীরা টুসু খলা নিয়ে টুসুগান গাইতে গাইতে নিকটবর্তী নদী বা জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যায়। সবাই সমবেতভাবে গাইতে থাকে —

জল জল যে কর টুসু
জলে তুমার কে আছে।
মনেতে ভাবিয়া দেখ
জলে শ্বশুর ঘর আছে।

তবু, টুসু করা মেয়েরা সকলেই বলে —

মনের এই বেদনা।
টুসুধনকে জলে দেব না।।

আবার পুনরাগমণের জন্য আকুল আবেদনও টুসুগানে বিধৃত হয় —

তুমি টুসু জলে যাছ
কবে দেখা পাব গো।
জলে গেলে কারে মা গো
মা বইলে ডাকিব গো।।
সুখে চলি যাও গো টুসু
সুখে চলি যাও গো —
আইসেচে বছর এমনি দিনে
আরঅ যেন আইস গো।।

এ প্রসঙ্গে শান্তি সিং-এর কথাটি উল্লেখ করা যায় — ‘টুসু উৎসবের ব্যাপ্তি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদনীপুর, হুগলীর কিছু অংশ, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের ধানবাদ সাঁওতাল পরগণা রাঁচি

হাজারিবাগ, সিংভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই ব্যাপ্তি সত্ত্বেও টুসুর ক্রম বিস্তারিত তরঙ্গের উৎসভূমি সম্পর্কে আমাদের এ যাবৎ সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। অথচ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা যুক্ত হলে টুসুগানের উৎসভূমি প্রসঙ্গে প্রাচীন বাঁকুড়ার নাম অনিবার্যভাবে আসে। প্রতিটি দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে সেই দেশের মাটি ও মানুষের বিশেষত কৃষিভাবনার গভীর যোগ থাকে। দেশজ ও লৌকিক ভাবনাগত কামনা-বাসনা, অনুরাগ-বিরাগ, সুখ-দুঃখ শুধুমাত্র এ নারীর প্রাণে নয়, গানেও জাগে। তাই রুক্ষ রাঢ়ভূমি এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলেও সোনালি ধান ঘরে তোলার সময় লোক উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়। সেই অনুভবের একটি অঙ্গ হল টুসু পরব''।[৩]

চাউড়ি, বাউড়ি, মকর, এখাইন, ঘেগাইন — এই পাঁচদিনে ঝাড়খন্ড অঞ্চল আনন্দে মুখরিত থাকে পৌষমাসের সংক্রান্তি মকর। পয়লা মাঘ এখাইন, দোসরা মাঘ ঘেগাইন। পৌষমাসের সংক্রান্তির দুদিন আগের দিনটিকে চাউড়ি বলে। ঐদিন গ্রামের সকলে বাড়িতে গুঁড়ি কুটার অনুষ্ঠান পালিত হয়। অর্থাৎ নতুন ধানের চালের গুঁড়ি ঢেঁকিতে কোটা হয়। গুড়ি কুটার সময় কিছু নিয়ম মানতে হয়, তা হল ঢেঁকি থেকে পা নামানো চলে না যতক্ষণ না গুঁড়ি কুটা শেষ হয়। এবং গুঁড়ি কুটার পর কিছু মুলখা অবশিষ্ট থাকে যা হাড়ড়ি বাঁধার কাজে লাগে। গুঁড়িকে বেল কাঁটা সহকারে শুদ্ধভাবে রাখা হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় চাউড়ি। বাঁড়ড়ি দিনটিও খুব উৎসব মুখর ঐদিন সকাল থেকেই চলে লক্ষ্মীর আরাধনা। বাড়ির মহিলারা সকাল সকাল স্নান করে অন্নভোগ রান্না করেন এবং তের রকমের তরকারি সহ লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। সকাল থেকেই পিঠে বানানো হয়। পিঠের মধ্যে নয় রকমের 'পুর' দিয়ে গড়গড়্যা পিঠে বানায় ও রাত্রের সময় সেই পিঠেতে বাঘরায়ার পূজো হয়। এটি সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজো শেষ হলে গ্রামের বাগাল সেই প্রসাদী পিঠেগুলো নিয়ে যায়। এবং বাড়িতে ধান গাছের (শিষ সহ) বাউড়ী (বেড়) বানিয়ে পিঠে, মুড়ি, ভাতের হাঁড়ি, গোয়াল, খড়ের পালই, ঘরের মধুন, ধানের গোলা প্রভৃতিতে একটি করে বাউড়ি রাখা হয়। বাউড়ি বাঁধার পর আর কেউ এগুলোকে ছুঁতে পারবে না। পরের দিন ভোরবেলা মকর সংক্রান্তির দিন

স্নান করে মকর জল নিয়ে আসতে হয় এবং সেই জল ছিটিয়ে বাউড়িগুলো তুলসি থানে জড়ো করে পুকুরে বিসর্জন করে। এবং সকলে পিঠে, মুড়ি খেয়ে আনন্দের সঙ্গে দিনটি কাটায়। ঐদিন বাড়ির সকলেই নতুন বস্ত্র পরিধান করে।

"পয়লা মাঘ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলায় এখয়ান বা এখাইন যাত্রার দিন। অক্ষপথে সূর্যের গতি নিরুপক 'অক্ষ অয়ন' কথা থেকে 'এখান' শব্দের উৎপত্তি"[৪] এই দিনটি অত্যন্ত শুভদিন বলে বিবেচিত হয়। এই দিনটিকে স্থানীয় ভাষায় 'হালপুণ্যা'র দিন বলে থাকে। কারণ বাঁধনা পরবের সময় চাষের হাল-জুয়াল চালাঘরের আড়াইচে রাখা হয়। তখন কৃষিকর্মের বিরতি। লাঙলের কাজ হয় না। তাই কৃষিকর্মের সূচনাপর্বে পয়লা মাঘ আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত একবার মাঠে লাঙল নামানো হয়। এই দিনটিকে 'হালপুণ্যা'ও বলা হয়ে থাকে।

এখয়ান এর দিনে আদিবাসীদের প্রিয় অনুষ্ঠান 'ভেজা-বিঁধা' অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রান্তে খোলা মাঠে যুবকেরা হাতে তীর-ধনুক নিয়ে সমবেত হয়। পাশাপাশি গ্রামের যুবকরাও এতে অংশ নেয়। মাঠের মাঝে 'ভেজা' অর্থাৎ একটি 'কলামচা' (বাকল ছাড়ানো) কলাগাছের কান্ডকে গেড়ে রেখে দেওয়া হয় এবং দেড়শো থেকে দুশো গজ দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে হয়। প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে তীর নিক্ষেপ করেন মাঝি, গোড়েৎ মাছি এবং নায়কে। নায়কের আনুষ্ঠানিক তীর নিক্ষেপের পর প্রতিযোগীতা শুরু হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগী তিনবার তীর নিক্ষেপ করেন। প্রথম তীর বোঙ্গার নামে, দ্বিতীয় তীর পূর্বপুরুষের নামে এবং তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করা হয় পুরুষকারের নামে। প্রতিযোগীতায় যে কলাগাছটিতে বিঁধতে পারে তাকে বীরের সম্মান দেওয়া হয়। গ্রামের মোড়লের ছেলেকে (ছোটো) কাঁধে করে পুরো গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এবং পিছনে লাগড়া (নাগড়া) মাদল নিয়ে সকলেই আনন্দে চিৎকার করতে করতে চলে এবং সবশেষে মোড়লের বাড়িতে এসে হাজির হয়। মোড়ল একখানা ধুতি, একটি গামছা, চাল, পিঠে ও নগদ কিছু টাকা দিয়ে তারে সম্মানিত করে এবং সকলকে হাঁড়িয়া খাওয়ায়।

এখয়ান যাত্রার দিনে বহু ভূমিজ, সাঁওতাল, কোড়া, বাঁদর নাচের খেলা দেখায়। খড় ও কাপড় দিয়ে বানানো নকল বানর দর্শকদের মনোরঞ্জন করে এবং গ্রামের সকলের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সহ প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বাঁদর নাচায়। একহাতে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মাঝে মধ্যে খড়ের নকল বাঁদরটিকে চাবুক মারে ও অন্য হাতের বাঁদরটিকে দাড় দিয়ে নাচায় ও গান ধরে —

লাচ বাঁদরি লাচ, হেল্যে দুল্যে নাচ।
আম ধরে ঝকাঝকা তেতুল ধরে বাঁকা বাঁকা
লাচ বাঁদরি লাচ। (লাচ - নাচ, ঝকাঝকা - ঝোকাঝোকা)

রসু, পসু হাসু তাজিং
চিয়াম মেনয়া
জিলু হঁরেঞ্চ কাএঞা মাডি হঁরেঞ কাএঞা
বেঙ্গাড় জাগুরে দো মাড়িঞ জমেয়া।

বাঁদর নাচানোর শেষে বাড়ির কর্তা পিঠে, মুড়ি, চাল, টাকা দিয়ে বাঁদর নাচনদারকে খুশি করা হয়।

মকর সংক্রান্তি এবং এখয়ান যাত্রার দিন বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বহু গ্রামে মোরগ লড়াই এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। দুই পক্ষের দুইজন গ্রামীণ মানুষ নিজের নিজের মোরগ নিয়ে আসে ও পায়ে ধারালো ছুরি বেঁধে দেয়। তার আঞ্চলিক নাম 'কায়েত'। চতুর্দিকে উৎসুক জনতার মাঝে ছুরি বাঁধা মোরগ দুটিকে নামানো হয় ও লেজের পালকগুলিকে পিছন দিক থেকে একটু ঠেলে দেয়। ফলে যুগপৎ ছুরি বাঁধা পা তুলে, অতর্কিতে দুটি মোরগ একে অপরকে আক্রমণ করে। এ সময় মোরগের ঘাড়ের পালকগুলি খাড়া করে ঝুটি দুলিয়ে প্রতিপক্ষ মোরগটিকে ঘায়েল করতে চায় এবং উড়ে গিয়ে আক্রমণ করা দর্শকদের মনে রুদ্ধশ্বাস কৌতুকের জন্ম দেয়। যদি কোন মোরগ পালিয়ে যায় তাহলে তাকে হেরে গেছে বলে স্বীকার করে নিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে কোনো

একটি মোরগ লড়াই ক্ষেত্রে মারা যায়। আবার দুটি মোরগেই মারা গেলে যে মোরগটি পরে মারা যায় তাকেই বিজেতা হিসাবে ধরা হয়। বিজয়ী মোরগের মালিক পরাজিত মোরগের দাবিদার হয়। যিনি মোরগের পায়ে কায়েত বাঁধেন ও লড়াই পরিচালনা করেন সে পরাজিত মোরগটির একটি পায়ের ফড়্যার দাবিদার না হলে তাকে নায্য মূল্য দিতে হয়। এই মোরগ লড়াইয়ে অনেক দর্শক টাকার বাজি ধরে (জুয়া)।

পয়লা মাঘ থেকে পুরুলিয়ার বেড়োর গ্রামে খেলাই চন্ডীর বিরাট মেলা বসে। পুরুলিয়ার গোলামারা, নদীয়াড়া, সাঁতুড়ি ও কন্দোয়ানে খেলাইচন্ডীর মেলা বসে। হুড়মুড়ায় এখান যাত্রার দিনে বিরাট মেলা বসে।

নাচনি

বৈঠকী সঙ্গীতে বা গভীর বেদনার নাচ হল 'নাচনি নাচ'। নাচনি নৃত্য-গীতে পরিপাটি হবেন। নাচ ও গান দুটোই জানবে। এদের নাচ ও গান ঝুমুরের জনপ্রিয়তাকে নতুন মাত্রা দেয়। সাধারণত মঞ্চে নর্তকীর নাচে অন্যেরা গান গায়। আবার নাচনিকে গাইতেও হয় নাচতেও হয়। নর্তকীকে প্রসাধন পরিপাটি হতে হয়। এরা উগ্রসাধনে মোহিনীরূপ ধারন করে।

নর্তকীর চোখমুখ এবং তার অঙ্গভঙ্গিমা যাতে দর্শকেরা সহজেই বুঝতে পারে তারজন্য পরিপাটির অভাব থাকে না। চরিত্র এবং নাচের গুণে সব নর্তকীই মোহিনী। নাচনি নাচের ঝুমুর দেহবাসনায় মদির এবং রঙিন। রসিক গান শুরু করে। নাচনিরা গানের কলি ধরে নেয় রসিকের গলা থেকে অথবা অন্য গানও গাইতে পারে নাচনি। অতএব রসিক পরিচালকের ভূমিকায় থাকলেও নাচনি তার পরিচালনার বাইরে থেকেও রসিকের কাজে যুক্ত রাখে নিজেকে। তৃপ্তি বিশ্বাস নাচনি ও বাইজি সম্বন্ধে বলেছেন —

> "মধ্যযুগীয় সামন্ত্রতান্ত্রিক দৃষ্টিতে জমিদার শ্রেণির মানুষ
> প্রচুর পণ-সূত্রে পাওয়া তরুণীকে গৃহবধূ করেছে। আর

তার কামনাকুটিল লুব্ধ দৃষ্টিতে পণ্য হয়ছে বারবধূ।
জমিদারি কায়দায় এই মনোরঞ্জনী নারীকে বাইজি তখনই
বলা হয়, যখন নৃত্য-গীত পটিয়সী নারী হীনবর্ণ জাতা
নয়, পরন্তু শিক্ষাসহবতে অভিজাত মানসিকতা সম্পন্না।
আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণির গ্রাম্য যৌবনবতী অশিক্ষিত
পটুত্বে নৃত্যগীত পারদর্শিনী হলে তার নাম নাচনি।"[৫]

এককালে এক শ্রেণির মানুষ 'নাচনি রাখা' বা নাচনি পোষা এবং জনসমক্ষে বিভিন্ন যৌবনবতীর সরস ভঙ্গির নৃত্যমদির সংগীত ও সঙ্গসুধা পানকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন। নাচনিদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। কোন সন্তানাদি জন্মালে তাকে সমাজের অপাংক্তেয় হিসাবেই ধরা হতো। সাধারণত নাচনি নিচুজাতের গ্রাম্য যুবতী। যেমন খুশি সাজে, নাচে, গায়। সমাজে কোনো জায়গা নেই। যদি সন্তান-সন্ততি হয় তবে তারও দুর্গতির শেষ থাকে না। নাচনি রাখলে ধনী মানুষদের কদর বাড়তো। বর্তমানে নাচনি নাচের রেওয়াজ অনেকটাই কমে এসেছে, যদিও আছে তা শখে।

নাচনি নাচের মঞ্চটিকে বলা 'নাচনিশাল'। বাজনাদাররা একপাশে বসে বাজায়। হারমনিয়াম, ফ্লুট কর্ণেট, ডুগি-তবলা, মাদল, জুড়ি-নাগড়া, করতাল, ম্যারাকাস। ইংরেজি এল অক্ষরের মতো বাজনাদাররা বসে বা নাচনির মুখোমুখিও বসেন। পাঁচ-ছয়জন নাচনি হলে বসার জায়গা অদল-বদল করে নিতে হয়। একজন নাচনি প্রায় ঘন্টাখানেক নাচে। একজনের পর আরেকজন নাচে। এভাবেই চলতে থাকে। সময় থাকলে প্রথম নাচনি আবার নাচ দেখায়। মনে হয় দর্শক নয়, শ্রোতা নয় কেবল আনন্দের জন্যই এই নাচ-গান। নাচনি — রসিকের গানে স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমান, ঝগড়া-ঝাঁটি, আট অঙ্গের ব্যবহারে বাহারি হয়ে ওঠে। নাচনিনাচে অষ্টাঙ্গ সঞ্চালক বুঝতে নৃত্যবিদ হওয়ার দরকার নেই। অষ্টাঙ্গ মানে মাথা, ভুরু, চোখ, মুখ, বাহু, ছাতি, কোমর আর পা। অঙ্গের নানা ভঙ্গিমাই তো নাচ। কিন্তু এই ভঙ্গিমা অবশ্যই সুর তালে হতে হবে। বেসুরে বেতালা

অঙ্গভঙ্গিমাকে নাচ বলা যায় না। তা দর্শক গ্রামীণ হোন বা নাগরিকই হোন না কেন। দেবতা-গুরু, বাদ্যযন্ত্রকে প্রণাম করার নাচনিদের ভঙ্গিকে 'স্তুতি' বলা হয়। মাটিতে পায়ের আঘাতে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ঘুঙুরের বোলকে 'তৎকার' বলা হয়। নাচতে নাচতে নাচনিরা হঠাৎ করে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া একটা বৈশিষ্ট্য। শ্রোতাদের বাছাই করে হাতে হাতে টাকা নেওয়া ও তাদের নাম ধরে গানের মাধ্যমে সাধুবাদ দেওয়া যেটাকে 'ফেরি' বলা হয়।

কথক নাচের ভঙ্গিকে বলা হয় 'কসক-মসক', কব্জির ভঙ্গিকে বলে কসক ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ছাতি নাড়ানোকে বলে 'মসক'। এর সঙ্গে চোখ, ঠোঁট, দাঁত, ভুরুর খেলা দর্শকদের কাত করার জন্য ব্যবহার করে।

আসরে সাধারণতঃ দর্শকদের পছন্দের উপরেই নির্ভর করে নাচনির নাচ। গানটি যত রসালো হবে ততই দর্শকরা অনেক বেশি স্বাছন্দ্যবোধ করেন। দর্শকদের চাহিদার জোগান দিতে না পারলে নাচনিদের চাহিদাও কম যাবে।

ঝুমুরের সঙ্গে নাচনির যোগ নিবিড়। বিশেষত ঠাঁড় ঝুমুরে নাচনি নাচের জনপ্রিয়তা একটুকু বেশি। যখন দর্শকদের চিৎকার চেঁচামেচি বাড়ে তখনই নাচনি গান ধরে —

ঝিমিক ঝিমিক জলে
চিটা মাটি গলে
আমি ছলকে গেলি গো
আমি পিছলে গেলি গো
তকে ভাইলে ভাইলে।
ছলক ছলক চাল্যে
আইড়ে আইড়ে ভাইলে
নয়ন বাণে গো বিন্ধিছে হিয়ায়
পাগল হলি গো ও তোর মাথা বান্ধাটায়

কৃত্তিবা বলে, আমি সকল গেলি ভুইলে

বল গো ইশারায় কী হবে উপায়

টাইন্যে নিল গো ও তোর মুচকি হাসিটায়।

কৃত্তিবাস কর্মকার এই গানটির রচয়িতা। ঝিমিক ঝিমিক জলে গানটি ভাদরিয়া ঝুমুরের শ্রেণিতে পড়ে। এই গানের একটি ভেতরের মানে আছে। যে যেভাবে গানটির মজা নিতে পারে। এই গানে কবি মানুষের কথা বলেছেন। অল্প বয়সীরা এটিকে নিছক প্রেমের গান হিসেবে গাইতে পারে। বৃষ্টিতে মাটি পিছল হয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকাকে দেখতে দেখতে হৃদয় উথলে উঠছে। পিছলে পড়ে যাচ্ছে প্রেমিক। প্রেমিকের হাঁটাচলায় তার আড়ে আড়ে তাকানোয় মন কেমন করছে। মাথার খোঁপা বাঁধা দেখে পাগল হয়ে উঠেছে প্রেমিকের মন। কি যে করবে! প্রেমিকার মুচকি হাসি তার মনকে টেনে ধরছে। আবার বয়স্কদের কাছে গানটির অন্য অর্থ। সময়ের সাথে সাথে শরীরের তেজও কমতে থাকে। রমণীর সৌন্দর্য তাকে সংসার থেকে সরিয়ে নেয়। সে ভুলে যায় যে জীবন অনিত্য।

সাঁওতাল ও মুন্ডা জনগোষ্ঠী মূলত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। কুড়মিরা কোলরিয়ান, ঝাড়খন্ডের কুড়মিরা মূলবাসী অ্যাবোরিজিনিয়াল। এই সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে —

কোল, কুড়মি, কোড়া,

বেদ-শাস্ত্র ছাড়া। (কবিকঙ্কন—গোব্রাহ্মণ হিংসক রাঢ়,

চৌদিকে পশুর হাড়)

এই অস্ট্রিকগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া, শবর তথা আরো অসংখ্য মূলবাসী ইন্ডিজেন্স গোষ্ঠীর মেয়েরা চিরকালই অত্যন্ত আমুদে, পরিহাসপ্রিয়, হাসিখুশি ও স্পষ্টবাদী। এই নারীদের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ পায় এই অঞ্চলের নিজস্ব লোকসঙ্গীত ঝুমুরের মাধ্যমে। ঝুমুর গাইতে পারে এমন পুরুষকেই এই অঞ্চলের নারীরা বেশি পছন্দ করে। এই অঞ্চলের নারীরা খুবই গোষ্ঠীসচেতন। গোষ্ঠী ছাড়লে সে সমাজে স্থান পায় না। এই অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর অন্য সংস্কৃতির ভূমিকাও স্বীকার করা যায় না।

নাচনি প্রথার মূলে রয়েছে তিনটি ধারা। নারীদের দারিদ্র্য আর অসহায়তা, ক্ষমতাশালী পুরুষদের লালসা এবং তৃতীয়টি ধর্মাচরণের মোড়কে ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ মাহাতোর মতটি উল্লেখযোগ্য —

> "ঝুমুর হল বিরহগীত আর নাচনির নাচ হল ঝুমুর নাচ। রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা পরিবেশন করেন নাচনি আর রসিক। নাচ আরম্ভ হওয়ার আগে রসিক ঝুমুর বলবেন। নাচনি সেই গান ধরবেন। বাজনাদারেরা বাজনা বাজাবেন। নাচনি-রসিকের এই যুগলনাচ একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে। নাচনি মানে নর্তকী। রসিক বলতে কৃষ্ণকে বোঝায়। এক্ষেত্রে নাচগানের দক্ষ ব্যক্তিকেই রসিক বলব। নাচনি নাচ যুগলমিলনের নাচ।"[৬]

রসিকের পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, খালি গা, গলায় ফুলের মালা। মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁশি পায়ে নুপূর। নাচনি পরেন রঙিন চোস্ত পাজামা, ঘাঘরা আর জ্যাকেট। চুলের খোঁপায় জড়ানো থাকে মালা, নাকে নথ, কানে কানপাশা, হাতে ধরা থাকে একটি রুমাল। সেটি নাচের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে। নাচনি নাচ যেমন ঝুমুরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নাচনি নাচকেও সজীব রেখেছে এই অঞ্চলের বিবাহোৎসব। বরযাত্রায় ঢাক-ঢোল-ধামসা বাজিয়ে নাচনি নাচ বরকর্তার সম্মান বাড়ায়। নাচনিদের সংখ্যা যত বেশি হবে বরকর্তার সম্মানও ততো বেশি হবে।

এ প্রসঙ্গে তরুণদেব ভট্টাচার্য বলেছেন —

> "নাচনি নাচের প্রাণস্পন্দন ঝুমুর। নৃত্যকর্মটি নিয়ন্ত্রিত হয় ঝুমুরের রস, ভাব ও বিষয় অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে ঝুমুরই নৃত্যের আত্মা, নৃত্য অবয়ব, নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় আটটি অঙ্গ, মাথা, ভুরু, চোখ, মুখ, বাহু,

ছাতি, কোমর ও পা। সুস্পষ্টভাবে মুদ্রার ব্যবহার নেই নৃত্যে। হস্তক, বিভিন্ন গতি, চারী, ভ্রমরী প্রভৃতি ঠাটের লক্ষণ আছে। লোকনৃত্য থেকে ক্লাসিকাল নৃত্যে উন্নীত হবার প্রবণতা ছিল নৃত্যটিতে। আসর বন্দনা করে শুরু হয় নাচ। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি থাকে আসরে। চতুর্বিধ কলা বিন্যাস হয় নৃত্যে যে গানগুলি গাওয়া হয় তাতে থাকে পয়ার, রঙ ও গীত। শৃঙ্গার মুখ্যরস, প্রেম ও ভক্তি প্রধান ভাব, বিষয় রাধাকৃষ্ণলীলা। আসর হয় গোলাকার বেদীতে। উচ্চতা সাধারণত তিন ফুট, আসরের ব্যাস হয় পনেরো থেকে পঁশিচ ফুট। বাজনা নানারকম, নাগড়া, ঢোল, মাদল, সায়না বা সানাই, শিঙ্গা, কেড়কেড়ি, কারহা প্রভৃতি। রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঈজি নাচের যে ধারা আঠারো ও উনিশ শতকে ভারতের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাচনি নাচ এ অঞ্চলে তারই ক্ষয়িষ্ণু রূপ। বৈভবহীন রাজা ও বিত্তহীন জমিদারেরা নাচনিদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছিলেন। জমিদারদের অনুকরণ করে স্থানীয় সর্দারদের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছিল প্রথাটি।”[৭]

বিধিবদ্ধ শাসন মেনেই এই নাচ প্রদর্শিত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্য বলতে মহুয়া মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

“শাস্ত্রীয় নৃত্য বলব কাকে? যার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই শাস্ত্র কথাটি এসেছে শাসন থেকে। বিধিবদ্ধভাবে শাসন মেনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে যে নৃত্য তাই শাস্ত্রীয় নৃত্য।”[৮]

নাচনি নাচকে এখন বাইনাচ বলা হয়। নাচনিদের এখন বলা হয় বাই। এই নাচে যেসব আঙ্গিক ব্যবহার হয় সেগুলি হল —

স্থানক ঃ

দাঁড়াবার কায়দা। আখড়ায় নাচনির দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। হারমোনিয়ামের সঙ্গে গলা মেলানোর সময় তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গিকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না। দর্শকদের দিকে হাত জোড় করার কৌশলটিও নটিসুলভ দক্ষতার প্রয়োজন।

চারি ঃ

চাল-চলন, অর্থাৎ ঘুঙুর পায়ে নাচনিদের চলনে দর্শকদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। পুরো আখড়া জুড়ে বিভিন্ন চালে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দ্রুতলয়ে পায়ের ওঠানামা শুরু হয়। ঘুঙুরের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাজনাদারদের বাজনাও বাড়তে থাকে।

হস্তক ঃ

হাতের বিভিন্ন ব্যবহার। বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে তর্জনী বা মধ্যমার সংযোগ, গাছ থেকে ফুল তুলে কোড়চে রাখ, বা হাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি।

ভ্রমরী ঃ

দ্রুত শরীরটাকে হঠাৎ পাক খাইয়ে সামনে বা পিছনে লাফ মারা।

লাস্য ঃ

মুখে চোখে এক অনন্য চঞ্চলতা বা তাকানো। চোখ আর ঠোঁটের ব্যবহারে দর্শক একেবারে মোহিত হয়ে যায়।

অষ্টাঙ্গ সঞ্চালন ঃ

অষ্টাঙ্গের আভিধানিক অর্থ — শরীরের আটটি অঙ্গ। দুই হাত, দুই চোখ, দুই পা, হৃদয় ও কপাল। কটিবন্ধ শরীরকে দুভাগে ভাগ করে দেয়। নাচনিদের মুখমন্ডলের ব্যবহার লক্ষণীয়। ভুরু এবং চোখ কখনো সৃষ্টি করে ভক্তি, কখনো মায়া, কখনো

উদাসীনতা, কখনো বা ইঙ্গিত। তাই নৃত্যকলার অপর নাম ইঙ্গিতকলা। হাতে চেটো কোমরে রেখে নিম্নাঙ্গ সঞ্চালন থেকেই খেমটি নাচ কথাটির উৎপত্তি।

নাচনি-নাচ দুরকমের ধুমড়ি ও খেমটি বাই। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ধুমড়ি নাচে — ঢোল, ধামসা, সানাই, করতাল, চেড়পেটি এককথায় 'মটা' বাজনার দরকার হয়। 'ধুমড়ি নাচনির বেশভূষা হয় — চুড়িদারের উপর ঘাঘরা, সেমিজের ওপর জ্যাকেট, কানে চেনমাকড়ি, গলায় রুপোর হার, নাকে নাকচাবি, হাতে চুড়িবালা, বাজুতে সোনার তাগা। কোমরে রেট, মাথায় রঙিন ফিতা ও পায়ে ঘুঙুর। ধুমড়ি নাচের কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না। দিনে, রাতে বা শোভাযাত্রায়।

খেমটি বা বাইনাচে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা, বাঁশি ও মাদল। এককথায় মিহি বা সরু বাজনা ব্যবহার করা হয়। বেশভূষার মধ্যে শাড়ি-ব্লাউজ, মাথায় রঙিন উড়নি, ফুলের তোড়া, হাতে শাঁখা চুড়ি, পায়ে ঘুঙুর। খেমটি বা বাইনাচ একমাত্র রাত্রিবেলায় হয়ে থাকে।

ধুমড়ি নাচ কমে গেছে। এখন বাইনাচের রমরমা। বাইনাচ পরে এসেছে এতে মণিপুরী নাচের প্রভাব পড়েছে। রং বা ধুয়া গানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দর্শকদের মনের মধ্যে এক অপূর্ব মায়াজাল-এর সৃষ্টি করে।

সবুজ শাড়ি রেশমি চুড়ি কেনে পরিলি
কাজল পর্‌হা চৈখে কেনে ভালিলি
আমার মনকে হরিলি আমার প্রাণকে হরিলি
রং — তুইলো ধনী প্রাণ সজনী মণে মারিলি।

আলতা রাঙা নরম পা তুঁই কেনে বাঢ়ালি
মাঘ ফাগুনের হাওয়া কেনে লাগালি।
রং-মনে রঙ ধরালি রঙে রাঙা হইলি।

— হংসেশ্বর মাহাত

ঝুমুর

ঝুমুর গানের উদ্ভব ও বিকাশ এবং ঝুমুর গীতের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি বলা দরকার সেটি হল ছোটনাগপুর থেকে শুরু করে যেখানেই আদিবাসীরা বসতি স্থাপন করেছেন সেখানেই এই ঝুমুর গীতের প্রচলন আছে। সীমান্ত বাংলার মধ্যেও বাংলাভাষার সান্নিধ্যে এসে আদিবাসী ঝুমুর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে। ভাষার পরিবর্তন হলেও সুর ও আঙ্গিকের দিকে কোন পরিবর্তন হয়নি। আদিবাসী সমাজে মাদল ও বাঁশীর সহযোগে একরকম গান গাওয়া হয়, তাকেই ঝুমুরগান বলা হয়। 'ঝুমুর' শব্দটিও সাঁওতালী গান থেকেই উদ্ভূত। যেমন ভাটিয়াল, ভাওয়াইয়া ও বাউলের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র আছে সেরকম কিন্তু ঝুমুরের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের গবেষক বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে —

> "ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট প্রেম-সংগীত। আগেই বলা হয়েছে, করমনাচের গান, নাচনী-নাচের গানও ঝুমুর নামে পরিচিত। তবে সাধারণতঃ দীর্ঘায়তনের প্রেম সঙ্গীতগুলো, যা নাচিনী নাচে যেমন গীত হয়, তেমনি একক ভাবেও গীত হয়, করমনাচের গান বা ছৌ নাচের গানে প্রেমের বিকাশ থাকলেও নির্ভেজাল প্রেমসংগীত নয়। কিন্তু ঝুমুর মূলতঃ প্রেমসংগীত। বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাও ঝুমুরের অঙ্গীভূত হয়, বলা যেতে পারে লৌকিক প্রেমের চেয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমই শেষতক ঝুমুরের শ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করে ফেলে।"[১]

ঝুমুর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশে বলা যায় ঝুমচাষ থেকেই ঝুমুর শব্দটির সৃষ্টি। সময়ের সাথে সাথে ঝুমুর বিকশিত হয়েছে। কিন্তু ঝুমুর মানেই যে শৃঙ্গাররস বহুল তা কিন্তু নয়, ঝুমুর হল এক প্রকার সঙ্গীতের চল যার মধ্যে অন্য এক সঙ্গীত জগতের পরিচয় বহন করে। সুতরাং ঝুমুর হল লোকসমাজের জীবন সঙ্গীত। প্রাগৈতিহাসিক

আদিম যুগ পর্যন্ত প্রসারিত জঙ্গলমহলের এই বিস্তৃত ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পরিমন্ডলে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠী টাঁইড়, টিকর, গাঢ়া, জোইড়, লালা বন-বাদাড়ে ঝুম চাষের সাথে সাথে ঝুমুর হাঁকতে প্রয়াসী হয়েছিল। যদিও সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এই চাষের অবলুপ্তি ঘটেছে। ঝুম চাষ সাধারণত দুটি রূপে হত, ধাপচাষ এবং স্থানান্তর চাষ। এই চাষে রাসায়নিক সার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না — কোদাল, গাঁতি, শাবল, দা, কুড়াল প্রভৃতি দিয়ে চাষ করা হত। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে এই চাষ হত যেমন — রাখা, ডাহি, গুড়িয়া, দিপ্পা, কুমারী, বেয়ার, কুরুয়া প্রভৃতি। চাষকর্ম ও চাষীদের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজর্ষি' উপন্যাসের অংশবিশেষে 'জুমিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন —

> "চাষীরা স্ত্রীলোক বালক খুব বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল... জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ-ঘাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল।"[১০]

ঐ অংশের পাদটীকায় চাষীদের সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে —

> "প্রকৃতপক্ষে ইহাদের চাষা বলা যায় না। কারণ, ইহারা রীতিমত চাষ করে না। জঙ্গল দগ্ধ করিয়া বর্ষারম্ভে বীজ বপন করে মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রকে 'জুম' বলে, কৃষকদিগকে জুমিয়া বলে।"[১১]

সুতরাং একথা বলা যায়, কৃষি নির্ভর আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খন্ড অঞ্চলের আদিম জীবনসংগ্রাম ও লোকবিশ্বাসের ধারা অনুসরণ করেই ঝুমুর গানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

সুধীরকুমার করন ঝুমুরকে সাধারণতঃ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন — (১) দাঁড় ঝুমুর (২) টাঁইড় ঝুমুর (৩) কাঠি নাচের ঝুমুর (৪) নাচনী-নাচের ঝুমুর।[১২] বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন —

"বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ঝুমুরকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) লৌকিক প্রেমবিষয়ক, (২) রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক, (৩) পৌরাণিক, (৪) সামাজিক এবং (৫) কুহেলিকামূলক।"[১৩]

ঝুমুর গানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর চারটি ধারা কবি, ডাঁইড়, উধঅ, ছুট এগুলিকে নিয়েই ঝুমুর হাঁকা। হাঁকা অর্থাৎ নিদ্বিধায় গলা ছেড়ে ডাকা। এই হাঁকা একক ও যৌথ, দুভাবেই গাওয়া হয়। এই হাঁকার সাথে কৃষিকাজের একটা সঙ্গতি আছে। এ প্রসঙ্গে নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

"আবাইদা গীত, রুআগীত এবং কাটাগীত। গীতগুলির চরিত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক নাম 'গড়্যাইজা গীত'। এই গীতে একলা মনের ভাবকে গলা উঁচিয়ে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা হয়।"[১৪]

সাধারণত চাষের কাজে যুক্ত শ্রমিকেরা চাষের কাজ করার সময় একলা বা সমবেতভাবে ঝুমুর হাঁকায়। যখন একলা হাঁকায় তখন তাকে 'একইড়্যা রেৎ' যখন সকলে মিলে হাঁকায় তখন তাকে বলে 'দুহরা রেৎ'। কৃষিভূমির বাইরেও বন-জঙ্গল, বন-বাদাড়েও ছেলেরা গরু চরানোর সময় বা পথ চলার সময় নিজের মনে মনে ঝুমুর গাইতে থাকে এই গানকে বলা হয় টাঁইড় গীত বা বাগাইলা গীত বা উধঅ। এই গানগুলি সাধারণত একইড়্যা তাই এই গানগুলিকে ছুটগীতও বলা হয়। নির্জনে সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে এই বাগাইলা গানগুলি গাওয়া হয়। অনেকেই এই গানগুলিতে 'অশালীন' স্থূলরুচির পরিচায়ক রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু শুধু যে আদিরসাত্মক ঝুমুর গানের প্রধান স্বরূপ একথা খাটে না। বাইরের দিক থেকে অশালীন বলে মনে হলেও গানগুলি জীবনরসে পরিপূর্ণ। সাধারণত মানবিক জৈবআবেদনের ছাপ হয়তো বা আছে তাহলেও একইড়া গানগুলিকে আদিরসাত্মক বলা উচিত নয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ছোটো ছোটো গান রচনা করে গাইতে থাকে। এই গানের মধ্যে কোনো গল্পরসের ছোঁয়া থাকে না।

কিন্তু খন্ড খন্ড মানবিক আবেদনের সার্থক প্রকাশ ঘটে। সাধারণত কায়িক শ্রম লাঘব, নিসঙ্গতা পরিহার ও কাজে গতি ও ছন্দ আনার জন্যই গানগুলির জন্ম। গানগুলি তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে রচিত হয় এবং বাহিত হয়। এই গানগুলির কোনো লিখিত রূপ থাকে না। মেয়ে শ্রমিকদের এই ধরণের রচিত গীতগুলিকে কবিগীত বলা হয়। মেয়ে শ্রমিকদের গাওয়া 'কবিগীত' কৃষিভূমির শ্রমগীত হলেও এর দুটো ধারা দেখা যায়, ধান বোনা ও ধান টাকার সময় 'সমবেত কবি' গায়। ধানজমি ঘুরে ঘুরে দেখার সময় 'পড়্যাইলা গীত' গায়। ঝুমুর হাঁকার একটি ছক দেওয়া হল —
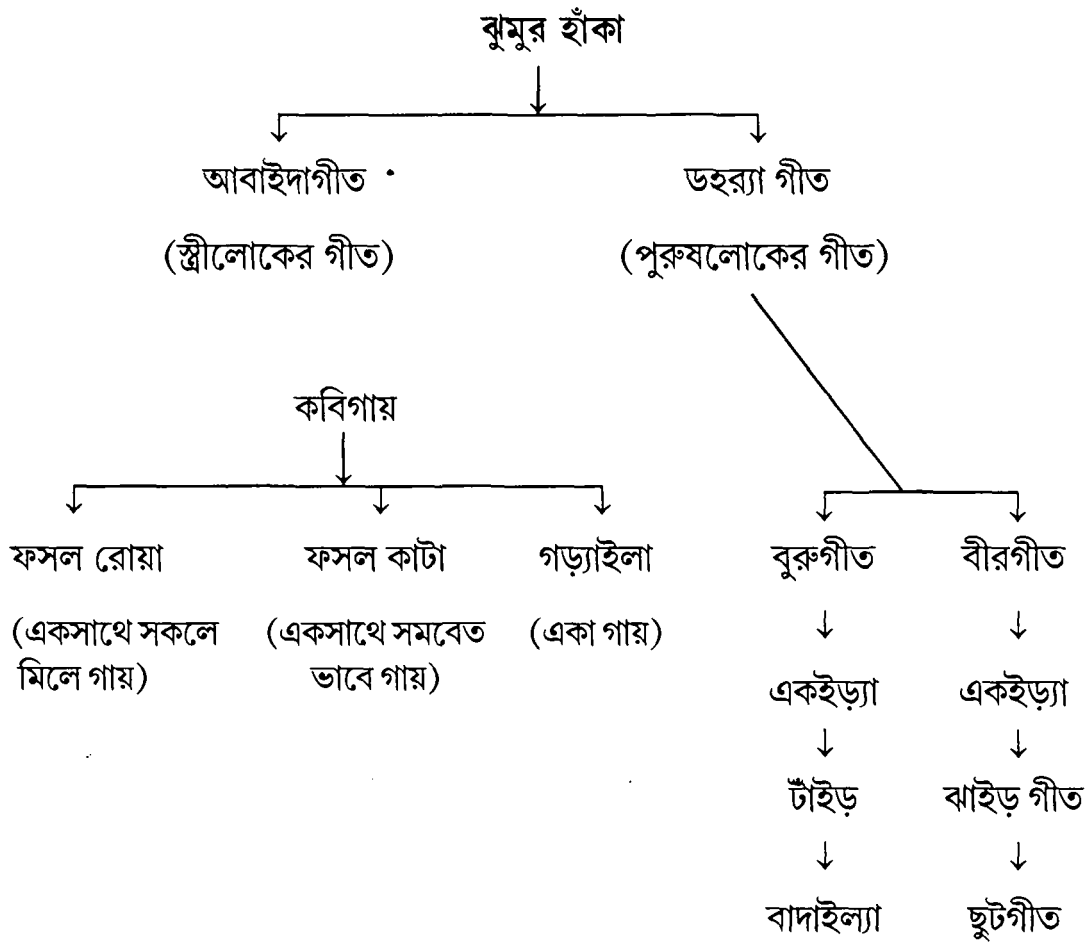
মধ্যযুগীয় ঝুমুর মূলত গাহা পর্যায়ের গীত থাকে ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে ঝুমুর গাহা বলে। এই পর্যায়ের ঝুমুরকে 'বাস্তুভূমির ধর্ম সংগীত হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কারণ করম-জাওয়া, টুসু-ভাদু, বন্দনা প্রভৃতির সময় ঝুমুর পাওয়া যায়। গীতের

মাধ্যমেই এদের বন্দনা করা হয়। কোনো শাস্ত্রীয় মন্ত্র, যাগযজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। সামাজিক সংস্কার বিবাহ, নবজাতকের নবম দিসসীয় নত্তায় গাহা ঝুমুরের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। করম, ভাদু, টুসু প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এই গীতের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পালা-পার্বণগুলি কৃষিভূমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোরই উপাসনা। যদিও এগুলি একান্তভাবে মেয়েদেরই, পুরুষেরা মেয়েদের সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকে। আবার কৃষিকাজের সময় পুরুষেরাও মেয়েদের মত ঝুমুরের গান ধরে। নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন — প্রাথমিক পর্বে যে ঝুমুরগীত ছিল একান্তভাবেই 'বানীহর', মেয়েদের হাঁকা ঝুমুর, 'ঝুমুর গাহা' পর্যায়ে এই ঝুমুর গীতই হয়ে উঠল মেয়েদের ক্ষেত্রে 'বাখইল্যা গীত' এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে 'হাইল্যা গীত' বা বাগাইলা গীত। করম ডাল সংগ্রহ করা, টুপুর উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ, চৌডল নির্মাণ, ভাদু প্রতিমা তৈরি, জাগরণের দিন গৃহসজ্জা ইত্যাদির জন্য পুরুষেরা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।[১৫]

করম ডাল সংগ্রহ করে মেয়েদের হাতে দেওয়া পর্যন্ত পুরুষেরা করম ডালকে ধরে রাখে। এই সময় যে ঝুমুর গায় তাকে 'ডালধরা ঝুমুর' বলে। করম পরবের সময় মেয়েরা অধিক রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সে সময় বাকি রাত ডালকে জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব ছেলেরাই পালন করে। সুতরাং করমগীত মেয়েদের গীত বলা চলে না। গো-পরিচর্চায় নিযুক্ত পুরুষ, হলকর্ষণের সময় বা বাগালী করার সময় নিঃসঙ্গতা পরিহার করার জন্য টাঁইড় গীত গায়। যদিও অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট তবুও একথা বলা যায় যে, এই অশ্লীলতা লোকজীবনের জৈবিক প্রবৃত্তির প্রকাশমাত্র। কিন্তু লোকালয়ে গাওয়ার সময় যথেষ্ট মার্জিত রুচির হয়ে থাকে। বিশেষ করে বান্দনা পরবে। আকারে ছোট হলেও এগুলি এক একটি সংসার জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই গানগুলির মধ্যে সমাজজীবনের জীবন্ত ছবিগুলোকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। বাগাল্যা গীতগুলি আবার এক্কেবারে আত্মকেন্দ্রিক। আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, বিরহ-মিলনের অভিব্যক্তি হিসাবে গাওয়া হয়। করম জাওয়া উৎসবটি একেবারেই আদিবাসী জনসমাজ থেকে উৎসারিত হয়েছে। ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে এইরকম জাওয়ার সূচনা হয়। সূচনালগ্নে 'করম ডাল' দেবতার

প্রতীকরূপে বাস্তুভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে বাড়ির মেয়েরা জাওয়া ডালি সাজিয়ে নৃত্যগীতের মাধ্যমে তাদের কামনা-বাসনাকে করম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। করম ও জাওয়া দুটি পৃথক উৎসব নয়। করম পরবটি জাওয়া কর্ম হবার পরই অনুষ্ঠিত হয়। জাওয়া অর্থটি জোগাড় যন্ত্রর বলে আমরা মনে করি। পূজার আনুসাঙ্গিক হিসাবে মেয়েরা পাশ্ববর্তী জলাশয় থেকে বালি আনে। বাঁশের তৈরী কুলো বা ডালাতে ভিজে বালি রেখে তাতে ছড়িয়ে দেয় ছোলা, মুগ, কুত্তি, ভুট্টো প্রভৃতি শষ্যদানা। কিছুদিন পর বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয় এই অঙ্গুরোদগমকে জাওয়া বলে।

একসাথে পাশাপাশি অনেকেই জাওয়া রাখে। আবার একই পাত্রে সীমানা চিহ্নিত করেও অনেকে জাওয়া রাখে। প্রত্যেক দিন রাত্রে মেয়েরা নিজের নিজের জাওয়া ডালিকে বাস্তুভূমি থেকে কুল্হির বাইরে বের প্রদক্ষিণ করে, নাচ করে। করম ও জাওয়ার কোনো আলাদা আলাদা গান নেই। একই গান করম ও জাওয়া পরবে গীত হয়। কর্ম শব্দ করম (তদ্ভব রূপ) স্বরভক্তি জনিত পরিবর্তিত ধ্বনিরূপ। করম ও জাওয়া পরবটি কৃষিভিত্তিক, করম-জাওয়ার গানগুলিও কৃষিভিত্তিক। যে সকল মেয়েরা এই পরবে অংশগ্রহণ করে তাদের জাওয়ার মা বলা হয়। বীজ বপন করাকে জুমকর্ম জাওয়া বলে। গানগুলিকে ঝুমুর গীতেরই একটি স্তর হিসাবে বিবেচনা করা যায় —

'ইতি উতি জাওয়া কিয়া কিয়া জাওয়া
জাওয়া জাগল মর দানা বাহুরে।'

ভাদু

ভাদুপূজাকে কেন্দ্র করে ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত। তবে সবচেয়ে বেশি প্রচলন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়। কাশীপুরের (পুরুলিয়ার) রাজকন্যাকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তী প্রচলিত এর কারণ হিসেবেও এই ভাদুপরব বলে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত। ভাদুর সাথে ঝুমুর ও পদকীর্তনের সম্পর্ক আছে। ভাদুগান এই অঞ্চলের মাটির গান, এখানকার এক্কেবারেই নিজস্ব ফসল। এর সুর এক্কেবারেই প্রকৃতির সহজাত সুর। ভাদুপরব হল এখানকার গ্রামীণ লোক উৎসব। সমস্ত ভাদ্র মাস জুড়ে এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক জায়গায় ভাদুর মূর্তি গড়িয়ে পুজো হয়, তবে এই অনুষ্ঠানে কোন ব্রাহ্মণ ও বৈদিক মন্ত্র থাকে না। সংগীতের মাধ্যমে ভক্তি নিবেদন করে। সাধারণত ভাদু মূর্তির কোলে কৃষ্ণকে দেখা যায়। ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত ভাদুব্রত মেয়েদের ব্রত। গানে থাকে নিষ্ঠা ও তাদের কামনা-বাসনাকে জাগ্রত করে।

কোলে যদি আসে যাদু।
আসছে বছর আনব ভাদু।।

জনবিন্যাস, নদীনালা, গাছপালা সমস্ত মিলেমিশে বৈষম্যের মধ্যেও মাধুর্য আনে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিচিত্র সমাবেশ, রাজপরিবার থেকে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে হয় গেছে। সেই অর্থে ভাদু একটি বিশেষ লোক-উৎসব। ভাদুগান বা এই উৎসবের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ প্রত্যেকের মনকে মাতিয়ে তোলে।

ভাদুগানের বা পূজা প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে এই পূজার কোন ব্রাহ্মণ নেই। অনেক কিংবদন্তি ভাদু সম্পর্কে পাওয়া যায় যেমন — পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত কালীপুরের রাজা নীলমণি সিংদেওর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ভদ্রেশ্বরী। তার দেব-দ্বিজে অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। অনেকের বিশ্বাস অবিবাহিতা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আবার জনশ্রুতিতে জানা যায় স্বামীর ঘর করতে না পেরে

গৃহদেবতার ঘরে রাত কাটাতেন।

কন্যাটির অকাল মৃত্যুতে মহারাজ নীলমণি সিংদেও মনে প্রচন্ড আঘাত পান এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ভাদ্র মাসে তার রাজত্বে ভাদু উৎসবের সূচনা করেন।

আমার মানিক আমার সোনা
এমন চাঁদপনা মুখ
কোথায় পাবো
চিকন কালো, রেশম কালা
মাথার চুল
কেশবতী কন্যা আমার ভাদুরাণী
এমন রূপের নাইকো তুল।

ভাদু উৎসব করম উৎসবেরই একটি ফলশ্রুতি। কারণ ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলে টিকর উঁচু নীচু ভূমিভাগ, বৃষ্টিপাত খুবই সামান্য বর্ষাকালীন একটি সংগীত। ভাদ্রের ভরা বর্ষা হল একটি কুমারী নারী তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা এবং কঠিন বাস্তব জীবনে প্রবশ পর্ব। আবার গ্রীষ্মের পর বর্ষা খুবই আদরণীয় তাই শুধুমাত্র অশরীরী আত্মার প্রশাস্তিবাচক ভাদুগান নয়। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত গ্রহণযোগ্য। তিনি লিখেছেন —

> ''পশ্চিমে ছোটনাগপুরের আরণ্যভূমি যখন আদিবাসীর বর্ষা উৎসবের 'করম' সংগীতে মুখরিত হইয়া উঠে তখন পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীনি কুমারীদিগের কণ্ঠনিঃসৃত ভাদুগানের ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব-দক্ষিণ মালভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্র মাসের যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত

হয়, তাহা হিন্দু প্রভাববশত বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে — তাহা ভাদুপূজা নামে পরিচিত, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর করম উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র।"[১৬]

সমগ্র ভাদ্র মাস জুড়ে ভাদুর উৎসব চলে এই ভাদু উৎসবটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আগমণী, স্থিতি ও বিসর্জন। ভাদ্রমাসে ভাদুসংক্রান্তি বিসর্জনের আগের দিনের রাতটিকে বলা হয় ভাদু জাগরণ। মাসের আরম্ভ ও শেষ সুতরাং মাঝের দিনগুলি হল স্থিতি। কোথাও ভাদুকে জলে বিসর্জন করা হয় আবার কোথাও কোথাও মূর্তিটিকে জলে ঠেকিয়ে ঘরে এনে রাখা হয়। মিষ্টান্ন, ফলফুল প্রভৃতি দিয়ে ভাদুর নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পাড়ার মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভাদু দেখতে যায় এবং সকলে মিলে গান করে—

ভাদু দেখতে আলি তরা
বৈস না তর চাঁদু কইলে
পানো ভইরে মাড় রেখেছি
খা লো তরা পেট ভইরে।

কোনো ভাদুমূর্তির খুঁত থাকলে গানে মধ্যেও তার জানান দেওয়া হয় —

তোদের ভাদু পৈরতে খুজে নতুন ছকের কাল্লা ফুল।
হাতে নাই পুরনো সিকি এত কিসের সদ্দ তুই।

ভাদু জাগরণের রাতে গানের সুরে জমে ওঠে রঙ্গ-তামাসার আসর।

ওলো পরাণসজনী
এমন কথা বললি ক্যানে গো জানি
ওলো পরাণসজনী
ভাদু বইলতে আলি আমরা লো
বড়ো ঘরের ঘরণি

ঘরি ঘড়ি পানের খিলি

হাতে সনার বিউনি

ওলো পরাণসজনী

এমন কথা বললি কেনে না জানি

ওলো পরাণসজনী

একসময় সমস্ত রাগ-অভিমানকে দূরে ঠেলে একে অপরের কাছে ক্ষমা চায় —

ও ভাই রাগ কইরওনা

যত কিছু বইলেছি ধনি

সকইল্ ভুইলে যাওনা

ঝগড়াঝাটি মনকে মাটি

ও ভাই রাগ করিস না।

রামায়ণের কিছু চরিত্র বিশেষ করে রাম-লক্ষণ, রাবণ, সীতা-সরমা, হনুমান এদের চারিত্রিক ত্রুটিও ভাদুগানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বল ভাদু ভাদরে

আমার রাম কাঁদে গো সীতারই তরে

বল ভাদু ভাদরে

সীতা হইরে লিলি রাবণরে

রাখবি কেমন কইরে?

দেখবি রে তোর সোনার লঙ্কা

দিবে হনু দাহণ কর‍্যে

বল ভাদু ভাদরে।

বিবাহের স্বপ্ন যুবতী হৃদয় উদ্বেলিত করলেও বিবাহিত জীবন যে সকলের জীবনে সুখের হয় না তা গানের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয় —

শাশুড়িতে ধইরে মারে শ্বশুর কিছু বলে না।

ননদিটায় মুখ ঝামটায় জানে পাড়া পরগনা।

মাগো তুমার পায়ে পড়ি কাকেও কিছু বইলনা

অরা যদি শুইনতে পায় জুটবে আরও লাঞ্ছনা।।

ভাদুগানে পারিপার্শ্বিক জীবনের খুংটিনাটি দিকগুলিও ফুটে ওঠে। কখনো বাড়ির লোকের বিভিন্ন গৌরবের দিকগুলি আবার কখনো বিপরীত ব্যঙ্গ কটূক্তি শালীনতা বর্জিত জীবনের দিকগুলিও ফুটে ওঠে ভাদুগানের মধ্যে। এরকম একটি গান —

এই স্বাধীন দেশে

অরা চইলবেনা আর স্বামীর বশে

এই স্বাধীন দেশে

স্বামীর কোলে ছেইল্যা দিয়ে গ

গিলি চুইলর বাঁইধতে বসে।

আবার ঘুমাইলে স্বামী গিনি তখন

সিনেমায় যায় হেইলেছইলে

এই স্বাধীন দেশে

ছি ছি স্বাধীন দেশে।।

শুধু ব্যঙ্গই নয় বেদনার ছবিও ধরা পড়ে। অকর্মণ্য স্বামীর ঘরণী বা বিপথগামী স্বামী-পুত্রের জন্যও করুণ হৃদয়ানুভূতি ভাদুগানে ধরা পড়ে।

কাঠিনাচ ঃ

কাঠিনাচকে গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারীর অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন। এটি মূলতঃ বীরত্ব ব্যঞ্জক বা martial dance (যুদ্ধনৃত)। মাহাত, বাগাল, ভুঁইঞা, বাগদি, বেহারা, মুচি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই নাচের প্রচলন দেখা যায়। আদিবাসী সাঁওতাল, মুন্ডা,

কোড়া, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই নাচের প্রচলন রয়েছে। কাঠিনাচের সময় নর্তকের দল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর বৃত্ত তৈরি করে বৃত্তটি বড় আকারের হয় মাঝে দাঁড়ায় বায়েন ও গায়েন। ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরিধান করে মাথায় ময়ুর বা বিভিন্ন পাখির পালক পরিধান করে। একজন বা দুজন মূল গায়েন ও বাকিরা দোহারের কাজ করে। মাদলের ধিতাং ধিতাং বোলের সাথে সাথে মাথা দুলিয়ে মৃদুমন্দ আবর্তিত হয়। মাদল, বাঁশি, করতাল প্রভৃতির সমন্বয়ে ছোট ছোট কাঠি নিয়ে নৃত্য করা আসলে যুদ্ধের স্মারক বলে মনে হয়। সাধারণত ভাদ্রমাস থেকে এই নাচ শুরু হয়। গ্রামের মন্দির বা চৌরাস্তায় বা কোন পাকা রাস্তার মাঝখানে এই নৃত্য প্রদর্শণ করে। দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমী থেকে বিজয়া দশমীর (গুজরাটের ডান্ডিয়া নৃত্য যা নবরাত্রির সময় হয়) দিন পর্যন্ত বা মকরসংক্রান্তির সময় চাউরি, বাউরি, মকর এখাইন ও ঘেগাইন এই পাঁচদিন এই কাঠিনাচের অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত শ্রমসাধ্য বলেই শুধুমাত্র পুরুষেরাই এই নাচে অংশ নেয়। গানগুলি এরকম —

শালুক ড্যাঁটার ঘর তুলেইছি
ল্যাকের প্যাকের করে রে
লৈতন বহু পাছে আমার
জাঁকা লিয়ে মরে রে।

গানটিতে জরাজীর্ণ ঘরের চিত্র এবং সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে।

আইল রে হড়হড্যা বান
লিয়ে গেল শোলের ধান
ওহে বাছা ভগবান
মাহাজনে কি দিব জবান।

ভরা ভাদ্রের বাঁধভাঙা বন্যায় ভেসে গেছে আগামী দিনের সুখের স্বপ্ন।

আবার —

যখন জামাই আধাবাটে

তখন বিটি পুখুইর ঘাটে

জামাইকে দেখ্যে বিটির

মাথা দুখা জ্বর গো

জামাইকে দেইখে।

দীর্ঘদিন পর স্বামীকে দূর থেকে আসতে দেখে মেয়ের শরীরে কৃত্রিম জ্বর এসেছে।

মহুল পড়ে থকা থকা

কি কইরে কুড়াব একা

হায় হায় বঁধূয়াকে

হুড়াটে ঘেরেছে। (দক্ষিণবঙ্গে হুড়ার শব্দটি চলিত, রায়মঙ্গলে আছে।)

মহুয়া ফুলের প্রাচুর্য, ঘরেতে বধূ একাকিণী। স্বামী প্রবাসী, কোথায় আছে, কেমন আছে কোনো কিছুই জানা নেই। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখন কাঠিনাচের আসরে পুরাণকেন্দ্রীক গান গাওয়া হয়।

পরথমে বন্দনা করি গাঁয়ের গরাম

তারপর বন্দনা করি পরভু শ্রীরাম

তা পরে বন্দনা করি সমাজ চরণে

হায় হায় তা পরে বন্দনা করি ডাকিনী-যুগিনীরে।

তাপরে বন্দনা করি ধর্ম নিরঞ্জন হে

তাপরে বন্দনা করি আসর গুণীজন হে।

লক্ষ্যণীয় প্রথমে বন্দনাগীতিতে গ্রামদেবতা, ডাকিনী যোগিনী এবং রামচন্দ্র ধীরে ধীরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণের বন্দনাও প্রকাশ পায়। একদিক অস্ট্রিক ভাবধারা ও অপরদিকে হিন্দু সমাজের একটা মিশ্রণের পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। গানগুলির সুর এবং গানের বাঁধন ঝুমুর।

করম ঃ

সংস্কৃত কর্ম > করম শব্দের উদ্ভব। কর্মফল, ভাগ্য বলে শব্দের অর্থ নির্দেশ করা যায়। যদিও কাজ, ক্রিয়া, ভাগ্য, কপাল, অদৃষ্ট অর্থেও অস্ট্রিক জাতীগোষ্ঠীর মানুষ অনেকটা নিয়তি তাড়িত বলে মনে করে আমরা দেখেছি তারা অদৃষ্টবাদী — অদৃষ্ট বাং তাহেঃ কানা। বলে নিয়তিবাদে বিশ্বাসী এই বিশ্বাস থেকেই সৃষ্ট হয়েছে করম নাচের। এটি মূলত শস্য, সন্তান ও সামাজিক মঙ্গলকামনার উৎসব। কর্ম শব্দের মূলে কর্মপ্রেরণা, কর্মফল, সুকর্ম ও অপকর্ম এবং তা থেকে শুভ ও অশুভ ফলের ইঙ্গিত। করম পূজার নেপথ্যে একটা কামনা নিহিত থাকে। বৃক্ষ থেকেই যেহেতু মানুষ সমস্ত কিছুই অর্জন করে তাই প্রকৃতি পীড়িত আদিম মানুষ প্রকৃতির ভীষণ-ভয়াল রূপও শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাদের বশে আনার জন্য বৃক্ষপূজার সৃষ্টি করে। করম উৎসবে পাশাপাশি দুটি করম ডালকে পুঁতে পূজা করাকে করম রাজা ও করম রাণীর বিবাহানুষ্ঠান বলেও ভাবেন। করম রাজা সূর্য ও করম রাণী পৃথিবীর প্রতীক। এই দুইয়ের পরিণয়েই প্রচুর শস্যের সৃষ্টি হবে। এই উৎসবের আচার ও উপকরণগুলো দেখলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

করম পূজায় কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। পুরুষেরা তাদের সাহায্যের জন্যেই থাকে। উৎসবে কুমারীদের যোগদানের পশ্চাতে উর্বরতা ও প্রজননের ইঙ্গিতটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ভাদ্র মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে করম পূজার ব্রতিনীরা জঙ্গলে গিয়ে রকম গাছ নির্বাচন করে তার গুড়িতে হলদে সুতো বেঁধে আসে। তারপর একাদশীর দিন সেই নির্বাচিত গাছটির দুটি ডাল কেটে ভক্তিসহকারে গ্রামপ্রধানের বাড়িতে এনে পাশাপাশি পুঁতে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নাচ তার নাম পাতানাচ। আর এই নাচের অনুসঙ্গ হিসাবে যে গান গাওয়া হয় তার নামই করমগান বা পাতাগান। করম পূজার দিন নাচ-গান লক্ষ করা গেলেও মাসাধিককাল আগের থেকেই এর অনুশীলন চলতে থাকে। নাচের ভঙ্গিমাটি ধানরোয়ার মতো ও কৃষিকর্মের উদ্দীপনা ও আনন্দ লক্ষ করা হয়।

হাতে লুব বুঁদিটি কাঁধে লুব কদাইলটি

মনের সুখে টাইনে লুব চুটিটি

লহকে ধইরব আইড় দুটি

শাল কাঠের হালটি

কুসুম কাঠের বঁটা

হলহল্যা পানা লিয়ে

কইরব হি-টাটাঠা।

করমগানে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসির কথাও লক্ষ্য করা যায় —

গেল বারের আকালে

কুথাও নাই ক্ষুদ মিলে

ভকে হায় পরান গেল জ্বইলে।

ছাগল ভেড়া বিকে খালি

খালি মুরগ হাঁসে

কাম নাই পাইট নায়

যাব পরবাসে।

করম রাজা এলেই উৎসব পরিপূর্ণ হবে না, যদি তাতে বাড়ির সকলেই অংশগ্রহণ না করে।

বারো বছর পরে ভাই লেগে আইল গো

হামে শওর যাব নয় হর,

হাসে নেহি জনম বহু

তাহরি বিদায় গো

বুঝি লিহ আপনিগ শাশুড়ী

বারো বছরে শাহড়ী, ভাই লেগে আইল গো

হামে নৈহি জলম বহু তহারি বিদায় গো

বুজিলিহ আপনিগ ভাশুর।

বাঁদনা বা সহরায় ঃ

দীপাবলির উৎসবে আমরা যখন কালীপূজা করি ঠিক তখনই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে অমাবস্যার নিশুতি ভেদ করে গৃহস্থের গোয়ালে জ্বলে ওঠে 'কাঁচা-দিয়া'। ধূপ-ধূনো, ধান-দুর্বা, সিঁদুর, আতবচাল প্রভৃতি পুজো সামগ্রীর। চোকপুরায় প্রথম পা রাখবে সন্ধ্যোবেলার গোঠ থেকে ফেরা গরুর দল। সমস্ত আয়োজনই 'গো বন্দনা'র। ঝাড়খন্ডী উপভাষায় যা বাঁদনা ও আদিবাসীদের ভাষায় সহরায়। এই উৎসবের মূল আকর্ষণীয় অঙ্গটি হল গরু-খুঁটা। কবে এই অনুষ্ঠানটির শুরু হয়েছিল তার কোনো লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। লোকবিশ্বাস অমাবস্যার দিন রাত্রে সমস্ত দেবতা মর্তে নেমে আসেন পুজো নিতে। সাহারায় শব্দের অর্থটি সাহার থেকে এসেছে। যার অর্থ বৃদ্ধি। এই অনুষ্ঠানে যে গান গীত হয় তাকে অহীরা বলা হয়।

গরুদের ধুইয়ে পরিস্কার করে শিং ও খুরে কচড়ার (মহুয়া ফলের) তেল মাখিয়ে গ্রামের প্রবেশ পথের ফাঁকা জায়গায় জমা করা হবে। জমা হবে গ্রামের লোকেরাও। এরপর লায়া বা গ্রামের প্রধান কিছু দূরে চৌকামতো আলপনা এঁকে দিবেন চালের গুঁড়ি দিয়ে। সেই আলপনার ভেতর রেখে দেওয়া হবে একটি ডিম। বেজে উঠবে ধামসা মাদোল, ঢোল, কাঁসর। স্বাভাবিকভাবেই গরুগুলো দৌড় দিবে যে গরুটি ডিমটিকে পা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলবে তাকে মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে ধরা হবে এবং গরুর মালিকের কাছে আবদার স্বরূপ হাঁড়িয়া বা মহুয়ার মদের দাম নেওয়া হবে। গোয়ালেই মাটির নতুন কড়াইতে পিঠে বানানো হবে। গরুগুলিকে সাজানো হবে। তাদের গায়ে লাল-নীল ছাপ দিয়ে মাঠ থেকে ধানের গুছি দিয়ে তৈরী করা খেড়ুয়া (মুকুট) পরিয়ে দেওয়া হবে তাদের শিং-এ। সবই করবে উপবাসী পুরুষ। উপবাসী মহিলা নতুন কুলোতে ধান-দুর্বা দিয়ে গরুগুলোকে বরণ করবে। ঠিক যেমন নববধূকে বরণ করে তোলা হয়, সঙ্গে চলবে গান। রাত্রে ঢোল-ধামসা মাদলসহ যুবকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরু জাগাবে। সেদিন গরুদের ঘুমোতে নেই। গরুর বিয়ে তাই বাসর জাগরণ। গো-জাগরণকারীদের বলা হয় ধানড়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় জাহলি বুলা —

অহিরে, কা কর সিরাজল

দিয়রা রে দিয়রা

কা কর সিরাজল বাতি। (সাদড়ীর প্রভাব)

কা কর সিরাজল রায় সরিষা তেল

সেই তেল বয়ে সরা রাত্রি।

ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন গো-বন্দনার অন্যতম আকর্ষণ গরু খুঁটা। বিশেষভাবে যুবকেরা হাঁড়িয়া খেয়ে গরুকেও হাঁড়িয়া খাওয়ানো হয় এরপর নির্বাচিত গরুকে কুলহির ফাঁকা জায়গায় শক্ত খুঁটিতে মজবুত দড়িতে বেঁধে বাজনা সহকারে বিরাট চামড়া তার মুখের সামনে নেড়ে চলে এতে গরুটি রেগে গিয়ে শিং উঠিয়ে তাড়া করে। সে সময় তারা গান গায়—

ডহরক মহুয়টা করে চুম্মবা চুম্মবা

মহুয়া খায় বহুবিটি গাল তুমবা-তুমবা

ই-বাড়ির ঝিঙ্গালত উ বাড়িকে খায়

ঘরের ছোড়া পুত ঝিঙা নাহি খায়।

বাঁধনা পরবের গান ঃ

অহিরে

জাগমা লখ্খী জাগ মা ভগবতী

জাগেত আমাবইস্যার রাতি

জাগে কা পতিফল দিবে মা লখখী

পাঁচ পুতায় দশ ধেণু গাই-ই-ই।

অর্থাৎ ওগো, দেবী ভগবতী তুমি জাগ্রত হও। অমাবস্যার রাত তুমি জাগ্রত হও। গৃহবাসিনী তোমরাও জেগে থাক। তোমাদের জেগে থাকার ফল তোমরা পাবে। লক্ষ্মীর কৃপায় ধন-সম্পদ, গো-মহিষে ঘর ভরে উঠবে।

অহিরে

মানুষ জনম তালা ঝঙা ফুলের কলিরে বাবুহো

সাঁঝে ফুটে বিহানে মলিন

যতদিন বাঁচইবে ফুরতি কইরবে

মরিলেত মাটিতে মিশাবে।

মানুষ জন্ম ঝিঙা ফুলের মতো ক্ষণস্থায়ী। যতদিন বাঁচবে আনন্দের সাথে বাঁচো। মারা গেলে সেইতো মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

অহিরে

কিয়া বরণ কাড়া তরই আটঅ অঙ্গ রে বাবু হো

কিয়া বরণ দুইঅ শিং

কিয়া বরণ কাড়া তরই দুইঅ আঁখিরে

কিয়া বরণ চাইর পা

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ-প্রশস্তি কীর্তিত হয়। যেমন শিং-এর সৌন্দর্য বর্ণনা করে গায়—

অহিরে

কনে কা শিং ভালা আঁকচু বাঁকচু বাবু হো

কনে কা শিং কইরল পং

কনে কা শিং ভালা কান-পৈঠে ঘুরয়ে

কনে কা শিং অরে তারইল?

আহিরে

মইষী কা শিং ভালা আঁকচু বাঁকচু বাবু হো

বরদা কা শিং কইরল পং

ভেড়াকা শিং ভালা কান পৈঠে ঘুরয়ে

কাড়া কা শিং অরে তরাইল

অর্থাৎ কার শিং আঁকাবাঁকা আর কার শিং-ই বা নতুন অঙ্কুর ওঠা বাঁশের মতো? কার শিং কানের দিকে ঘোরানো আর কার শিং তলোয়ারের মতো বাঁকানো? গানের পরবর্তী অংশেই আছে উত্তর, তাতে বলা হয়েছে স্ত্রী-মহিষের শিং আঁকাবাঁকা আর বলদের শিং নতুন অঙ্কুর ওঠা বাঁশের মতো। ভেড়ার শিং কান পর্যন্ত ঘোরানো আর মোষের শিং তলোয়ালের মতো।

কোনো কোনো গানে মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ফুটে ওঠে

আহিরে

কনে কা পাতা উলটি পালটি রে বাবু হো
কান পাত থাকয়ে গম্ভীর?
কনে কা পাতা ভালা জোড় হাত করয়ে
কন পাতে ঝাঁকে রে আইল?
ভালা আহিরে
জইড় পাত ভালা উলটি পালটি যে বাবু হো
বড় পাত থাকয়ে গম্ভীর
কলা কা পাত ভালা জোড় হাত করয়ে
আঁখ পাতে ঝাঁকে রে আইল।

অর্থাৎ কোন্ গাছের পাতা অল্পতেই নড়াচড়া করে, আর কোনবা গাছের পাতাই স্থির থাকে। কোন পাতা হাত জোড় করে থাকে আর কোন কোন গাছের পাতা আলোর দিকে ঝুঁকে থাকে? পরেই আছে উত্তর, অশ্বত্থ গাছের পাতা একটুকু বাতাসেই উলট-পালট খায় কারণ পাতাটি খুবই পাতলা আর বটগাছের পাতা মোটা হওয়ায় স্থির থাকে। কলাগাছের পাতা হাত জোড় করে থাকে। গানটির ভাবার্থ হল অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করের মতো। অল্পজ্ঞানী একটুকুতেই গর্বিত হয়ে ওঠে আর প্রকৃত জ্ঞানী কিছুতেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। তা যতই দুঃখ-কষ্ট, শোক আসুক তাকে সহজে স্পর্শ করতে পারে না।

অহিরে

সারা দিন ধুয়াইলম চরাইলম

বনে জঙ্গলে রে

আজ তর দেখিব মর্দানি

আজিকার রণে ভালা

জিতে যদি যাইস রে

চারিপায়ে নুপুর ছাহাব।

অর্থাৎ ওরে আমার বলদ। এতদিন তোকে বনে জঙ্গলে চরালাম। তোকে শক্তিশালী করলাম শুধুমাত্র তোর বীরত্ব দেখব বলে। যদি তুই আজ ভালো বীরত্ব দেখাতে পারিস্ তাহলে তোর পায়ে নূপুর পরিয়ে দেব।

তেমনি আবার কিছু কিছু গানে দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলন ধরা পড়ে —

অহিরে

সব পরব বরদা ঘুরে ফিরে আসে রে

মানুষ মরিলে আর আসে নাই রে

আগুনে যে জ্বলে রে

হাড়-মাস মিলায় রে

পইড়ে থাকে আঙার।

সংসারে সব পরব বারবার ফিরে আসে। সুখ-দুঃখও চক্রকার আবর্তিত হয়। কিন্তু মানুষের মৃত্যু হলে সে আর কোনদিন ফিরে আসে না। আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় আর শ্মশানে পড়ে থাকে অঙ্গার। স্মৃতি দিয়ে যায় যা মানুষকে বেদনা দেয়।

আর ভালা অহিরে

কোন যে কাঁদে ভালা

জনম জনমরে

কোনে ত কাঁদে ছয় মাস

কোন যে কাঁদয়ে

দেড় পহর বাইত

কোনো ত খায় গুয়াপান?

সইবুড়ি কাঁদয়ে

জনম জনমরে

বহিনিত কাঁদে ছয়মাস

পাড়া-পড়শী কাঁদে

দেড় পহর রাইত

বাবু ভায়ায়

খাতো গুয়াপান।

কেউ মরলে কে কেমন কাঁদে? বুড়িমা কাঁদেন তার ছেলের জন্য — যতদিন তিনি বাঁচবেন। ভগিনীর দুঃখ তার চাইতে কম — সেও কম কাঁদে না। প্রতিবেশী অল্প সময়ের জন্য চোখের জল ফেলেন। আর বাবুভায়া পান-সুপারি খায়। কেন না এটা তাদর বিলাসের অঙ্গ।

কোনে হে সিরিজিল হাল জুয়ালরে

কোনে ত সিরিজিল গাছ

কোনে হে সিরিজিল পঞ্চ বরদ গো

ঘুরাইত কার ক্ষেতে।

ঈশ্বরেহি সিরিজিল হালজুয়াল গো

মহাদেব সিরিজিল গাঁই গাইয়ে সিরিজিল

পঞ্চ বরদা গো ঘুরাইত আহিরিকা ক্ষতে।

কতক চলইব কতক ধোয়াইব পুই নাইত বখরাইত পিঠি।

গানের শেষে কেমন যেন এক মাদকতা তাদের পেয়ে বসে। যদি মাদল না থাকে তাহলে

অন্য গ্রাম থেকে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পর্ব কোন পথে হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ঠ হয়েছে বলা শক্ত। ট্রাইবাল কৃষিজীবি সমাজের স্মৃতিচিহ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বাঁকুড়া অঞ্চলে কার্তিক অমাবস্যায় সাঁওতালদের মধ্যে সেহেরা বা বাঁধনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ার বর্ণহিন্দুদের মধ্যে এই পর্বকে 'জামাই বাঁধনা' বলে। বর্ধমানের দঃ দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে এই বাঁধনাই আবার 'বউনি বাঁধা' নামে পরিচিত। বাঁধনা পর্বে স্ত্রী-পুরুষ অবাধ স্বাধীনতা পায় সাঁওতালদের মধ্যে। বাঁকুড়াতে গরু পরবে জামাইকে টেনে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে আদিবাসীদের ফসল ফলানোর কৃত্য হিসাবে যৌন-সংসর্গ এই পর্বের মূলে কার্যকর এবং আদিবাসীদের এই বিশ্বাস বিজড়িত অনুষ্ঠান বৃহত্তর হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে রূপান্তর হতে হতে চলেছে।

বাহা (ফুল) গান ঃ

রুক্ষ অনুর্বর ঢেউ খেলানো উঁচুনীচু, তড়া-গড়া, ডুংরি-দাড়াং আর অরণ্য-পর্বত সমাকীর্ণ ছোটনাগপুর মালভূমিতে প্রকৃতির সন্তান অস্ট্রিক ভাষাভাষীর মানুষগুলি সহজ-সরল, অনাবিল, অকপট, পুষ্ট ও পরিশ্রমী, সৎ ও সত্যভাষী। জীবন-সংগ্রামে এরা অকুতোভয়, সত্যনিষ্ঠায় দৃঢ়প্রত্যয়, উৎসাহী শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চায়। সামাজিক অনুশাসন ও পারিবারিক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এরা এগিয়ে চলে। তাই আদিবাসী পল্লিতে বারোমাসই ধামসা মাদল আর লাগড়া বাজে। তুমদা, তিরিয়ো, টামাক আর বানাম এর ঐক্যতান সুর শোনা যায়। বহু বিচিত্র উৎসবানুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান একটি উৎসব বাহা বা শালুই। বনে বনে বহু বিচিত্র অরণ্য পুষ্পের সমারোহে চারিদিকে যখন বর্ণবহ্নি জ্বলে ওঠে, রাশি রাশি শাল-পিয়াল-মহুয়া ফুলের গন্ধ আকাশ-বাতাসকে আমোদিত করে তখনই অনুষ্ঠিত হয় বাহা বা শালুই উৎসব। দেবী জাহের এর পূজা উপলক্ষে উপজাতি সম্প্রদায় নৃত্য-গীতে বাহা এনেচ বা বাহা নাচ সাথে বাহা গান বা বাহা সেরেঞ এ নিজেদের ভরিয়ে তোলে। বাহা নাচের মুদ্রায় ও গানে দেবী জাহের 'এরা'র নিকট তাদের বিনীত প্রার্থনা —

অকয় মায় চিয়ালেৎ হো বির দিশম্ দ?

অকয় মায় দহলেৎ হো আতারে পাঁয়রি?

মারাং বুরু চিয়ালেৎ হো বির দিশম দ

জাহের এরায় দহলেৎ আতারে পায়রি।।

অর্থাৎ

কে সন্ধান করেছিল অরণ্যভূমির?

কে বসতি স্থাপন করেছিল গ্রামে?

মারাং বুরু সন্ধান করেছিল অরণ্যভূমির

জাহের এরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল।

প্রথম দুটি পঙতিতে প্রশ্ন এবং অধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরের পঙতিতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। সহজভাবে কামনা-বাসনারও প্রকাশ বাহাগানের সুর ও বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে—

'সার জম বাহা হো মাতকম গেলে

নাওয়া বাহা হো নাওয়া গেলে

মুলুঃ বঁসা হো বাহ বঁসা

হিসিৎ হো সঁধাড় সয়

জিউই নাওয়ায় হো হড় নাওযায়

আতো দিশম হে হেঁসেক সেকেচ

জিউই হড়ম যে লেগেচ লেগেচ।'

অর্থাৎ

ওগো শাল মহুয়ার ফুল

ওগো নতুন ফুল নতুন ফল

আঁধার নিশার শেষে

ওগো বাসন্তী চাঁদ

তোমাদের মন্দ মদির বাতাসে

ভরে উঠুক জীবন সুবাসে

আনন্দ মুখর হোক গ্রাম

উথলে উঠুক মন আর প্রাণ

বসন্তের প্রকৃতি, আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সূর্য, গ্রহরাজি, লতা, বৃক্ষ, শাল-মহুয়া প্রভৃতির কাছে কামনা করে জীবনের অনাবিল আনন্দ।

তিনৌঃ যতন গালাং মাল রাচাস্ তপাগাঃ আ

সুরতে হিজু দেশং দুলৌড় আলম সাহা; আ

হিরিচ পসির মনে দুলৌড় আমগেম সামটা ও গটায়া

বিকলি মনে জিওয়ী আমগিম রেয়াড়া।

রড় লান্দা রাঁওয়া আমাং তাপিঞ তারকো হিজু আন

মেঁৎ মুখান রূপ আমাং ঝলকাও রাকাপ আঞ।[১৭]

অর্থাৎ

তোমার জন্য যত্ন করে মালা গেঁথে রেখেছি

ছিঁড়ে ফেলনা এই যত্নের মালা

এসো এসো কাছে হে বন্ধু, দূরে যেও না

চঞ্চল না হয়ে ধৈর্য্য ধর।

জড়িয়ে ধরে আমাকে একটু মিষ্টি হাসো

তোমার রূপ আমার হৃদয়ে ঝলক তুলে।

বাহাগানের ভাব ও ভাষা এমনই জীবনরসে ভরপুর যেখানে শুধু সাঁওতালদের জীবনবেদ্যা নয়। মানব-মানবীর মনের কথা, প্রকৃতির কাছে মানুষের আত্মনিবেদনের সুর। রুচিহীন নৃত্যগীতের মাদকতায় বিশিষ্ট প্রাণ-চেতনাকে আবেগিক করে তোলে। 'বাহা' পরবে সঙ্গীত নৃত্যের যে আঙ্গিকটি পরিবেশিত হয় তাহা হল —

পরবেন নাম	সংগীত-নৃত্যের যে আঙ্গিকটি পরিবেশিত হয়	উপস্থাপনের ধারা
বাহা	বাহা দঙ লাগ্রেঁ	বাহা লাগ্রেঁ দঙ

প্রত্যেকটি বছরের কোন না কোন উৎসবের নামের সঙ্গে জড়িত এবং সেইভাবেই নামগুলি হয়েছে। আবার বিশেষ উপলক্ষ ছাড়াও উপস্থিত করা হয়। যদিও বর্ষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্ধারিত। সব পরবেই লাগ্রাঁ আগে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে দঙ অনুষ্ঠিত হয়। লাগ্রেঁ দেবতাদের খুশি করার জন্য সাধারণত স্তুতি। লাগ্রেঁ সামনের দিকে পা তুলে ডানদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এককথায় বাজনার বোলের সাথে তাল মেলানো। আর দঙ-এ মানবিক সম্পর্ক। নর-নারীর প্রেম, বিবাহ, সৃষ্টি প্রভৃতি থিম। ডানদিকে দুপা এগিয়ে এবং শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকে দেয়। এটা ভাদুর অংশ বলে ভাবা হয়। রিজলি সাহেব মুন্ডাদের এই পর্ব সম্পর্কে লিখেছেন — Sarhul or Sarjum 'Baha' spring festival corresponding to the Baha or BahaBonga of the Santals and Hos in Chait (March-April) when the Sal tree is in bloom each household sacrifices a cock and make offerings of Sal flowers to the founders of the village in whose honour the festival is held.

নিমুড়ো দাগা ঃ

আদিবাসী সমাজের মানুষ শিকার ধরার জন্য বাড়ির দেওয়ালে ছবি এঁকে রাখে। যাতে এইসব পশু সহজেই ধরা দেয়। ঝাড়খন্ডী অঞ্চলে আজও প্রথাটি টিকে আছে। প্রথাটির নাম নি-মুড়ো দাগা। অর্থাৎ মুন্ডহীন দেহ আঁকা। কারও গরু হারালে গোয়ালঘরে কয়লা বা খড়িমাটি দিয়ে মুন্ডহীন একটি গরুর ছবি এঁকে ফেলে। লোকবিশ্বাস, এতে গরুটি যেখানেই থাক না কেন, নিজে থেকে ফিরে আসবে। গরুটি পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ

ছবিটি সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ মুন্ডটি এঁকে সেটি মুছে ফেলতে হয়। এই প্রথার আবার রকমফের আছে। কোথাও বা গরু হারালে গরুর খুঁটায় একটি পিঁড়ি বেঁধে দেবার নিয়ম পালন করা হয়। কোথাও কোথাও বাড়ির গিন্নী হারানো গরুর খুঁটাটিকে বাঁদিকে তিনপাক ঘুরে মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে তিনটি সিঁদুরের দাগ টানেন খুঁটার উপর। লোকবিশ্বাস এর ফলে গরুটি অনিবার্যভাবে তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসে। আবার গরু হারালে কেউ কেউ গোয়ালের চালে দড়িটিকে তুলে রাখার নীতি পালন কতে থাকে। এই রীতিগুলি কোন জাতের মানুষ বয়ে এনেছে তা বলা শক্ত। সাঁওতাল জাতির মধ্যে গরু, মহিষ হারানোকে বলে 'ডহরু'। ডহরু হলে যে কয়দিন আগে প্রাণীটি হারিয়েছে, সমপরিমান কয়েকটি পাতা একটি লাঠির আগায় বেঁধে নিকটের হাটে হাজির হয়। একে বলে 'বিটলাহা'। সঙ্গে সঙ্গে লোক জমায়েত হয় হারানো প্রাণীটির তলাশ করে।

রাঙ্গুরুজি ঃ

মুন্ডারী জাতির মধ্যে ট্রাইবাল সমাজের চিহ্ন আজও পরিস্কারভাবে টিকে আছে। এই সমাজের দুটি বিভাগ — পশুজীবি ও শিকারজীবি। এই দুই আদিম বৃত্তিই আমাদের প্রায় সমস্ত ধ্যানধারণা ও কর্মের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সাঁওতালদের মধ্যে প্রাচীন শিকারজীবি সমাজের চিহ্ন টিকে আছে তাদের 'রাঙ্গুরুজি' পর্বের মধ্যে। ইনি পশু শিকারে বাগড়া দেবার অপদেবতা। সমাজের বার্ষিক শিকার যাত্রার প্রাক্কালে বৃক্ষমূলে এই অপদেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্রে তারা বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করে। তার আগে মাঠে ইঁদুরের গর্তে জল পুরে ইঁদুর ধরে এবং পুড়িয়ে খায়।

তথ্যসূত্র

১। আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বন : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১।

২। সীমান্ত বাঙলার লোকগান : সুধীর কুমার করণ : এ. মুখার্জী, কলকাতা, ১৩৭১, পৃষ্ঠা-১৮৮।

৩। টুসু : শান্তি সিং : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৪০৫, পৃষ্ঠা-কভার পেজ।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৬২।

৫। সিন্ধুবালা ঝুমুর ও নাচনি : তৃপ্তি বিশ্বাস : কবিতা পাক্ষিক, কলিকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৮।

৬। ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি : শ্রীরাধাগোবিন্দ মাহাত : বাংলা আকাদেমি, ১৩৭৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ।

৭। পুরুলিয়া : তরুণদেব ভট্টাচার্য : লোকসংস্কৃতি, ২০০৫, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১৩।

৮। গৌড়ীয় নৃত্য : মহুয়া মুখোপাধ্যায় : নন্দন, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৩।

৯। লোকায়ত ঝাড়খণ্ড : বঙ্কিম মাহাত : নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-।

১০। রাজর্ষী উপন্যাস : রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) : বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড। কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ পৌষ-১৪১৫, পৃষ্ঠা-৬৯৯

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৮৩।

১২। সীমান্ত বাঙলার লোকযান : সুধীর কুমার করণ : এ. মুখার্জী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২, পৃষ্ঠা-২০৬।

১৩। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য : বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত : প্রথম বাণীশিল্প শোভন, জানুয়ারি ২০০০, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১৬২।

১৪। ঝুমুর : নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৪২।

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮।

১৬। বাংলার লোকসাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য : ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৪২।

১৭। বাহাগান : শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃষ্ঠা-৮১।

অষ্টম অধ্যায়

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ও অস্ট্রিক শব্দকোষ সম্পর্কে আলোচনা

ঝাড়খন্ডী বাংলা শব্দগুলির সঙ্গে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মিল রয়েছে। খেরওয়াল ভাষা বাদ দিলেও ননখেরওয়াল গোষ্ঠীর ভাষা যেমন খাড়িয়া শবর ভূমিজ এদের ভাষাই ঝাড়খন্ডী বাংলা। বিশুদ্ধ ঝাড়খন্ডিতে কয়েকটি বর্ণের ব্যবহার সাধারণভাবে দেখা যায় না। দীর্ঘস্বর এখানে ব্যবহার হয় না বলেই আমাদের মনে হয়েছে। তাই স্বরবর্ণের ঈ, ঊ, ঐ এবং ঔ এই পঞ্চস্বর (তাই বানাণের ক্ষেত্রে হ্রস্ব স্বরের প্রাধান্য দেখা যায়, শুধুমাত্র তৎসম শব্দ এবং প্রত্যয় এর ব্যতিক্রম) এবং ঙ, ঞ এবং ণ এই ব্যঞ্জনত্রয়কে সন্নিবিষ্ট করা হয়নি। ও ধ্বনিটি ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষায় অ ধ্বনিতে রূপান্তর লাভ করেছে, পদান্তের অ স্বর দেখাবার জন্য বর্ণটির উপরে ঊর্ধকমা (যেমন কাল' = কালো) ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সেখানে তা হস্ চিহ্নযুক্ত (যেমন কাল = সময়) তাতে হস্ চিহ্ন দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র অপরিহার্য স্থানেই এর ব্যবহার করা হয়েছে। এই জন্যই শব্দকোষটিতে স্বরবর্ণের অ আ ই উ এ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন প ব ভ ম ষ র ল শ ষ স হ এই বর্ণগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অন্তঃস্থ ব এর ব্যবহার ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষায় নেই। অন্তঃস্থ য় এবং ব এর কাজে অনেক সময় অ শব্দটি চালিয়ে দেয়। ঝাড়খন্ডীতে উচ্চারণের তফাৎটা খুব সহজেই লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিভিন্ন স্থানের উচ্চারণের তফাৎ অবশ্যই আছে, তবে সাধারণ মানুষ ব্যঞ্জণবর্ণের মহাপ্রাণিত করার ঝোঁক বেশি। সব ব্যঞ্জনবর্ণের (তিন প্রকার শ, স, ষ কিছুটা ব্যতিক্রম) মহাপ্রাণিত উচ্চারণ — কার > কারহ, নাম (ক্রিয়া) > নামহ ইত্যাদি। ঝাড়খন্ডী বাংলাভাষায় শ, স ও ষ এই

তিনটি বর্ণের মধ্যে স-এর চল সবচেয়ে বেশি। ঝাড়খন্ডী শব্দগুলো দক্ষিণে বিশেষ করে ধলভূমে ওড়িয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া করি > করিছে পদের উদ্ভব হয়েছে। ক্রিয়ারূপের দিকে ঝাড়খন্ডীর সঙ্গে শিষ্ট বাংলার কিছুটা মিল আছে। মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত মৈথিলী, ভোজপুরী বাংলা অসমিয়া এবং ওড়িয়ার ক্রিয়াপদের মধ্যে একটা সমতা বিশেষভাবে দেখা যায়। এখনও প্রচলিত ঝুমুরগানের যে রীতি পদ্ধতি যেমন —

কালে লিড়িং মেয়ালে প্রভু...
বুটাম তানালে তবু...
কালে লিড়িং মেয়ালে প্রভু...
কানি জনু মারাং বুরু হিলারে...
তিনটি ছলকাম প্রভু আমা লিলারে
কানি জনু মারাং বুরু হিলারে...
তিনটি ছলকাম প্রভু আমা লিলারে
কালে লিড়িং মেয়ালে প্রভু...
লিতাম তানালে তবু...
কালে লিড়িং মেয়ালে প্রভু...
লিতাম তানালে তবু
ইসিং বাসাং দাঃ আ রেঃ উ
দাআ ঃ কা মেসাআঃসুনু
কালে লিড়িং মেয়ালে প্রভু...
লিতাম তানালে তবু

সুশীল কোড়া, বয়স ৪২
রামজীবনপুর, বাঁকুড়া, (তাং ২৯/০৯/২০১৩)

শ্বাসঘাত যুক্ত ছন্দপদ্ধতি নিঃসন্দেহে ওদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। সমাজ সম্পর্ক, বিবাহে সিঁদুর দান ও অন্য বহু আচার অনুষ্ঠান

পালন, পারিবারিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচারের মূলে সাঁওতালদের রীতি পদ্ধতির অনুসরণ আজও দেখা যায়। অস্ট্রিক শব্দাবলী থেকে শুধুমাত্র শব্দাবলীই গ্রহণ করেনি। প্রত্যয়াদিতে বিভিন্ন কারকেরও সহায়ক শব্দের ব্যবহারেই ঝাড়খণ্ডী বাংলা, হিন্দীরও বেশ কিছু ঋণ রয়েছে। ঝাড়খণ্ডীবাংলা — টা (একটা, দুটা) ইটা, পাঁশুইটা, তামাইটা, ঝগড়াইটা, মি (পাকামি, জেঠামি) মন — কেমন, যেমন হিন্দী, বাংলা ও সাঁওতালিতে অ ছাড়াও তে এর ব্যবহার। ওড়িয়ার সপ্তমী রে — রথবে ঘররে ঝাড়খণ্ডী বাংলায় সাথে, লগে, লাগিয়া, খন প্রভৃতি সহায়ক শব্দের ব্যবহার। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, বিশেষণাদি এবং সম্পূরক শব্দ ও বাক্যাংশ বাক্যের কোথায় কোথায় বসবে তা অস্ট্রিক ভাষা থেকেই আমরা শিখেছি। প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে শেষেরদিকে যে জোর দিই তা ছাড়াও বাক্যের শব্দ ও শব্দগুচ্ছের উপর শ্বাসাঘাত আর শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর কাছে ঋণী।

অ

অইঠিন — বি. সেখানে।

অইঠে — বি. ওখানে।

অইয়া — কর্ম সম্পাদনকারী শব্দ।

অইরা — বি. < আভীর - গোয়াল, গোপ।

অইসন ঃ ক্রি. বিণক্ষ < ঈদৃশন - ওইরকম।

অঁচাল — বি. < অঞ্চল - আঁচল।

অঁজরা — বি. < আবর্জনা - আর্জণা।

অঁটা — বি. কোমর।

অঁগা বিণ. — অনভিজ্ঞ।

অকাট বি. — নিখাদ।

অকূট বি. — অনেক।

অইসে ক্রি. বিণ — এইদিক থেকে।

অঁড়কা বি — ছেলে।

অঁড়কাধরা — ছেলেধরা (ক্রি. বি.)।

অকারা — বি. বমি।

অঁঠলা — বি. উনাণের ঢেলা।

অকচক — অব্যয় বিভ্রান্তি।

অকড় বাঁওয়ালি — বি. ভুল কাজ।

অকপক — অব্যয় - অস্থির ভাব।

অকম্‌মা — বিণ. অকর্মণ্য।

অকুড় — বিণ. অসংখ্য।

অকুলান — ক্রি. বিণ. অভাব।

অক্‌খেম — বিণ. অক্ষম।

অকে — সর্ব. ওকে।

অগড় বগড় — ক্রি. বিণ. - আজেবাজে।

অগডং বগডং — ক্রি. বিণ. আজেবাজে।

অগস্তি — বি. মাসের শেষ দিন।

অঘের — বিণ. যাদের আবাস ঘর নাই।

অথা — অব্য সেখানে।

অঘা — বিণ. কুঁজে।

অঘর — বিণ. অচেতন।

অঝা — ওঝা > অঝা বি. কবিরাজ।

অদখুলা — বি. লোভী।

অনহেলা — বি. অবহেলা।

অঝড়া — ক্রি. হজম ।

অঝর — বিণ. অঝোর।

অড় — বি. গাছ (সোনাঝুরি)।

অড়ন — বি. উড়ুনী।

অচম্ভা — ক্রি. বিণ. হঠাৎ।

অচেটা — বিণ. অজ্ঞান।

অচ্ছিতা — বিণ. ছোঁয়াচে।

অছুত — বিণ. অস্পৃশ্য।

অজন — বি. ওজন।

অজ্জ — বিণ. একই রকম।

অজবজ — বিণ. হিজিবিজি।

অঝুড়া — বিণ. আচাঁছা।

অঠে — বি. ঐখানে।

অড়া — বি. কিরা।

অড়াৎ — ক্রিয়া বিণ. শুরু থেকে।

অড়ার — বি. মেষ শিশু (ভেড়া বাচ্চা)।

অথল — বিণ. গভীর।

অদর — বিণ. ভাঙ্গা।

অদাঁতা — বিণ. যার দাঁত বের হয়নি।

অদাশুকা — ক্রিয়া উপুড় করা।

অদিষ্ট — বি. অদৃষ্ট/ভাগ্য।

অধড় — বিণ. আধবুড়ো।

অধুয়া — বিণ. না-ধোয়া।

অধুরা — বিণ. অসম্পূর্ণ।

অনকট — বি. অনেক।

অন্‌তর — বি. মন।

অনা — বিণ. একই রকম।

অনুরাগ — বি. রাগ।

অপরশু — বি. গত দুদিনের আগের দিন।

অপার — বি. ওপার (অন্যপাশে)।

অবগার — বি. ক্ষতি।

অবগুণ্যা — বিশেষণ - নির্গুণ।

অমন — বিণ. এরকম।

অমনেই — ক্রি. বিনা পয়সায়।

অযাত্তা — বি. অশুভ।

অরকি — বি. হাঁড়িয়া, মদ।

অল — অব্য. সম্বোধন বাচক শব্দ।

অল্ — বি. ওল।

অলগা — বিণ. ঢিলা।

অলঢ়া — ক্রি. আরাম করা।

অলমা — ক্রি. মুখে রাগের ছাপ।

অস্‌রা — ক্রি. মারা/করা।

অসান — বিণ. অবশ।

অসিনান — বিণ. স্নান না করা।

অহর ডহর — বি. পথঘাট।

অহাল বহাল — বি. জলাজমি।

অকুড় — বি. অনেক।

অসটা বিশেষণ — ভিত্তিহীন রাগ।

আ

আই — বিণ. মাতামহী।

আইড় — বি. বাঁধ

আগনা — বি. ঘরের উঠোন।

আতর — বি. বাগে ঘোরা।

আল্‌স্য — বিণ. কুঁড়ে।

আনখা — বি. অকারণে রেগে যায় যে।

আড়কাঠলা — বিণ. খুব বড়ো শরীর যার।

আইত — বি. আয়ত্ত।

আইনগা — বি. আঙ্গিনা।

আইঅ — বিণ. আলস্য।

আইস — ক্রি. এসো।

আইজ — বি. আজ।

আইখরত — বিণ. অবিকল।

আইড় — বি. আলের গোড়া।

আইশড় — বি. ঝোপঝাড়।

আইহতি — বি. এয়োতি।

আইক — বি. আখ।

আকপাক — বি. হাঁসফাঁস।

আগলা — ক্রি. আগলে রাখা।

আজড়া — ক্রি. খোলা।

আউল — বি. আলথালু।

আটুপাটু — ক্রি. বিণ. ছটপট।

আউ — বি. আয়ু।

আউগা — ক্রি. এগিয়ে যাও।

আউড়া — ক্রি. উচ্চারণ করা।

আউড়ি — বি. ধান রাখার পাত্র।

আউড়াণ — ক্রি. প্রলাপ বকা।

আউদান — বি. শেষ করে ফেলা।

আগুড় — বি. দরজা বাঁশের কঞ্চি দ্বারা বানানো।

আঢ়া — ক্রি. আদেশ করা।

আসরা — বি. কাঠের উপরিভাগের অংশ।

আউয়াচি — বিণ. আধসেদ্ধ।

আউলা — ক্রি. এলোমেলো করা।

আওয়া — বি. আতপ ধান।

আইঠা — বিণ. উচ্ছিষ্ট।

আঁকড়া — বি. গাছ বিশেষ।

আঁকরা — ক্রি. অঙ্কুর।

আধুয়া — ক্রি. না ধোয়া।

আইশটানি — বিণ. আঁশটে গন্ধ।

আঙাশ — বি. মেটে, কলজে।

আঁকুড়শি — বি. অঙ্কুশিকা > আঁকশি।

আঁগট — বি. পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের পরার অলঙ্কার।

আঁগনি — বি. ঝাঁটা।

আঁচগড়া — বি. উনানশাল।

আঁচড়া — ক্রি. আঁচড়ানো।

আঁজির — বি. পেয়ারা।

আঁটকুঠ্য — বিণ. অস্থির।

আঁটকুড়া — বিণ. অপুত্রক।

আঁটু — বি. হাঁটু।

আঁচড়া — বি. বদরাগী।

আঁড়রা — বিণ. গোঁয়ার, ষাড়ের মতো চিৎকার করে।

আঁত — বি. পেট।

আঁতর — বি. হাল চালানোর রেখা।

আঁতরা — বি. আগুনের পাত্র।

আঁদ — বি. গাড়ির জোয়াল বাঁধার জন্য যে দড়ি ব্যবহার করা হয়।

আঁদাড় পাঁদাড় — বি. ঘরের পিছন দিক।

আঁধুয়া — ক্রি. চোখে হঠাৎ অন্ধকার দেখা।

আঁয়রা — বি. মৃগী রোগ।

আঁল্লা — বিণ. লবনহীন।

আঁঢ়র — বিণ. জেদী।

আঁঢ়রা — বিণ. বদরাগী

আঁত — বি. নাড়ী।

আঁতমরা — বিণ. বদহজমের রোগী।

আঁতড়ি — বি. নাড়িভুঁড়ি।

আঁতর — বি. হালটানার লাঙ্গলের প্রতিটি ভাগ।

আঁতরা — বি. ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য আগুন।

আঁদ — বি. লাঙ্গলকে জোয়ালের সঙ্গে বাঁধার দড়ি।

আঁদড়া — ক্রি. অন্ধের মতো ঠোক্কর খাওয়া।

আঁদাড় পাঁদাড় — বি. ঘরের পেছনের ঝোপঝাড়।

আঁদাড় বাদাড় — বি. ঘরের চারপাশের বেড়া।

আঁদু ছাঁদু — বি. শক্তকরে বাঁধা।

আঁধার্যা — বি. কৃষ্ণপক্ষ।

আক্‌পাক্ — বিণ. হাঁশফাঁশ (শব্দদ্বৈত)।

অকুপাকু — বিণ. হাঁশফাঁশ (শব্দদ্বৈত)।

আঁধারী — বি. অন্ধকার।

আঁধুয়া — ক্রি. অন্ধের মতো।

আঁয়রা — বি. মৃগী রোগ।

আঁহরা — বি. মৃগী।

আঁশ — বি. বৃক্ষ।

আঁহাউঁহু — অব্যয়, গড়িমসি।

আকরা — বিণ. দুর্মূল্য।

আকল — বি. হাতের বা পায়ের চামড়া মোটা ও শক্ত হয়ে যাওয়া।

আকাট — বিণ. মুর্খ।

আকাল — বি. অভাব।

আকুড়শি — বি. আঁকশি।

আকুৎ — বি. আকুতি।

আবাড় — বি. আবদার।

আবাল — বি. নাবালক।

আমবেহা — ক্রি. বিবাহের অনুষ্ঠান।

আমলচাখা — বিণ. অস্থির চিত্ত।

আরিগুরি — বিণ. চালাকি।

আলছা — বি. সদ্যজন্মা শিশু।

আলিত — বি. কচু।

আলনি — বি. গরুর গাড়ির চাকাকে ধরিয়া রাখার খিল।

আলা — বি. আলো।

আলাপালা — বি. পর্যায়ক্রমিক।

আলাসুতা — বিণ. কষ্ট।

আলিঙ্গা — বিণ. ব্যঙ্গ।

আহার — বি. পুকুর।

আলসা — বি. আলস্য।

আলহাবাছা — বিণ. আলাবাছা।

আলাঝালা — বিণ. ক্লান্ত।

আলাবাছা — বিণ. বাছার পর অবশিষ্ট যা থাকে।

আলি — ক্রি. এলাম।

আলিঙ্গা — বি. ব্যঙ্গ।

আলুহা — বিণ. কর্মবিমুখ।

আলুকুড়া — বিণ. অপদার্থ।

আশ — বি. আশা।

আশকা — বি. পিঠে বিশেষ।

আষাঢ়ী — বিণ. আষাড় মাসের অনুষ্ঠান।

আসতা — বি. গাছ বিশেষ।

আসন — বি. গাছ বিশেষ।

আসরা — বি. ফাঁকা।

আহটা — বি. ধমক দেওয়া।

আহড় — বি. আড়াল।

ই

ই — সর্বনাম, এই।

ইআকে — একে।

ইয়ায় — সর্ব. এতে।

ইয়ার — এর।

ইয়ারাকে — এরাকে।

ইংতা — ক্রি. ইঙ্গিত করা।

ইঃ — অব্যয়, বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

ইতি — বি. শষ্য রক্ষার অনুষ্ঠান।

ইঁরো — ক্রি. কোনো জিনিস।

ইঁচ্‌লা — বি. চিংড়ি মাছ।

ইঁড়রা — ক্রি. রাগের দৃষ্টিতে দেখা।

ইঁদ — বি. ভাদ্র একাদশীর ঝাড়খন্ডী উৎসব।

ইঁধে — সর্ব. এদিকে।

ইখান — বি. এই জায়গা।

ইগলা — সর্ব. এগুলো।

ইগলাকে — সর্ব. এ গুলোকে।

ইগা — সর্ব. এগুলো

ইগাকে — সর্ব. এগুলোকে।

ইগার — সর্ব. এগুলোর।

ইগিনা — সর্ব. এগুলো।

ইগির-জিগির — বি. জিগিরের অনুকার।

ইড়িক চিড়িক — বি. ঝিলমিল।

ইচপিচ — বি. পেট গুলানো।

ইঝল — বি. সমান।

ইটা — সর্বনাম, এটা।

ইঠকে — সর্ব. এদিকে।

ইত — বি. এত।

ইতুটুকু — বিণ. ক্ষুদ্র।

ইয়ারকি — বি. তামাশা।

ইরাইরি — বি. রেষারেষি।

ইলিক — বি. চিহ্ন বিশেষ।

ইলিঙ্গা — বি. ব্যঙ্গ।

ইসতিস — সর্ব. এটাওটা।

ইহেই — সর্ব. বিণ. এইই।

ইঁঝল — বি. উজ্জ্বল।

উ

উ — বি. কুরকুট (এক প্রকার লাল রঙের টক পিঁপড়ে)।

উআকে — সর্ব. ওকে।

উআর — সর্ব. ওর।

উআদের — সর্ব. ওদের।

উই — বি. পোকা বিশেষ।

উঁচ — বিণ. উঁচু।

উঝট — বি. হোঁচট।

উঁদুর — বি. ইঁদুর।

উঁধি — বি. পিঠা বিশেষ।

উঁধু — সর্বনাম, তল বিশেষ।

উইমেকা — বিণ. উই-এর ঢিপি।

উকপুকা — ক্রিয়া, অস্থির হওয়া।

উকান — বি. জমির জল বর করার পথ।

উকুডুবু — বি. হাবুডুবু।

উখন — বি. খড়ের গাদা নাড়াচাড়া করার আঁকশি।

উখুন — বি. উকুন।

উখড়া — ক্রি. উপড়ে ফেলা।

উখয়্যা — বি. অত্যাচারী।

উখাডুবা — বিণ. হুলুস্থুল।

উখাল — বি. দন্ত দেখানো।

উখুল — বি. উখালি।

উখেন — বি. ওখান।

উগিলা — সর্ব. ওগুলো।

উগিলার — সর্ব. ও গুলোর।

উঘা — বি. লোহার জিনিসকে ধার করার দন্ড।

উচকা — ক্রি. উঁচু করে তুলে ধরা।

উচার — বি. জায়গা বদল।

উচিৎ — বিণ. ঠিক।

উছলা — ক্রি. ভর্তি হয়ে উপচে পড়া।

উছুল — বিণ. কানায় কানায় ভর্তি।

উচ্ছন্যা — বিণ. বরবাদ হয়েছে এমন লোক।

উজড় — বি. ধ্বংশ।

উজড়া — ক্রি. ধ্বংস করা।

উজবক — বিণ. নির্বোধ।

উজা — বিণ. সোজা।

উজান — বিণ. সোজাসুজি।

উজানিয়া — বিণ. স্রোতমুখগামি।

উঝল-পাঝল — ক্রি. বি. এলোমেলো।

উজু — বিণ. সোজা।

উঝট — বি. হোঁচট।

উঝড় — বি. উজড়।

উটকা — ক্রি. হঠাৎ করে অনপ্রিভেত ঝামেলা।

উজড় < উজাড় — উচ্ছেদ / পরিস্কার করা।

উদমা — উলঙ্গ।

ক

কটা — ধান সেদ্ধ।

কহরি — খিচুড়ি।

কাতা — কিনারা।

কাঁদাল — দেওয়ালের নিচের অংশ।

কামিন < কামিনী — মহিলা শ্রমিক।

কাল্হা — ঠান্ডা।

কাঁয়া — প্যাচালো ব্যক্তি।

কুইলা — কালো।

কেরেকাট — সম্পর্কচ্ছেদ।

খ

খর অ — ঢালু।

খরমেসা — পাঁচমিশালি।

খাতা — সারিসারি।

খড়রা — ফাঁকা।

খিজা — বেশী ব্যবহারে সরু।

খেড়ি — খেলার সাথী।

খ্যাদা — তাড়ানো।

খখরা — ফাঁকা।

গ

গইড়া — অলস।

গড় গড়্যান — ঢালু।

গগান্ — চিৎকার।

গতর — শরীর।

গলা — মনিব।

গঁড়রা — পা দিয়ে লাথি মারা।

গাজাড় — ঝোপঝাড়।

গাইজে — অনেক।

গাঢ় — গর্ত।

গাদুল — প্রচুর লোক একত্রিত।

গাঁওলি — গ্রামীণ।

গিলা — অধিক সেদ্ধ।

গুফা — অলস।

গুমা — খারাপ বা নষ্ট হওয়ার গন্ধ।

গুমসা — গুমোট।

ঘ

ঘইলটে — উল্টে।

ঘাগরা — ঝর্ণা।

ঘুগী — বাঁশের তৈরি মাছ ধরার এক প্রকার জাল।

ঘং — পাতার তৈরি দেহ আবরণ।

ঘংটা — ঘোমটা বিঃ (স্ত্রীলোকের মাথা ঢাকা দেওয়া)।

ঘগু — ঘুঘু, বি.।

ঘাই — জমিতে জল নিষ্কাষণের পথ।

ঘাগ্ — ঝর্ণা।

ঘিগান — মকর সংক্রান্তির একদিন পর।

ঘুনসি — কোমরের দড়ি।

ঘুনি — বাঁশ দিয়ে তৈরী মাছ ধরার পাত্র।

ঘুরঘুর‍্যা — পোকা বিশেষ।

ঘুঁপুর — শুকর।

ঘুঁসুরা — শুকরের মতো অপরিষ্কার।

ঘেঁচ — ঘন (বিণ)।

ঘইড় — বি. গোড়া।

ঘইড়া — বি. গাড়িতে কাঠ তোলার জন্য বাবহৃত কাঠ।

ঘঁঘা — বি. গেঁড়া (বড় শামুক)।

ঘঁষড়া — ক্রিয়া, মাটির উপর টেনে নিয়ে যাওয়া।

ঘটি — বি. জলের পাত্র।

ঘড়ঘড়ি — বি. কপিকল।

ঘড়রা — ক্রি. নাক ডাকা।

ঘররা — ক্রি. দড়িতে পাক দেওয়া।

ঘলটা — ক্রি. গড়াগড়ি দেওয়া।

ঘসকা — ক্রি. সরে যাওয়া।

ঘাঁগরি — বি. ঘাগরা।

ঘাঁজুয়া — বি. পয়সা রাখার ছোট থলি।

ঘাঁটি — বি. পেতলের ছোট ঘন্টা।

ঘাল — বিণ. ঘায়েল।

ঘামচি — বি. ঘামাচি।

ঘিঁচা — ক্রি. ছুঁড়ে ফেলা।

ঘিঁষ্টা — বিণ. নোংরা।

ঘিকাল্লা — বি. কাঁকরোল।

ঘিনঘিনা — বিণ. ঘৃণার ভাব অনুভব করা।

ঘুঁটা — ক্রি. পেষানো (পেষাই করা)।

ঘুঁসা — বি. কিল।

ঘুঁইনা — বি. মাছ ধরার ফাঁদ।

ঘুননি — বি. ঘুর্ণি।

ঘুপচি ঘুরান — ক্রি. মাথা ফাটিয়ে দেওয়া।

ঘুরৎ — বি. ফেরৎ।

ঘুরন — বি. ঘুরপাক।

ঘুরা — ক্রি. ফেরা।

ঘুরেবুলা — ক্রি. ঘুরে বেড়ানো।

ঘুরাট — বিণ. বাঁকা পথ।

ঘেঁগা — ক্রি. গোঙানো।

ঘেঁজড় — বিণ. বিধ্বস্ত।

ঘেঁষা — ক্রি. ঝুঁয়ে থাকা।

ঘেরাট — বি. ঘিরে থাকা।

চ

চ — ক্রি. চল।

চঁইদা — বিণ. চোখ থাকতেও ভুল করা।

চুঁওয়া — ক্রি. আধ পোড়া।

চঁগ — ক্রি. এদিক সেদিক দিগভ্রান্তের মতো ঘোরা।

চঁগুয়া — বিণ. খেয়াল।

চঁচ — বি. বাঁশের সরু কাঠি।

চঁচলা — বি. ছল।

চঁটরা — ক্রি. পাছা ঘসড়ানো।

চঁটা — বি. হাতে পাকানো শালপাতার বিড়ি।

চঁটি — বি. চুড়ুই পাখি।

চঁথা — বি. তুচ্ছ।

চঁইথা — বিণ. কৃপণ।

চঁয়দা — বিণ. খিটখিটে।

চঁইট — বি. উজ্জ্বল।

চঁহর — বি. চামর।

চঁইরা — ক্রি. মাটির উপর টানা।

চঁহরি — বি. মেয়েদের চুল বাঁধার কালো দড়ি।

চং — বি. বাতিক।

চং — বি. ঘুড়ি।

চখ — বি. চোখ।

চইৎ — বি. চৈত্রমাস।

চউকিদার — বি. পাহারাদার।

চটকা — ক্রি. চটকানো।

চকল — বিণ. চুপসানো।

চকলা — বি. খোসা।

চকলি — বি. পিঠে।

চকা — বি. খোসা।

চকোর — বি. মোটা আটা।

চখ — বিণ. ধারালো।

চথা — বিণ. ধারালো।

চঘা — ক্রি. আরোহণ।

চঙ — বি. বাতিক।

চচ্চা — বি. আলোচনা।

চজ — বি. যত্ন।

চট — ক্রি. তাড়াতাড়ি।

চটকা — ক্রি. হাত বা পা দিয়ে মাড়ানো।

চড়কা — বি. বাজ।

চড়চড়ি — বি. চচ্চড়ি।

চড়া — ক্রি. চড় মারা।

চঢ়া — ক্রি. বেশি দাম।

চদু — বিণ. বোকা।

চনকা — ক্রি. চকচক করা।

চপড় — বিণ. বাতাস শূন্য।

চপরা — বিণ. শাঁস বিহিন।

চপসা — বিণ. স্বাদহীন।

চবচব্যা — বিণ. সিক্ত।

চভ — অব্যয়, নুড়ি ইত্যাদির জলে পড়ার শব্দ।

চভলাং — অব্য. জলে ঝাঁপ দেবার শব্দ।

চমকা — ক্রি. ভড়কে যাওয়া।

চরখি — বি. চরকার মতো ঘোরা।

চরট — বি. গোচারণের স্থান।

চরয়্যা — বিণ. মাঠে ঘাস খাওয়া।

চরহই — বি. চার খেই যুক্ত দড়ি।

চরহা — বি. চোর স্বভাবের।

চরাবাতি — বি. টর্চলাইট।

চলন — বি. চলার ভঙ্গি।

চহাড় — বি. চোয়াল।

চাঁখর — বি. বুড়ো ও কড়ে আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য।

চাঁচ — বি. বাঁশের পাতি দিয়ে তৈরি।

চাঁড় — ক্রি. শীঘ্র।

চাঁড়রা — বিণ. মুণ্ডিত মস্তক।

চাইচুগুল — বি. পরনিন্দা।

চাভলা — ক্রি. দাঁত বিহিন মুখে চিবানো।

চাওয়া — ক্রি. তাকানো।

চাঁবর — বি. চামর।

চাকব্যা — বিণ. চাকরবৃত্তি।

চামট্যা — বিণ. চর্মসার।

চাল — বি. চলন।

চাইচুগুল — বি. পরনিন্দা।

চাপড়া — বি. মাটির চাঙড়।

চাবকা — বি. চাবুক।

চাবলা — ক্রি. চিবানো।

চাকলা — বি. বাকল।

চিকি — বি. কড়ি।

চিটচিটা — বিণ. আঠালো।

চিটা — বি. এঁটেল মাটি।

চিড়কা — ক্রি. ঝিলিক মারা।

চিড়চিড়ি — বি. বন্য গাছ।

চিনহা — বি. দাগ।

চিপকা — ক্রি. নিগড়ানো।

চিমড় — বিণ. ভাঙ্গা শক্ত এমন।

চিয়ড় — বি. বন্য লতা।

চুটা — বি. নেংটি ইঁদুর।

চুনকু — বি. ছোট।

ছ

ছ — সংখ্যা, (বি. নাচ)

ছঁওকা — ক্রি. সাঁতলানো।

ছঁচ — বি. গোবর গোলা জল।

ছঁচরা — বিণ. লোভী।

ছঁচা — ক্রি. জলশৌচ।

ছঁড় — বিণ. অনাথ।

ছওয়া — বি. বাদুড়।

ছকরা — বি. উঠতি যুবক।

ছকা — ক্রি. ছককাটা।

ছট — বিণ. ছোট।

ছড় — বিণ. কানঘেঁষা।

ছড়রা — বি. বন্দুকের গুলি।

ছড়া — ক্রি. ছড়ানো।

ছতিছিন্ন — ক্রি. ছিন্নভিন্ন।

ছরকূট — বিণ. নষ্ট।

ছলকা — ক্রি. পিছনে যাওয়া।

ছাঁকা — ক্রি. জল থেকে তোলা।

ছাঁচি — বিণ. দেশী।

ছাঁচা — ঘরের জল পড়ার নিম্নভাগ।

ছাঁদা — ক্রি. কাপড় পেতে আটকানো।

ছাণ — বি. ঘরের চাল।

ছাইক — বি. ছায়া।

ছাওয়াতি — বিণ. প্রসূতি।

ছাড় — বি. খোঁয়াড়।

ছাতা — বি. ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত ঝাড়খন্ডী পরব।

ছাতু — বি. ছত্রাক।

ছানি — বি. ছোট করে খড় কাটা।

ছাপ — বি. দাগ।

ছাপা — ক্রি. দাগ দেওয়া।

ছাপু — বিণ. গোপন।

ছামড়া — বি. ছাঁদনাতলা।

ছালি — বি. দুধের সর।

ছিঁচা — ক্রি. জলসেচ করা।

ছিটা — ক্রি. দুধ ফেটে যাওয়া।

ছিটকা — ক্রি. ছিটানো।

ছিটকা — বি. হুড়কা।

ছিপকণা — বি. জলের ছিঁটে।

ছিপা — ক্রি. লুকানো।

ছিপি — বি. বোতলের ঢাকনা।

ছিয়া — বি. ফালি।

ছিরকা — ক্রি. পাতলা মলত্যাগ করা।

ছুঁইমুই — বি. লজ্জাবতী লতা।

ছুৎ — বি. অশৌচ।

ছেঁচা — ক্রি. জলসেচ।

ছেড়ি — বি. ছাগল।

ছেপ — বি. থুথু।

ছোয়াড়ি — বি. ঝুমুরের তাল।

জ

জ — বি. যব শস্য।

জইড় — বি. অশ্বত্থ।

জইড় — বি. ছোট নদী।

জওয়া — ক্রি. গাছের আঠালো রস।

জট — বি. পাকানো গিট।

জঁদা — বি. কালো পিঁপড়ে।

জগা — ক্রি. সামলে রাখা।

জজ — বি. তেঁতুলগাছ।

জনহার — বি. ভুট্টা।

জবরা — বি. আবর্জনা।

জরক — বি. ভিজে।

জরকজঁদা — বিণ. আদ্র।

জরকা — বি. মোষের গলায় ঝোলানো কাঠ।

জলই — বি. পেরেক।

জলহা — বি. মুসলমান।

জহৎ — বি. সুবিধা।

জাঁকা — ক্রি. চাপ দেওয়া।

জাংরা — বি. ক্ষমতা।

জাড় — বি. ঠাণ্ডা।

জাত — বি. মনসামঙ্গলের গান।

জানুম — বি. কাঁটা।

জাবকা — ক্রি. চাপা দেওয়া।

জামির — বি. টক লেবু।

জারা — বি. কলাই।

জানি — বি. কচি ফল।

জিয়া — বিণ. জীবন্ত।

জিরা — ক্রি. বিশ্রাম।

জিরিং — বিণ. লম্বা।

জুঁঠা — বি. সকড়ি।

জুড়্যা — বি. ঠাণ্ডা।

জুড়্যা — বি. জুড়ে দেওয়া।

জুটা — ক্রি. যোগাড়।

জুবা — ক্রি. কাজ করা।

জুমড়া — বি. জ্বলন্ত কাঠ।

জুঁহা — বি. গরুর গাড়ির জোয়াল।

জেপর — বিণ. ভেজা।

জোত — বি. জোয়ালের সঙ্গে বাঁধা দাড়।

ঝ

ঝঁকর — বিণ. ভারের জন্য নুয়ে পড়া।

ঝঁকা — বি. থোকা।

ঝঁগল — বিণ. মাপের চেয়ে বড়।

ঝঁট — ক্রি. শীঘ্র।

ঝঁপর — বিণ. ভারে ঝুঁকে পড়া।

ঝঁপা — বি. থোকা।

ঝকমারি — বিণ. বিরক্তিকর।

ঝট — ক্রি. তাড়াতাড়ি।

ঝড়া — বি. বড় ঝুড়ি।

ঝইড়া — বি. এক নাগাড়ে বৃষ্টি।

ঝণকা — বি. গরুর বাত রোগ।

ঝরকা — বি. জানালা।

ঝরা — ক্রি. বৃষ্টিপাত হওয়া।

ঝলক — ক্রি. ঝলসে ওঠা।

ঝলা — বি. আগুনের তাপ।

ঝাঁট — বি. পরিমার্জন।

ঝাগড় — বিণ. লম্বোদর।

ঝাপড়া — বিণ. এলোমেলো ভরা।

ঝাঁউরা — ক্রি. এলিয়ে যাওয়া।

ঝাঁজ — বি. জ্বলন।

ঝাঁপ — বি. লাফ।

ঝাপান — বি. গরুর গাড়ির ুপর সাপের খেলা।

ঝাড় — বি. ঝোপ।

ঝারি — বি. গড়ু।

ঝিকা — ক্রি. হ্যাঁচড়ানো।

ঝিটাস — বি. বৃষ্টির ছাট।

ঝিলপি — বি. জিলিপি।

ঝুকা — বি. বাঁকা।

ঝুড়া — ক্রি. ডাল থেকে পাতা কেটে বাদ দেওয়া।

ঝুমরা — ক্রি. গাছপালা নিস্তেজ হওয়া।

ঝেটাম — বি. ঘরের ছাউনির কাঠামো।

ট

ট — নির্দেশক প্রত্যয় (পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এবং বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত)।

টকা — বি. চুপড়ি।

টটা — বি. গলা।

টঁটা — বি. গুলি।

টং — বি. পায়রা থাকার হাড়ি।

টগ — বি. ডগা।

টপ — বি. তাড়াতাড়ি।

টপ্‌না — বি. লোহাকে ছিদ্র করার যন্ত্র।

টসকা — ক্রি. ঝরে পড়া।

টাঁড় — বি. ঘাসহীন জমি।

টকরা — বি. টুকুরো ধানি ক্ষেত।

টপ — বি. ফোঁটা।

টাঁগা — ক্রি. ঝোলানো।

টাঁগি — বি. অস্ত্র বিশেষ।

টাটকা — ক্রি. হাসা বা কাঁদার সময় সাময়িক দমবন্ধ হওয়া।

টানুয়া — বিণ. রসবিনীন।

টিগড়া — ক্রি. গোড়ালির উপর ভর দিয় দাঁড়ানো।

টিকজলনি — বিণ. ক্রোধ সৃষ্টিকারী।

টিপকা — বিণ. খুব ছোট।

টিরা — বিণ. খর্বাকৃতি, বেঁটে।

টুকি — বি. বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি ছোট ডালি।

টুণা — বি. রোগা।

টুরা — বিণ. বেঁটে।

টেঁড়া — বি. কুয়ো থেকে জল তোলার উপকরণ।

টেংরা — বিণ. বদরাগী।

টেনা — বি. ছেঁড়া কাপড়।

টেরি — বি. সিঁথি।

টেহনি — বি. কণুই।

টোক — বি. চাউনি।

টোল — বি. বালতি।

টোলা — বি. মহল্লা।

ঠ

ঠঁগা — বি. ঠোঙা।

ঠড়কা — বি. গরুর গলার কাষ্ঠ খন্টা।

ঠনক — বিণ. শুষ্ক।

ঠাঁটা — ক্রি. শক্ত হওয়া।

ঠাউকা — বি. ধীর গতি।

ঠাউরা — ক্রি. স্মরণ করা।

ঠাওয়া — ক্রি. অপেক্ষা করা।

ঠাট — বি. মিথ্যা সাজ।

ঠার — বি. ঈশারা।

ঠাহর — বি. স্মরণ।

ঠিট্টিলি — বি. তামাসা।

ঠিটুয়া — ক্রি. শীতে কাঁপা।

ঠুঁট — বি. গাছের মুড়ানো অংশ।

ঠুঁটা — বি. কুষ্ঠরোগ।

ঠুমপু — বিণ. বেঁটে।

ঠেঁগা — বি. লাঠি।

ঠেঁটরা — বিণ. নির্লজ্জ।

ঠেঁটি — বিণ. দুশ্চরিত্রা।

ঠের — বি. বজ্র।

ড

ডঁকাখাড় — বি. উভয় সংকট।

ডঁগি — বি. মাছি।

ডঁড় — বি. জরিমানা।

ডকাখাড় — বি. অনাহার।

ডগর — বি. সন্ধান।

ডবকা — বি. ধান ক্ষেতের জমা জল।

ডাঁগ — বি. গাদা।

ডাঁগরা — ক্রি. লাঠিপেটা করা।

ডাঁটা — বি. খাড়া।

ডাঁশ — বি. মাছি বিশেষ।

ডাঁশরা — বিণ. আধপাকা।

ডাংরা — বি. বলদ-গরু।

ডাকুর — বি. মাকড়সা।

ডাটম — বি. হাতা।

ডাহা — বি. বড় কাল পিঁপড়ে।

ডিগর — বিণ. দুষ্ট।

ডিঙ্গর — বিণ. তামাসা প্রিয়।

ডুংরি — বি. ছোট পাহাড়।

ডুভা — বি. বড় বাটি।

ডুভি — বি. ছোট বাটি।

ডরা — বি. বাসা (অস্থায়ি)।

ঢ

ঢঁড় — বি. সাপ।

টঁড়র — বিণ. শূন্য।

টঁঢ়র — বি. কোঠর।

ঢং — বি. গড়ন।

ঢকড়া — বিণ. বৃদ্ধ।

ঢড়া — বি. গর্ত।

ঢলকা — ক্রি. কানায় কানায় ভর্তি।

টাঁগড় — বি. ভৃত্য।

টাঁপ — বি. ধাপ্পা।

টাঁকা — বি. মাছি।

ঢাকল — বিণ. মস্ত।

ঢাপরা — বিণ. বড়।

টিঁপরা — বিণ. মোটা।

টিপা — ক্রি. প্রহার।

টিপি — বি. উঁচু জায়গা।

টিসি — বিণ. অলস।

ঢুস — বি. হোঁচট।

ঢেঁকশাল — বি. ঢেঁকিঘর।

ঢের — ক্রি. বিণ. অনেক।

ঢেঁগা — বি. লম্বা।

ঢেমন — বিণ. দুষ্টু।

ত

তক — অব্যয়, অবধি।

তড় — বি. বিলম্ব।

তড়কচ্যা — বিণ. অসমান।

তড়পা — ক্রি. লাফানো।

তড়রা — ক্রি. পিছলে যাওয়া।

ততকে — ক্রি. বিণ. তখন।

ততড়া — বিণ. তোতলা।

তরফ — বি. এলাকা।

তরসা — ক্রি. ধমকানো।

তরস্তরি — বি. তাড়াহুড়ো।

তরিবৎ — বি. আয়োজন।

তলান — বি. কবিরাজি ঔষধের জড়িবুটি।

তাক — বি. লক্ষ্য।

তাড়া — ক্রি. খনন করা।

তাতা — বিণ. গরম।

তিক — বি. লক্ষ্য।

তিড়কা — ক্রি. রেগে ওঠা।

তিয়ন — বি. তরকারি।

তিরপিন্ডা — বিণ. শয়তান।

তিরসা — বি. তৃষ্ণা।

তিরি — বি. প্রণয়ী।

তিরিং লিংগা — বিণ. লম্বা।

তুপা — ক্রি. মাটিতে পোঁতা।

তুবা — বিণ. ফোলা ফোলা।

তুরি — বি. বাঁশি।

তেঁতরা — ক্রি. সেবাযত্ন করা।

তেলাই — বি. দালাই।

তালাই — বি. খেজুরের পাতার আসন।

থ

থঁকা — বি. গুচ্ছ।

থঁতা — বি. ভোঁতা।

থঁকা — বি. থোকা।

থকা — ক্রি. ক্লান্ত।

থড়রা — ক্রি. পা পিছল যাওয়া।

থপড় — বিণ. শক্তিহীন।

থপনা — বি. স্তবক।

থবড় — বিণ. ভোতা।

থরপ — বিণ. শক্তিহীন।

থলবল — অব্য. পূর্ণগর্ভ।

থসড়া — বি. আছাড়।

থাই — বিণ. টেঁকসই।

থান — বি. দেবস্থান।

থাসা — ক্রি. মাটিতে আছাড় মারা।

থিতা — ক্রি. স্থির করা।

থুতকুড়ি — বিণ. লালায় ভরা।

দ

দঁক — বি. পাঁক।

দঁড়কা — বি. দৌড়ানো।

দকড়-কচা — বিণ. আধপোড়া।

দহলা — বিণ. কথার খেলাপ করে যে।

দড়খড়সা — বিণ. অসমতল।

দন — বি. গরুর খাবার জায়গা।

দবকা — ক্রি. লাল হয় ওঠা।

দসতক — ক্রি. বিণ. প্রচুর।

দরকা — ক্রি. ফেটে যাওয়া।

দরা — বি. খুদ।

দলকা — ক্রি. কাঁপানো।

দহ — বি. নদীর যে জায়গা গভীর জলপূর্ণ।

দহরি — বি. চাদর।

দাঁসাই — বি. সাঁওতালি নাচ।

দাকা — বি. ভাত।

দাগা — ক্রি. দাগ দেওয়া।

দাপন — বি. মোটা ছুঁচ।

দাফনা — বি. বগল।

দামড়া — বিণ. খাঁসু।

দারু — বি. মদ।

দারে — বি. গাছ।

দিকু — বিণ. বহিরাগত।

দিগার — বি. রাজভৃত্য।

দিরি — বি. পাথর।

দিশুয়া — বিণ. দেশের।

দুধি — বি. বুনোলতা।

দুমা — বি. গাদা।

দেদার — ক্রি. বিণ. প্রচুর।

ধ

ধ — বি. বৃক্ষ।

ধকড় — বি. পুরানো কাপড়।

ধজ — বি. চূড়া।

ধড়কা — ক্রি. ভেঙে পড়া।

ধড়া — বি. গর্ত।

ধদর — বিণ. পচা।

ধননা — বি. কড়ি (বরগা)।

ধমসা — বি. লাগড়া।

ধরতা — বি. দোহার।

ধরাটি — বি. সুদ।

ধাঁগড় — বি. ভাতুয়া বাগাল।

ধাঁসনা — বি. চোরাবালি।

ধাঁসা — ক্রি. আগুনে ছ্যাঁকা।

ধাদরা — বিণ. কুঞ্চিত।

ধাদস — বি. সাহস।

ধাপা — ক্রি. ঢাকা দেওয়া।

ধুঁকা — বি. গরম বাতাস।

ধুরুকধুসা — বিণ. নোংরা।

ধুর — বি. দূর।

ধুমকুম — বি. বেধড়ক প্রহার।

ধুয়া — বি. ঝাড়খন্ডী গানের শ্রেণী বিশেষ।

ধেণু — বি. গরু।

ন

নউজা — ক্রি. নুয়ে পড়া।

নক — বি. নখ।

নধা — বি. লোধা।

নাগর — বি. নাচনী নাচের রসিক।

নাটক্যা — বি. নাড়ি।

নামাল — বিণ. নিচু ভূমি।

নাশনগাড়া — ক্রি. অন্যের অমঙ্গলের জন্য তুকতাক।

নিকম — বিণ. নিকৃষ্ট।

নিজোর — বিণ. শক্তিহীন।

নিড়া — ক্রি. পরিষ্কার করা।

নিয়াঁই — বি. ঝগড়া।

নুন — বি. লবন।

নেংড়া — বিণ. ল্যাংড়া।

নেকের পেকের — বিণ. লিকলিকে।

নেগা — বি. বাম।

নেগুড় — বি. লেজ।

নেঢ়ি — বি. পাছা।

নেতড়া — ক্রি. ছুঁয়ে যাওয়া।

নেদা — বি. তলানি।

নেহর — বি. বাপেরবাড়ি।

প

প — বি. সুলক্ষণ।

পঁইচা — বি. অলঙ্কার।

পঁগা — সদ্য বের হওয়া পাতা।

পঁটা — বি. নাড়িভুঁড়ি।

পঁড়চা — বি. ধনুকের ছিলা।

পঁঠা — বি. গরুর গাড়ির চাকার অংশ বিশেষ।

পটা — ক্রি. ভাবসাব করা।

পত্যা — ক্রি. বিশ্বাস করা।

পসত্যা — বি. অত্যাধিক ধূমপান করা।

পইট — বি. সম্ভার।

পইন — বি. ছোট লাঠি।

পক্ত — বিণ. শক্ত।

পগার — বি. কাঁটা জাতীয় গাছ।

পটর — বিণ. খর্বকায়।

পয়না — বি. গোচারণের লাঠি।

পরকিৎ — বি. স্বভাব।

পরব — বি. উৎসব।

পলহই — বি. ধাঁধা।

পশ্য — বি. ভাব।

পলু — বিণ. ভীতু।

পসিন — বি. অনুমান।

পাঁজ — বি. পায়ের চিহ্ন।

পাঁড়কা — বিণ. ধূসর।

পাঁড়রা — বিণ. ফ্যাকাসে।

পাঁচন — বি. গরু চরানোর লাঠি।

পাঁতড়া — ক্রি. খোঁজা।

পাঁদাড় — বি. ঘরের পিছন দিক।

পাইট — বি. কাজ।

পাইরা — ক্রি. পেরুনো।

পাওরা — বি. মদ।

পাখাল — বি. ভেজানো ভাত।

পাঘরা — বি. কানের অলঙ্কার।

পাছড়া — ক্রি. কুলোতে ধান পরিষ্কার।

পাড়ন — বি. মাচার মত বেদী।

পাতড়া — বি. বন।

পানিয়া — বি. চিরুনি।

পান্‌হা — বি. আখের রস।

পালই — বি. খড়ের স্তুপ।

পালা — বি. পাতা।

পাহি — বি. মাঠ।

পাহুড় — বিণ. পরাজিত।

পিঁড়া — বি. দাওয়া।

পিচকা — ক্রি. ফস্কে যাওয়া।

পিটা — ক্রি. মারা।

পুদকা — ক্রি. গরম জল ফোটা।

পুয়াতি — বিণ. প্রসূতি।

পুয়ান — বি. কুমোরের হাঁড়ি পোড়ানোর জায়গা।

পুয়াল — বি. খড়।

পুলকা — ক্রি. উৎসাহিত করা।

পেঁদ — বি. মিথ্যা কথা।

পেঁঘা — বি. অজুহাত।

পেটরা — বিণ. ভুঁড়িযুক্ত।

পেলু — বিণ. ভীতু।

ফ

ফঁটা — বি. বিন্দু।

ফঁপা — ক্রি. ফোঁপানো।

ফচ — বিণ. পরিষ্কার।

ফরকাল — বি. নৃত্য বিশেষ।

ফকট — বিণ. ফাউ।

ফকড়ামি — বি. শয়তানি।

ফকি — বি. আগড়া।

ফহুল — বি. ছিক।

ফজির — বি. সকাল।

ফড় — বি. ছিদ্র।

ফড়ই — বি. ধাঁধা।

ফড়কা — ক্রি. ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো।

ফতুয়া — বি. হাতকাটা জামা।

ফদর ফদর — অব্য. বকবক।

ফদি — বি. কাঠের বল।

ফম — বি. স্মরণ।

ফরক — বি. পার্থক্য।

ফরকা — ক্রি. ছড়ানো।

ফসকা — বিণ. শিথিল।

ফসড় — বিণ. পরাজিত।

ফাট — বি. দন্ত।

ফাইদল — বিণ. খোলামেলা।

ফাড়া — ক্রি. চেরাই।

ফাবড় — বি. ঢিল।

ফারচা — বিণ. পরিষ্কার।

ফিকা — বি. নিক্ষেপ।

ফিরকা — ক্রি. উড়া।

ফুটানি — বি. অহঙ্কার।

ফুদুক — অব্য. পাউডারের মতো।

ফুলাম — বিণ. ফুলের গন্ধযুক্ত সুগন্ধী।

ফেঁকড়া — বি. খুঁত।

ফেঁকা — ক্রি. ছুড়া।

ফেততা — বিণ. ফেরৎ।

ফেণি — বি. ফেনা।

ব

বঁক — বি. বোঁটা।

বঁগা — বি. দেবতা।

বঁটা — বি. লাঙলের হাতল।

বাঁঠন — বি. বাঁটি।

বঁদা — বি. প্রিয়জন।

বইরাত — বি. বরযাত্রী।

বগড়া — বিণ.

বজড় — বি. চোট।

বড় — বি. বটবৃক্ষ।

বতর — বিণ. ঠিক সময়।

বদা — বি. পাঁঠা।

বনা — ক্রি. কাটা।

বয়ার — বিণ. উন্মত্ত।

বরই — বি. দড়ি।

বরা — বি. শুয়োর।

বহড়ি — বি. পুত্রবধূ।

বহরা — বি. কালা।

বহুত — বিণ. অনেক।

বাঁউরা — ক্রি. এলোমেলোভাবে ঘোরা লোক।

বাঁঝ — বিণ. বন্ধ্যা।

বাড় — বি. বৃদ্ধি।

বাইরা — ক্রি. বেরুনো।

বাখনা — ক্রি. গাল দেওয়া।

বাখার — বি. শিকার।

বাদ — বি. শত্রুতা।

বাদাবাদি — বি. রেষারেষি।

বাদুর‍্যা — ক্রি. গাছের বৃদ্ধি রোধ।

বানুয়া — বি. গাছ।

বাপড়া — বিণ. বেচারা।

বাপলা — বি. আনুষ্ঠানিক বিয়ে।

বাবদিয়া — বি. দোষারোপ।

বায়া — বিণ. পাগল।

বায়েন — বিণ. বাদক।

বারণ — বি. নিষেধ।

বাস্যাম — বি. বাসি ভাত।

বাহণি — বি. পরিশ্রম।

বিচা — ক্রি. ছুঁড়ে দেওয়া।

বিঁড়ি — বি. হাড়ি কলসি রাখার খড়ের তৈরি।

বিঁদ — বি. ছিদ্র।

বিখরা — ক্রি. ছড়িয়ে দেওয়া।

বিতা — ক্রি. পার হওয়া।

বিদরা — ক্রি. ফেটে যাওয়া।

বিরুন — বি. ঘূর্ণিঝড়।

বিলাতি — বি. টমেটো।

বুগলি — বি. থলে।

বুট — বি. ছোলা।

বতরু — বি. ছোট ছেলে।

বুয়ড — বি. শিংযুক্ত শিয়াল।

বুয়াসিন — বি. ছোট ভায়ের বৌ।

বুরু — বি. পাহাড়।

বুলান — বি. জমির উপর জল যাওয়া।

বুলুং — বি. লবন।

বেঁট — বি. হাতল।

বেঁট — বি. স্তনবৃন্ত।

বেঁত — বি. মুখ।

বেগার — বি. মজুরির পরিবর্তে ভাত খাওয়া।

বেজ — বি. জট।

বেঠনা — বি. মিথ্যাকথা।

বেধুয়া — বিণ. জারজ।

বেহন্ম — বিণ. কর্মহীন।

বেহেট — বিণ. বুদ্ধিহীন।

বোঙ্গা — বি. দেবতা।

ভ

ভঁকা — ক্রি. ছুরি দিয়ে আঘাত করা।

ভঁগর — বিণ. ছিদ্রযুক্ত।

ভঁজা — ক্রি. ভোগ করা।

ভঁট — বিণ. মোটা বুদ্ধিযুক্ত।

ভঁড়া — বি. কলাগাছের পুল।

ভঁতড়া — বিণ. ভোঁতা।

ভঁদা — বিণ. বোকা।

ভক — বি. খিদে।

ভগা — বিণ. মোটা।

ভজকট — বি. ঝুটঝামেলা।

ভদকা — ক্রি. জলে ভিজে।

ভদরভং — বি. ছিদ্রযুক্ত।

ভদস — বিণ. অত্যন্ত গরম।

ভরভট্যা — বিণ. ঘন প্রলেপ।

ভরভস্যা — বিণ. আলগা।

ভসর — বিণ. খরখসে।

ভাঁচা — বি. অন্যের ধান থেকে চাল তৈরীর কাজ।

ভাংচি — বি. ভাঙানি।

ভাকা — ক্রি. ভুল দেখা।

ভাকুয়া — ক্রি. প্রলাপ বকা।

ভাঙর — বিণ. সুনসান।

ভাটু — বি. বড় বোনের স্বামী।

ভাতকুড়ি — বি. শরীরে গুটি।

ভাবরি — বিণ. বাঁকা।

ভাররা — বি. তেলেভাজা।

ভালা — ক্রি. দেখা।

ভিঁগাড় — বিণ. চুরমার।

ভিড়িং ভিড়িৎ — বিণ. বিশৃঙ্খলা।

ভিণু — বিণ. আলাদা।

ভুঁটি — বি. গোল

ভুকা — ক্রি. কুকুরের ডাক।

ভুটুং — বিণ. নেংটা।

ভুড়িণ — বিণ. বদমাশ

ভুদড়া — বিণ. জবুথুবু।

ভুসুর — বি. ধেড়ে ইঁদুর।

ভেঁট — বি. পদ্মের বীজ।

ভেঙচা — ক্রি. বিদ্রুপ করা।

ভেদা — বি. লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত।

ভেটর — বিণ. ন্যাকা।

ভেড়ুয়া — বিণ. নাচনির সহযোগী।

ভেলকা — ক্রি. ভেংচি কাটা।

ভেলভেল — অব্য. বোকার মত দেখা।

ভেস্তা — ক্রি. এলোমেলো করে দেওয়া।

ম

মইসা — বি. কাপড়ের দাগ।

মঘন — বিণ. আত্মস্থ।

মঙ্গুরা — বি. লোহা দিয়ে বাঁধানো লাঠি।

মচা — বি. মুখ।

মটকা — বি. ঘরের চালের উপরের অংশ।

মট্‌রা — বিণ. অত্যাধিক মোটা।

মথরা — বি. মরা ধান।

মনউজা — বি. সন্তোষ।

মনকেরা — বিণ. মনোমত।

মগ্ন — বিণ. মুমূর্ষু।

মলকা — ক্রি. প্রবল আনন্দে ছোটাছুটি করা।

মসকা — ক্রি. হাতের তালুতে পেষাই করা।

মসরা — ক্রি. কড়কড়ে করে ভাজা।

মহতল — বিণ. নির্বাপিত।

মহুল — বি. মহুয়া।

মাইচা — বিণ. ভীতু।

মাইরি — বি. মায়ের নামে শপথ।

মাউসি — বি. ধানের পাতা।

মাড় — বি. ভাতের ফেন।

মাড়লি — বি. চেঁছড়া।

মাতকম — বি. মহুল।

মানকি — বি. আদিবাসী সমাজের সর্দার।

মারখা — বি. দাগ / চিহ্ন।

মাসড়া — বি. চামড়ার উপরের মাংসপিণ্ড।

মাহিন্দার — বি. বারোমাসের বেতনভোগী কৃষি শ্রমিক।

মাদুর — বিণ. জ্ঞানী।

মিটকা — ক্রি. চোখের পলক ফেলা।

মির — বি. ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত বিজয়ী খেলোয়াড়।

মিরা — বিণ. সরেস।

মিরিক চিরা — বিণ. খুঁতখুঁতে।

মুখড় — বিণ. বাকপটু।

মুঁজি — বি. বীজ।

মুড় — বি. মাথা।

মুনিস — বি. জনমজুর।

মুরাদ — বি. সামর্থ।

মুলখা — বি. চালের বড় গুড়ি।

মুলুন — পদ্মগাছের শিকড়।

মেকা — বি. উই পোকার বাসা।

মেচড়া — বি. পুঁই লতার ফল।

মেড় — বি. মাটি ও খড়ের তৈরী প্রতিমা।

য

যঁ — বি. জোয়ালের দাড়।

যঁদে — ক্রি. যেখানে।

যগা — ক্রি. জুগিয়ে রাখা।

যৎকু — বিণ. যত।

যৎগা — বিণ. যতগুলো।

যধা — বিণ. শক্তিমান।

যনগা — বিণ. যেগুলো।

যমনি — বিণ. যেমন।

যাঁচ — বি. অনুসন্ধান।

যুতা — ক্রি. জুৎ করা।

যেঠে — অব্য. যেখানে।

র

র — ক্রি. থাক।

র — বিণ. নির্ভেজাল।

র — বি. বটের ঝুরি।

রসক্যা — বিণ. নাচনি নাচের রসিক।

রঁদ — বি. বেড়া।

রকা — বিণ. টাটকা।

রগড়্যা — জিদ।

রগদা — বি. আক্রমণ।

রগনা — বিণ. রোগা।

রটপট — বিণ. দ্রুত।

রঢ়া — বি. শক্তপোক্ত।

রফল — বি. এলুমিনিয়াম।

রসা — বি. সোজা লম্বা গাছ।

রহিস — বিণ. অভিজাত।

রাংকাড়া — বিণ. লম্বা।

রাংচাঁগা — বি. মস্ত বড়।

রাঁকসা — বিণ. লোভী।

রাঁজা — ক্রি. রগড়ানো।

রা — বি. মুখের সাড়া।

রাজট — বি. কথাবার্তা।

রাপুচ — বি. ভাঙ্গা।

রাহি — বি. পথিক।

রিঁগা — ক্রি. পালানো।

রিচু — বিণ. ঢেউ খেলা।

রিজ — বি. খুশি।

রিত — বি. রীতি।

রিতা — ক্রি. মদমত্ত হওয়া।

রিসারিসা — বিণ. রুক্ষ।

রঁধ — ক্রি. বেড়া দেওয়া।

রেঁঘা — বিণ. জেদী।

ল

লআ — বি. ডুমুর।

লগদি — রাজার আদায়ের কর্মচারী।

লছনা — বি. অজুহাত।

লজকা — ক্রি. বাড়া।

লট — বি. জোট।

লদগা — ক্রি. অন্যের পিঠে চড়া।

লমথম — বি. সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

লর — বি. লালা।

লস্‌রা — বিণ. লোভী।

লহনা — বি. ফাউ।

লাদ — বি. গবাদি পশুর বিষ্ঠা।

লাগি — অব্য. জন্য।

লাটা — বি. ঝোপ।

লাতড়া — ক্রি. নাগাল পাওয়া।

লিপা — ক্রি. লেপন করা।

লিয়াই — বি. ঝগড়া।

লুঠু — বি. উভয়পক্ষের।

লুসকা — বিণ. মোটাসোটা।

লেউটা — বিণ. উল্টো।

লেগা — ক্রি. নিয়ে যাওয়া।

লেচরা — বিণ. চাপ চাপ

লেটকা — বিণ. বেশি সেদ্ধ ভাত।

লেঢ় — বিণ. নিরীহ।

লেঢ়া — বিণ. খোঁড়া।

লেলহা — বিণ. বোকা।

শ

শঁকশঁক — অব্য. সর্দির কারণে নাকের শব্দ।

শঁষ — বি. তৃষ্ণা।

শআলি — বি. তসর পোকা।

শক — বি. সন্দেহ।

শবর — বি. খাড়িয়া উপজাতি।

শল — বি. শোলা (হো সোল দুঘু)।

শলি — বি. ধানের মাপ।

শাটকা — বি. সরু চাবুক (সাঁ. ডার)।

শাই — বি. পাড়া (হো সই)।

শান — বি. ধার।

শামকাহাল — বি. মানিক জোড়।

শার — বি. কচু (হো. সম্বে)।

শারি — বি. শালিক (হো. সরু, সাঁ-সারু)।

শাল — বি. শালগাছ (হো-সরজম, সাঁ-সারজম)।

শালকি — বি. শালিক (হো-সরো-সলু)

শাস — বি. শাশুড়ি (মুন্ডারি হণরু, সাঁ হানহার)।

শিঁকা — বি. জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার দড়ি (হো-সিকুওর, সাঁ-সিকওয়ার)।

শিঁগা — বি. গরু-মোষের শিং দিয়ে তৈরি ভেরী।

শিকড়ি — বি. গলার হার (সাঁ-সিকড়ি)।

শিকল — বি. শিকল (সাঁ-সিকিড়ি)।

সেন্দরা — বি. শিকার।

শিপটা — বি. চাবুক।

শুঁগা — বি. ধানের কাটা (হো-রোসা)।

শুড়ি — বিণ. সংকীর্ণ (হো-সুড়ি)।

শুয়ব — বি. শূকর (মু-সুবুরী, সাঁ-সুকরী)।

শোল — বি. নাবাল জমি।

শোষ — বি. পিপাসা।

ষ

ষাঁড় — বি. পুরুষ জীবজন্তু (মুন্ডা-মুন্ডী)।

ষাড়া — বি. পুরুষ মোরগ (হো-সভীসীম)।

ষাঁড়ি — বি. মাদী (মুজা এঁগা)।

স

সনঝা — বি. সন্ধ্যা।

সর — বিণ. সইর।

সইরা — ক্রি. সরানো।

সয়দা — বি. পণ্যদ্রব্য।

সয়ালি — বি. গুটিপোকা।

সংতি — বি. সাথী।

সংতিরি — বি. প্রণয়ী।

সঁকড়ি — বিণ. এঁটো।

সঁঠকা — ক্রি. টান পড়া।

সঁটরা — ক্রি. চেটেপুটে খাওয়া।

সঁটা — ক্রি. লেগে থাকা।

সজ — বিণ. সোজা।

সদ্যম — অব্য. আপাতত।

সপ — বি. মাদুর।

সপয়রা — বি. লঙ্কা।

সবুর — অপেক্ষা।

সমগা — বিণ. ভেজা।

সটা — বি. স্বামী।

সলই — বি. পরামর্শ (হো-সোলা)।

সাই — বি. পাড়া।

সাঁগা — বি. দ্বিতীয় বিবাহ।

সাঁগাত — বি. বন্ধু।

সাঁগিল — বিণ. প্রকান্ড।

সাঁচি — বি. সরষে।

সাখি — বি. সাপ খেলানোর মন্ত্র।

সাট — বি. দাগ।

সাপট — ক্রি. জোরে।

সামকা — ক্রি. ঢোকানো।

সাষ্টম — বিণ. সুস্থ।

সিটকা — বি. পাতলা।

সুম — বি. কৃপণ।

সুয়াং — বি. গায়ের জোর।

সবকা — বি. দড়ির গিঁট।

সেঁথাল — বিণ. ভিজা।

সেতা — বি. কুকুর (সাঁওতালী)।

সেরেঞ্চ — বি. গান।

সেককার — ক্রি. চোখের পলক পড়া।

হ

হঁঅতা — বিণ. ঘটিত।

হঁকহঁক — অব্য. ছোঁক ছোঁক ভাব।

হঁজর হঁজল — বিণ. ঢিলে।

হজা — ক্রি. হারানো।

হট্‌কা — ক্রি. আঁকশি।

হড় — বি. মানুষ।

হড়কা — ক্রি. পা পিছলে যাওয়া।

হড়প — বি. গ্রাস।

হড়্যাল — বি. হুড়াল।

হদবদি — বিণ. বাক-মুখরা।

হরা — বিণ. সবুজ।

হাউস — বি. আনন্দ।

হাঁকড়া — ক্রি. বকুনি দেওয়া।

হাড়কা ধরা — বিণ. ছেলেধরা।

হাপটা — ক্রি. জড়িয়ে ধরা।

হাবলা — বিণ. বোকা।

হামি — সর্ব. আমি।

হাল — বি. লাঙ্গল।

হালসা — ক্রি. কামড়ে দেওয়া।

হিঁদে — সর্ব. এদিকে।

হিন — বি. আল।

হিবজা — ক্রি. মেশানো।

হিলকা — ক্রি. হাত দিয়ে সরানো।

হুঁকরা — ক্রি. গর্জন।

হুড়কা — বি. কপাট বন্ধ করার

হুড়পি — বি. সাপ রাখার ঝাঁপি।

হুঁড়রা — ক্রি. হিংস্র গর্জন।

হুডুর — অব্য. মুখ বন্ধ করার অবস্থা।

হুড়ুম — বি. মুড়ি।

হুদা — বি. উদাল (সাঁ-হুদা >)।

হুনমুড়ি — বিণ. বাঁদরমুখো।

হুলকা — ক্রি. আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া।

হেবলা — বিণ. হাবাগোবা।

হো — বি. কোল উপজাতি।

উপসংহার

আমাদের আলোচনা থেকে উপজাত অভিজ্ঞতায় এখন আমরা ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব কতটা বিস্তার লাভ করেছে তার বিশেষ দিকগুলি সূত্রায়িত করার চেষ্টা করবে।

বাংলা ভাষার বিচিত্র গতি; এর ভাব ও ভাষা দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে আজ এক বিশিষ্টতা লাভ করেছে এই বহুধা বিভিক্ত বাংলাভাষা রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ডী এই কয়েকটি উপধারা একটি স্রোতে মিলিত হয়ে আজ অখণ্ড বাংলা ভাষার সৃষ্টি করেছে। কি বিচিত্রই না গতিরূপে-রসে মাধুর্যে যেন প্লাবন সৃষ্টি করেছে। এই প্লাবন আর কিছুই নয় ভাষা ও সংস্কৃতি। বহুধা বিভক্ত এই বাংলা ভাষার স্বরূপটিকে চিনতে হলে এই উপভাষাগুলিকে (বাংলার) জানা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। কিন্তু কালের নিয়মে একটা ভাষা হঠাৎ করে ফলে-ফুলে ভরে ওঠে না। এর পিছনে আছে একটা ইতিহাস সেটা হল— আর্য ও অনার্য জাতীয় বিমিশ্রণের ইতিহাস। এই আর্য-অনার্যের বিমিশ্রণের মূল রূপরেখাটি তৈরি করে গ্রামভাষ্য। যা ভাষাবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমণীমোহন মল্লিক, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায়, সুকুমার সেন প্রমুখ আচার্যগণ গ্রাম্য ইতর শব্দ ও উপভাষা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

আমরা জেনেছি তাণ্ডব, দেশী কিম্বা অস্ট্রিক শব্দের ভিতরেই প্রকৃত ভাষার ও জাতীর ইতিহাস সুপ্ত। প্রাচীনত্বের কারণে ও ব্যবহারের কারণে অনেক কিছু লুপ্ত হলেও এখনও বহু শব্দ বিশেষ বিশেষ প্রদেশে আবদ্ধ, তাই এরা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় ও আঞ্চলিক ভাষাকে সচল করে রাখে যা প্রকৃত ভাষার অনুরূপ। এই অনুরূপ ভাষা বা উপভাষা নিজ নিজ অঞ্চলে যে কি পরিমাণে গৌরবান্বিত তা সত্যই

বিস্ময়ের। এই ভাষা আমাদের আপন ও নিজস্ব সম্পত্তি। একই জল, হাওয়া, মাটি ও মানুষের পরিবর্ধিত ও পরিচর্চিত হয়ে পল্লিসমাজের বিবর্তনক্ষেত্রে এই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মীকরণ ও আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় করণে আজও এসব ভাষা টিকে আছে যেমন— সাঁওতালী, কুড়মালী, কোড়া, অসুর, বিরহোড় আর ভূমিজ, শবর (খাড়িয়া) জুয়াং, গাদাবা, অসুর প্রভৃতি ভাষাগুলি দিন দিন কমতে কমতে কালগর্ভে হারিয়ে গেছে।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেরই একটি করে ইতিহাস আছে যা অঞ্চল ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঝাড়খণ্ডী বাংলা পৃথক কোন ভাষা নয়। প্রত্যেক ভাষায় কমবেশি একে অন্যের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে বা করে ক্রমান্বয়ে করে চলেছে। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় না থেকে প্রত্যেক ভাষাই তার ভাষীক গোষ্ঠী বাড়াবার চেষ্টা করে। এটা মূলত মানুষের জীবন জীবিকার খাতিরে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। একই ভাষাবংশের হলে সরাসরি প্রসার লাভ করে আর অন্যভাষাবংশের হলে তার প্রভাব উচ্চারণ, এর ক্ষেত্রে পড়ে। এবং সুশৃঙ্খল করে প্রসারিত হয়। বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর ভাষীক সম্প্রদায় ছোট ছোট ভাষাগুলিকে আত্মস্মাৎ করে নেয় এবং ছোট ভাষাগুলির ভাষিক মানুষ কমতে কমতে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে তবুও ছোট ভাষাগুলির উচ্চারণ ও সংস্কৃতি যুগোপৎভাবে চলতে থাকে। আমরা দেখেছি যে, ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার ভৌগোলিক সীমারেখা বারংবার বৃদ্ধিই পাচ্ছে শিষ্টা ভাষা কোনভাবেই এই ভাষার বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মালভুম, পূর্বসিংহভূম, পশ্চিমসিংভূম, বোকারে, ধানবাদ, পালামু, পাকুড় গিরিড সহ পশ্চিমবঙ্গ (ভৌগোলিক মানচিত্র) নিকটবর্তী এবং উরিষ্যার সীমান্ত তথা পশ্চিম মেদনীপুর জেলার লাগোয়া অঞ্চল বারিপদা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সমগ্র অংশ, বীরভূম জেলার পশ্চিম ও উত্তরাংশ ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলগুলি (যেখানে হিন্দি, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে) ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চল নামে পরিচিত হয়েছে। যদিও বাংলা তথা ভারতের আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক (সম্প্রদায়) ভাষী মানুষ— সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধা শবর (খাড়িয়া), বিরহোড়, ফোরওয়া, মুণ্ডা,

তুরি, অসুর, হো, গাদাবা, করমালী, জুয়াং কুড়মী প্রভৃতি মানুষের ভাষাই অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিক ভাষা কোন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ভাষা নয়। অনেকগুলি ভাষার সমষ্টি। কালক্রমে অস্ট্রিক ভাষী মানুষের মধ্যে একমাত্র সাঁওতাল ছাড়া বাকি অস্ট্রিক শ্রেণির মানুষ তাদের নিজস্ব (খেরওয়াল) ভাষাকে হারিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন জায়গায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি যে, কোড়া, ভূমিজ, অসুর, হো, শবর, জুয়াং, তুরি, বীরহোড় প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষ জানিয়েছেন যে আমরা তিনপুরুষ ধরে বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা বলি। যদিও কিছু কিছু জায়গায় বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে রামজীবনপুর ও পাশ্ববর্তী পার্বতীপুর গ্রামে কোড়ারা নিজস্ব ঠারে (ভাষায়) কথা বলে। বীরভূম ও বাঁকুড়ার মণ্ডলকুলি, পশ্চিমমেদনীপুর জেলার রামগড়, বেলপাহাড়ির কোড়ারা ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। যদিও সাঁওতালদের সঙ্গে মুণ্ডা বা কোড়াদের ভাষার মিল ষাট শতাংশেরও বেশি। অনেক পণ্ডিত বা গবেষকরা সাঁওতাল, কোড়া, মুণ্ডা, অসুর প্রভৃতি ভাষার মধ্যে মিল না থাকার কথা বলেছেন কিন্তু আমরা দেখেছি এদের ভাষা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই অমিল এর থেকে মিলই বেশি। আমরা কোড়া ভাষায় গান সংগ্রহ করে সাঁওতালদের শুনিয়ে উভয় ভাষায় পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করি।

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা এর স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি মান্য বাংলার অনুরূপ। ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার দ্বিস্বর ধ্বনি dipthong বা সংস্কৃতে দেখা যায়। কিন্তু কোল ভাষায় আছে। ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ও মুণ্ডারী গোষ্ঠীর অস্ট্রিক ভাষায় যে কোনো স্বরধ্বনি আনুনাসিক হতে পারে। স্বরসঙ্গতির ক্ষেত্রে মুণ্ডারী শাখার প্রভাব আছে। ণ, ড়, ঢ় ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, ঠিক তেমনি অস্ট্রিক ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় না। কোন খাঁটি বাংলা শব্দই যুক্ত ব্যঞ্জণ দিয়ে শুরু হয় না। এটি অস্ট্রিক ভাষার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এ-র উচ্চারণ 'ও' এবং 'অ' এর মাঝামাঝি উচ্চারণ অ্যাগার যৌল, হবে প্রভৃতি। 'অ' এর উচ্চারণ ওঁচা > অঁচা, কোণা > কণা, সোম > সম একটু ভিন্নতর। 'আ' (হ্রস্ব) আঁইখ, আঘু, আউলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) বাঁশী খণ্ডে বাঁশীর

শব্দে মো আউলাইল রন্ধন। ওড়িয়াতে হ্যাঁ বাচক শব্দ যেমন 'হুঁ' ঝাড়খণ্ডী বাংলারও উচ্চারণ ঠিক তেমনটাই। আনুনাসি উচ্চারণ কোনভাবেই পরিবর্তন হয় না। (শ, ষ, স) এদের উচ্চারণ 'স' কেবলমাত্র উচ্চারিত হয় যেমন শশধর (সসধর) শ্রবণ (সুবনা) শোঁকা (সুঁগা)। স কোথাও 'ছ' হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন সন্মুখ (ছামু), শ্রী (ছিরি)। গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় এবং মধ্যভারতের অনেক অংশে অস্ট্রিক ভাষী অস্ট্রালয়েডদের বসবাসই ছিল সবচেয়ে বেশি। অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েডদের সভ্যতা ছিল একান্তই গ্রামকেন্দ্রিক। অস্ট্রিক ভাষাবর্গের দুটি মূল শাখা—
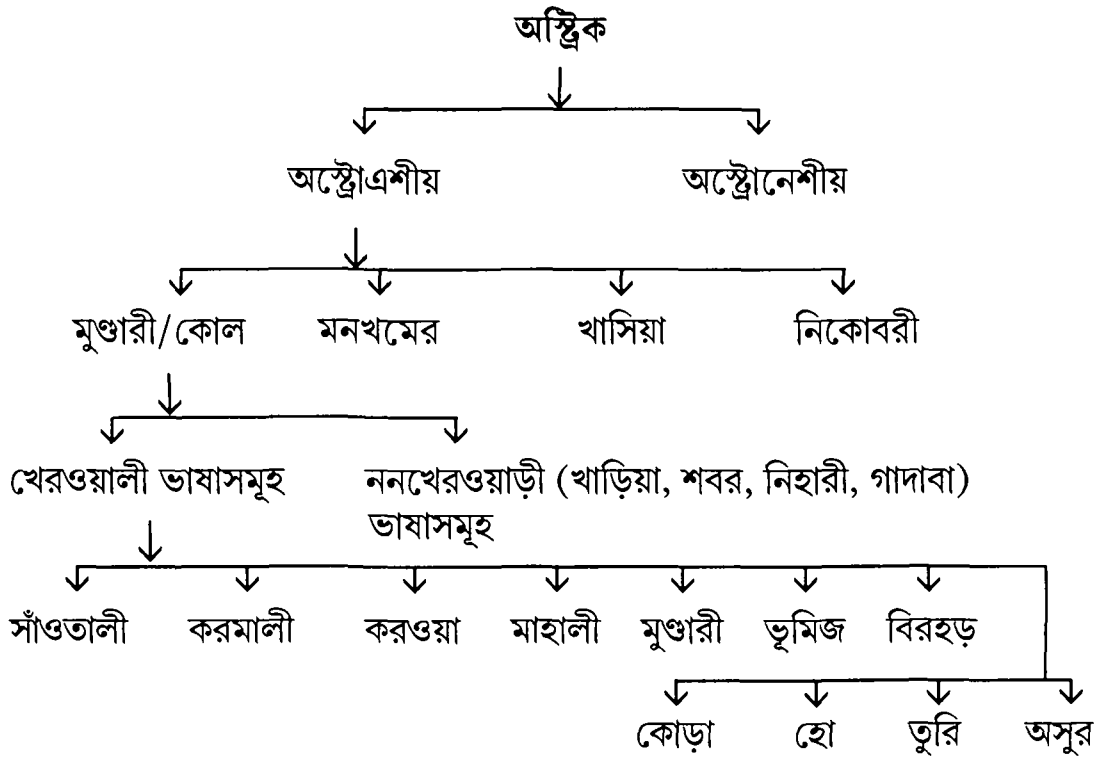
একমাত্র সাঁওতালীকে বাদ দিলে মুণ্ডারী গোষ্ঠীর বাকি ভাষাগুলি লুপ্ত। অস্ট্রিক ভাষারও আটটি স্বরধ্বনি— অ, আ, অী, ই, উ, এ, ও, অ্যা। ঝাড়খণ্ডী বাংলায় এই ধ্বনিটির ব্যবহার আছে। আবার আ এর বিবৃত ধ্বতি হিসাবে আঁ রূপ নিয়েছে অ্যাপা, আল্য > আলো (সাঁও > ঝা বা)। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় ব্যঞ্জণধ্বনি কণ্ঠধ্বনি— ক, খ, গ, ঘ, তালব্য— চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, মূর্ধন্য— ট, ঠ, ড, ঢ, তাড়িত— ড়, ঢ়, দন্ত্য— ত, থ, দ, ধ, ণ, ওষ্ঠ্য— প, ফ, ব, ভ, ম, অন্তস্থ— য়, কম্পিত—র, পার্শ্বিক—ল, উষ্ম—শ, স, হ

এবং প্রাণিত নাসিক্য মহ, লহ, রহ এবং ং যেখানে অস্ট্রিক ভাষায় কণ্ঠ্য— ক, খ, গ, ঘ (ঙ-ধ্বনি নাসিক্য) মূর্ধণ্য— ট, ঠ, ঢ, ড (ড়-তাড়িত) তালব্য ঞ, তালু দন্ত্যমূলীয়— চ, ছ, জ, ঝ, দন্ত্যমূলীয়— র, ল, ন, য়, ও স দন্ত্য— ত, থ, দ, ধ এবং বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য—প, ফ, ব, ভ, ম সুতরাং ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষার ধ্বনি ও অস্ট্রিক ভাষার ধ্বনি অনেকটাই সামনাসামনি। অস্ট্রিক ভাষার ঞ দ্বারা স্বরান্ত ং (অনুস্বার) ব্যবহার হয়। ঙ, ঞ, ন, ম নাসিক্যধ্বনি হওয়ায় ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাতে এর প্রভাব পড়েছে। ফলে আমরা শিষ্ট মান্য-চলিতের থেকে ঝাড়খণ্ডী (মোটা) আলাদা হয়েছে।

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডারীতে (সাঁওতালী, গানে) কথ্য ভাষায় লুপ্ত বিভক্তির সম্বন্ধপদের ব্যবহার অনেক বেশি। যেমন— বুরুচেতান (পাহাড় উপরে) গাঢ়া তালরে (নদীর মাঝে) প্রভৃতি পদরীতির প্রয়োগ বেশি পরিমানে লক্ষ্য করা যায়— ঝাড়খণ্ডী বাংলার ক্ষেত্রে ডমজুড়ি (ডমজুড়ির) ডমা আখড়া ভিতরে সনামুদি ধারায় দিল। বিটি বাঢ়িল ফাতু (ফাতুর) কুটুর নাই লাগে। এখানে সম্বন্ধ পদে— র, এর, কা, কার, কে শূণ্য বিভক্তি যুক্ত হয়। নিকট ও দূর নির্দেশক হিসাবে 'ই' আর 'উ' এর ব্যবহার— যা সাঁওতালী, নাগপুরিয়া, পাঁচপরগণিয়া ও কুড়মালিতে আছে। যেমন— 'ই' দিগে বাঁকুড়া উ দিকে মেদনীপুর।

একটি শব্দ থেকে একাধিক শব্দের সৃষ্টি যেমন— ডুমা, ডুমকা, ডুবকা, ডিমা ইত্যাদি ব্যক্তিনাম এর ক্ষেত্রে ধুমপু (ধেঁটে) ঢুলি (মোটা মন্ত্রী লোক) এবং গ্রামনামের মধ্যে অস্ট্রিক শব্দ নিহিত আছে। গ্রামের নাম পরিবর্তন হয় না বলেই এখনো শব্দভাণ্ডার থেকে লুপ্ত হয়নি। বৃক্ষ-বস, ফসল এর ক্ষেত্রে জজবেড়া-জজডি (তেঁতুল) মুরগা ডি (পিয়াশাল) গদা পিয়াশচাল। সারজমডি (শাল) উলদা (আম) পাহাড় পর্বত সম্পর্কিত জিলিংগড়া (লম্বা), ডাহিগাড়া (মাঠ) চাকালি (কাদা) পশুপাখির ক্ষেত্রে সিম-ডি, বানালুকা, কেঁদা ডাংরি প্রভৃতি গ্রাম নাম। এছাড়া সেরেংডি (গান) বঁগা-ডি (দেবতা) সারেং গড়; সারেঙ্গা, কাদ-ডিঙ্গা বামডোল প্রভৃতি নামগুলি থেকে অস্ট্রিক শব্দভাণ্ডার ঝাড়খণ্ডী

বাংলাভাষী অঞ্চলে যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

ঝাড়খণ্ডী বাংলাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির সজীব ধারা এখানকার জনমানুষে এমনভাবে আবেষ্ঠিত করে রেখেছে যে আলাদা করার কোন উপায়ই নাই। চারিদিকে অজস্র শিলাস্তর ছড়িয়ে রয়েছে। আর শাল, পিয়াল, মদুয়ার সমারোহ। নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলকে প্রাচীন সভ্যতার পটভূমি বলা যেতে পারে। এখানকার সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, মাহালি, লোধা, খাড়িয়া, শবর, বিরহড়, অসুর, তুরি এবং উপজাতি গোষ্ঠী বাগদী, বাগাল, ডোম, বাউরি, কামার, কুমার, চামার, হাঁড়ি, মুচিসুড়ি এবং উচ্চজাতি হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্ত সকলেই পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে কখন ধীরে ধীরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে গেছে তার শিকড় খোঁজা অসম্ভব। ঘরধর বাঁধার ধরন, সাজসজ্জা, পোশাক আসাক, ক্রিয়াকর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং আচার অনুষ্ঠানে এই ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষী অঞ্চলে অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের অবদানকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। ঝাড়ফুঁক, ভেজাবিন্দা, নাচের ক্ষেত্রে কাঠিনাচ, গরুঘুঁটা, চোখচাঁদা এবং আলপনার ক্ষেত্রে অস্ট্রিক সমাজের অবদানকে কোনদিনই অস্বীকার করা যাবে না। লৌকিক দেবদেবী— সিন্নি, অস্তিক, মনসা, চণ্ডী, সত্যপীর, জাহের, সিঙবোঙা, মারাংবুরু, গরাম, সবাই মিলেমিশে একাকার। আচার অনুষ্ঠান— জন্মমৃত্যু, বিবাহ এবং লোকনামের ক্ষেত্রে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের অবদান অনস্বীকার্য।

পরিশেষে একথা বলতে পারি যে আঞ্চলিক শব্দকোষকে নিয়ে একদিকে যেমন বহুবিধ কথা ও কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে ঠিক তেমনি যে সকল বস্তুকে বাংলার অন্য প্রদেশে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষী অঞ্চলে এইসব বিষয় বা বস্তুকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। লোককথা, লোকগীতি, খেলাধূলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ আমরা পাই। তাছাড়া ঝাড়খণ্ডী ও অস্ট্রিক ভাষার শব্দকোষের ক্ষেত্রে অনেক মিল আমরা পাই যা অন্যান্য জায়গাতে পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য (ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাঞ্চলের কয়েকজন প্রতিবেদক)

নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষা	পেশা	ত.জা	ত.উ.	ও.বি.সি	সাধারণ	গ্রাম	ব্লক	জেলা
রাম কুমার	পুং	৩৪	অষ্টম	শ্রমিক	—	—	”	—	আগরডি	কাশীপুর	পুরুলিয়া
দিপুমনি মাহাত	মহিলা	৩৯	নিরক্ষর	বিড়ি শ্রমিক	—	—	”	—	মিরাগপাহাড়ি	কাশীপুর	পুরুলিয়া
রমকি সিং মুড়া	মহিলা	৪৯	নিরক্ষর	শ্রমিক	”	—	—	—	কাশিডি	কাশীপুর	পুরুলিয়া
চুনারাম মাহাত	পুং	৪২	চতুর্থ	শ্রমিক	—	—	”	—	নুদিডি	কাশীপুর	পুরুলিয়া
শিতলা মাহাত	মহিলা	৩২	নিরক্ষর	শ্রমিক	—	—	”	—	নুদিডি	কাশীপুর	পুরুলিয়া
খোকন চালক	পুং	২৬	চতুর্থ	ড্রাইভার	—	”	—	—	গগনাবাদ	কাশীপুর	পুরুলিয়া
গঙ্গারাম মাহাত	পুং	৩৬	স্নাতকোত্তর	শিক্ষক	—	—	”	—	কালিয়াবাসা	হুড়া	পুরুলিয়া
ধীরেন হাঁসদা	পুং	৪২	স্নাতকোত্তর	অধ্যাপক	”	—	—	—	শামুকগুড়িয়া	হুড়া	পুরুলিয়া
বলাই মাহাত	পুং	৩৯	চতুর্থ	কৃষক	—	—	”	—	লুখাডি	হুড়া	পুরুলিয়া
সীতারাম মেট্যা	পুং	৫৯	নিরক্ষর	জালবোনা	—	”	—	—	কুমড়াবাইদ	হুড়া	পুরুলিয়া
চুনকী সিংহ	মহিলা	৩১	নিরক্ষর	বিধবা	”	—	—	—	শুকুরহুটু	বরাবাজার	পুরুলিয়া
নিমাই প্রামামিক	পুং	৩৪	স্নাতক	প্যারাটিচার	—	—	”	—	কলমা	ঝালদা	পুরুলিয়া

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য (ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাঞ্চলের কয়েকজন প্রতিবেদক)

নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষা	পেশা	ত.জা	ত.উ.	ও.বি.সি	সাধারণ	গ্রাম	ব্লক	জেলা
দেবাশীষ মাহাত	পুং	৩৪	স্নাতকোত্তর	সরকারী কর্মচারী	—	—	”	—	ডুড়কু	বরাবাজার	পুরুলিয়া
তাপস মাহাত	পুং	৩২	স্নাতকোত্তর	শিক্ষক	—	—	”	—	আগরড়ি	কাশীপুর	পুরুলিয়া
শোভনা দুলে	মহিলা	৫৬	নিরক্ষর	ক্ষেতমজুর	”	—	—	—	চেটিয়াশোল	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
দীপক দাশ	পুং	২৪	উচ্চমাধ্যমিক	ক্ষেতমজুর	—	—	—	”	এন্যাটা	জামবনী	পঃমেদনীপুর
পাল্টু দাশ	পুং	২০	অষ্টম	ক্ষেতমজুর	”	—	—	—	এন্যাটা	জামবনী	পঃমেদনীপুর
দশরথ কালিন্দী	পুং	৪০	নিরক্ষর	ক্ষেতমজুর	”	—	—	—	সুখাডালী	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
নিবারণ দুলে	পুং	৬৪	নিরক্ষর	—	”	—	—	—	সুখাডালী	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
ভুলকা ভুইঞা	পুং	৪২	নবমশ্রেণি	ক্ষেতমজুর	”	—	—	—	সুখাডালী	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
ভুতনাথ কুণ্ডু	পুং	৭২	মাধ্যমিক	ব্যবসায়ি	—	—	—	”	খয়েরপাউড়ি	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
সীতারাম হাঁসদা	পুং	৩৪	মাধ্যমিক	শ্রমিক	—	”	—	—	জামবমী ডাঙ্গা	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
সুব্রত হাঁসদা	পুং	৪০	সপ্তম	কৃষক	—	”	—	—	চপের ডাঙ্গা	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
টিপুরাম হাঁসদা	পুং	৬২	উচ্চতর মাধ্যমিক	অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবি	—	”	—	—	আস্তাকোন্দা	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য (ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাঞ্চলের কয়েকজন প্রতিবেদক)

নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষা	পেশা	ত.জা	ত.উ.	ও.বি.সি	সাধারণ	গ্রাম	ব্লক	জেলা
সনাতন কোটাল	পুং	৫২	নিরক্ষর	শ্রমি	—	”	—	—	সারেঙ্গা	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
তরুণ মুদি	পুং	৩২	স্নাতক	শিক্ষক	—	”	—	—	মণ্ডলকুলি	রাইপুর	বাঁকুড়া
জবা দলুই	মহিলা	৪২	সপ্তম	গৃহবধূ	—	”	—	—	শিলদা	শিলদা	পঃমেদনীপুর
দীপন শবর	পুং	৫২	নিরক্ষর	ক্ষেতমজুর	—	”	—	—	চিচিড়া	জামবনী	পঃমেদনীপুর
আকুল গিরি	পুং	২০	উচ্চমাধ্যমিক	ছাত্র	—	—	”	—	তেঁতুলিয়া	জামবনী	পঃমেদনীপুর
পরমেশ্বর হাঁসদা	পুং	৪৫	নবম	ক্ষেতমজুর	—	”	—	—	রঘুনাথপুর	জামবনী	পঃমেদনীপুর
সুশীল মুদি	পুং	৩১	নবম	শ্রমিক	—	”	—	—	রামজীবনপুর	শালতোড়া	বাঁকুড়া
ধীরেন মুদি	পুং	৩৬	পঞ্চম	শ্রমিক	—	”	—	—	রামজীবনপুর	শালতোড়া	বাঁকুড়া
ফুলমনি হাঁসদা	স্ত্রী	৫০	নিরক্ষর	ক্ষেতমজুর	—	”	—	—	রাধামোহনপুর	বিনপুর	পঃমেদনীপুর
ডুলি দুলে	স্ত্রী	৫৪	নিরক্ষর	অবিবাবিত	”	—	—	—	সুখাডালী	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
সনাতন বাস্কে	পুং	৪৮	নিরক্ষর	শ্রমিক	”	—	—	—	কৃষ্টপুর	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
গুরুদেব কালিন্দী	পুং	৩৯	নিরক্ষর	শ্রমিক	”	—	—	—	মুকুটমনিপুর	খাতড়া	বাঁকুড়া

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য (ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষাঞ্চলের কয়েকজন প্রতিবেদক)

নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষা	পেশা	ত.জা	ত.উ.	ও.বি.সি	সাধারণ	গ্রাম	ব্লক	জেলা
নিমাই প্রামাণিক	পুং	৩৪	স্নাতকোত্তর	শিক্ষক	—	—	—	”	বীরবাইদ	বরাবাজার	পুরুলিয়া
চমকাই মাহাত	পুং	২২	স্নাতক	ছাত্র	—	—	”	—	কাশিপুর	কাশিপুর	পুরুলিয়া
সুবল ব্যানার্জী	পুং	৫০	অষ্টম	ব্যবসা	—	—	—	”	দুলমি	অণ্ডা	পূর্বসিংভুম
গঙ্গাধর মাহাত	পুং	৩৬	স্নাতকোত্তর	অধ্যাপক	—	—	”	—	মানবাজার	মানবাজার	পুরুলিয়া
রতন কুম্ভকার	পুং	৭০	নিরক্ষর	—	—	—	”	—	শালডহরা	সারেঙ্গা	বাঁকুড়া
পুতুল সরকার	মহিলা	৪৫	নবম	অবিবাহিতা	—	—	—	”	পার্বতীপুর	গঙ্গাজলঘাটি	বাঁকুড়া
অমূল্য সর্দার	পুং	৬১	স্নাতক	অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক	—	”	—	—	ছাতনা	ছাতনা	বাঁকুড়া
নাড়ু দে	পুং	৪৫	সপ্তম	বাস ড্রাইভার	—	—	”	—	বেলপাহাড়ি	বিনপুর ২নং	পঃমেদনীপুর
হেমন্ত সরকার	পুং	৪৬	মাধ্যমিক	ক্ষুদ্র দোকান	—	—	”	—	বোতা	তালডাংবা	বাঁকুড়া
গৌতম সিনহাবাবু	পুং	৩২	স্নাতকোত্তর	শিক্ষক	—	—	”	—	সিমলাপাল	সিমলাপাল	বাঁকুড়া
পার্থসারথী হাটি	পুং	৪৫	স্নাতকোত্তর	অধ্যাপক	—	—	”	—	খাতড়া	খাতড়া	বাঁকুড়া

(এছাড়া আছেন জামবগী, কুসুমটিকরী ও শালডহরা হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, ২০১৩)

নাম	লিঙ্গ	বয়স	শিক্ষা	পেশা	ত.জা	ত.উ.	ও.বি.সি	সাধারণ	গ্রাম	ব্লক	জেলা
সোমনাথ পতি	পুং	২৮	স্নাতকোত্তর	শ্রমিক	—	—	—	”	তুলিন	ঝালদা	পুরুলিয়া
শ্রীপতি বড়াল	পুং	৩৯	সপ্তম	শ্রমিক	—	—	—	”	মাসিনা	ঝালদা	পুরুলিয়া
শিবরাম দুণ্ডু	পুং	৪৮	নবম	ব্যবসায়ি	—	—	—	”	ইলু	ঝালদা	পুরুলিয়া
বাদল দে	পুং	৪২	তৃতীয়	ব্যবসায়ি	—	—	—	”	কালিমাটি	বাগমুণ্ডি	পুরুলিয়া
কৈলাশ ডাঙ্গর	পুং	৩৯	অষ্টম	ঠিকাদার	—	—	—	”	বীরগ্রাম	বাগমুণ্ডি	পুরুলিয়া
রুপি দলে	মহিলা	৪৪	নিরক্ষর	শ্রমিক	—	”	—	—	মাদলা	বাগমুণ্ডি	পুরুলিয়া
বনমালী সিং মুড়া	পুং	৪২	নিরক্ষর	শ্রমিক	”	—	—	—	চিত্যাড়া	কাশীপুর	পুরুলিয়া
করানী রজক	পুং	৬৭	অষ্টম	অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী	—	”	—	—	চাকলতা	পুরুলিয়া	পুরুলিয়া

(ক্ষেত্রসমীক্ষায় যারা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন তারা হলেন খাতড়া আদিবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথী হাটী, খাতড়া, বাঁকুড়া, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড° শঙ্কর বিশাই বরাগাড়ি, বাঁকুড়া, পাঁচমূড়া মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড° নরেন রায়, মানবাজার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আশুতোষ খান, শালতোড়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অনির্বান মান্না। কোচবিহার কলেজে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড° সুধীর কুমার বিষ্ণু, মণ্ডলকুলি হাইস্কুলের শিক্ষক উপেন্দ্র মুদি (মণ্ডলকুলি, বাঁকুড়া), খাতড়া কলেজের ড° ভীম মাহাত।)

গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য, নন্দদুলাল—রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০৩।

ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাদিত) — বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৫।

ঘোষ, দীপঙ্কর —আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।

ঘোষ, দীপঙ্কর —লোকশিল্পীর মুখোমুখি ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৯।

ঘোষাল, ছন্দা —বাগাল ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

ঘোষ, বিনয় —পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ঃ দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।

চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ— লোকায়ত পশ্চিমরাঢ় ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায় নরনারায়ণ— ঝুমুর ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৪।

দে, নির্মলেন্দু —জেতোড় লোকসাহিত্য ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৮।

Das, Narendranath – History of Midnapore, Political; Vol. I : Medinipur Itihas Rachana Samity, Mid, 1972

বিশ্বাস, তৃপ্তি — সিন্ধুবালা ঝুমুর ও নাচনি ঃ কবিতা পাক্ষিক ৪৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলিকাতা, জানুয়ারী, ২০০৩।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ— আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বন ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০০৯।

বসুরায়, সুবোধ— রাঢ় বঙ্গের কারুশিল্প ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই, ২০০৬।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ— পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ ঃ প্রথম খন্ড, পরিবেশক সুবর্ণরেখা, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৬, কলিকাতা।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ— পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ ঃ দ্বিতীয় খন্ড, পরিবেশক সুবর্ণরেখা, অক্টোবর, ২০০৭, কলিকাতা।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ— বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক্-বৈদিক প্রভাব ঃ প্রকাশক সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৬।

—বাঁকুড়া জেলা লোকসংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২।

বন্দোপাধ্যায়, সুবীর ও বাস্কে ধীরেন (সম্পাদিত) — লোকসংস্কৃতি ঃ বিদিশা, মেদনীপুর, ১৯৯৫।

ভট্টাচার্য, তরুণদেব —পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, মেদনীপুর ঃ ফার্মা কে এল এম প্রায়ভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, কলিকাতা।

ভৌমিক, সুহৃদকুমার — ঝাড়খন্ডে মহাপ্রভু ঃ মারাংবুরু প্রেস, মেছেদা, মেদনীপুর, ১৯৯৪।

ভৌমিক, প্রবোধকুমার —লোকসমাজ ও সংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০৩।

মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র —ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য ঃ প্রথম বাণীশিল্প, শোভণ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০০, কলিকাতা।

মাহাত, বিনয় —লোকায়ত ঝাড়খন্ড ঃ নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, কলিকাতা।

রায়, নীহাররঞ্জন —বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব ঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২, কলিকাতা।

Risley, H. H. –The Tribes and Castes of Bengal Vol. I : Reprint, Cal., 1998, Selleing Agent - Firma K L M P Ltd.

শতপথী, ইন্দ্রাণীদত্ত —ছৌ ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৮।

সরকার, রেবতীমোহন — লোকসংস্কৃতি পদ্ধতিবিদ্যা ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৫।

সরদার, কালিপদ —দেশজ আদিবাসী সমাজ ঃ (পরিবেশক) আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৯৪।

সরেন, নায়কে মঙ্গলচন্দ্র — করমপূজার উৎস ঃ (পরিবেশক) বাস্কে পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮১।

সিংহ, শান্তি — টুসু ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, পৌষ সংক্রান্তি, ১৪০৫।

সিংহ, মানিকলাল —রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, প্রথম খন্ড ঃ বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ১৯৮২।

মুখোপাধ্যায়, সুব্রত —সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, সোমা—রাঢ়বঙ্গের লোকমাতৃকা ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৪।

Mukhopadhyaya, Subratakumar – Chang : Folk & Tribal Cultural Centre Deptt. of Information and Cultural Affairs, Govt. of West Bengal.

মজুমদার, তুলিকা (সম্পাদিত) — বাংলার বনদেবতা ঃ করুণাময়ী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৭।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি— আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৪।

মিত্র, সনৎকুমার—ঝুমুর আলোচনা ও সংগ্রহ ঃ পরিবেশক পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৮।

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ঃ

করন, সুধীরকুমার — সীমান্ত বাঙলার লোকযান ঃ করুণা প্রকাশনী, ১৪০২, কলিকাতা।

Karan, Sudhirkumar – South-Western Bengali : A Linguistic Study : Bihar Bangla Academy, Kadam Kanan, Patna, 1992.

কামিল্যা, মিহিরচৌধুরী — ভাষাতত্ত্ব বাংলা ভাষার ইতিহাস, পরিবেশক মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯।

ঘোষাল, ছন্দা —ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ীরূপ ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৪।

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার — ভাষার ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব ঃ প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার — ক) ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা, রূপ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯২, কলিকাতা।

খ) ভাষাপ্রকাশ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঃ রূপ, ১৩৯৪, কলিকাতা।

Chatterjee, Sunitikumar – The Origin and Development of the Bengali Language : Rupa & Com., 2002, New Delhi.

টুডু, কানাইলাল —সাঁওতালী ভাষা লেখা ও শেখা ঃ ঝাড়গ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫।

দাশ, শিশিরকুমার — ভাষা জিজ্ঞাসা ঃ প্যাপিরাস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।

দে, পীযূষ— বানীবিচিত্রা (দ্বিতীয় খন্ড) ঃ বাণী প্রকাশনী, গুয়াহাটী, একাদশ প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১১।

দাস, ক্ষুদিরাম —সাঁওতালী বাংলা সমশব্দ অভিধান ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

পাল, অনিমেষকান্তি —সাঁওতালি সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১১।

পাল, অনিমেষকান্তি —ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ঃ প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।

বাসকে, ধীরেন্দ্রনাথ —সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) ঃ পরিবেশক সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৯।

বাসকে, ধীরেন্দ্রনাথ —হড় রড় বায়ান ঔরি সাঁওতালী ব্যাকরণ ঃ সন্তোষী প্রিন্টার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৫।

বাসকে, ধীরেন্দ্রনাথ, পাল, অনিমেষকান্তি — সাঁওতালি বাষার সহজ পাঠ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০ মে, ২০০৫।

বিষ্ণু, সুধীরকুমার —সাদরি ঃ আদিবাসী চা শ্রমিকদের ভাষা ঃ অর্পিতা প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা — আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব ঃ পরিবেশক প্যাপিরাস, পরিমার্জিত সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০৭।

বিশ্বাস, সুখেন —প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ঃ (প্রথম খন্ড) প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১২।

—(দ্বিতীয় খন্ড) প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১২।

Boding the Rev. P O – Materials for A Santali Grammar (I-II) Mostly Morphonology, Cal, Published by Dhirendra Nath Baskey, Reprint 2011.

বিশ্বাস, শ্যামশ্রী —বাংলা ভাষা রূপে প্রয়োগ ঃ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র —ভাষাবিদ্যা পরিচয় ঃ জয়দুর্গা লাইব্রেরী, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০৯।

ভৌমিক, সুহৃদকুমার —আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা ঃ মারাংবুরু প্রেস, মেছেদা, মেদনীপুর, ১৯৯৯।

মজুমদার, পরেশচন্দ্র —ক) বাংলাভাষা পরিক্রমা ঃ (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১১।

খ) বাংলাভাষা পরিক্রমা ঃ (দ্বিতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১১।

মুরমু, বিমল —সাঁওতালী ভাষা ও বিশ্বের ভাষা মানচিত্র ঃ আঁদিম পাবলিকেশন, মেছেদা, প্রথম সংস্করণ, ১৫ই আগস্ট, ২০০৯।

মন্ডল, নমিতা —বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মলভূমের উপভাষা ঃ বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, ১৯৮৯।

মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র — ঝাড়খন্ডি বাংলা শব্দকোষ ঃ কালবেলা, পূর্ব মেদনীপুর, তমলুক, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৪।

রায়, ভব —রাঢ়ের লোকভাষা ও শব্দকোষ ঃ দীপায়ণ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।

সেন, সুকুমার —ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৮।

সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ — ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা ঃ রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৯।

সরকার, পবিত্র —ক) বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ ঃ দে'জ পাবিলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৬।

খ) লোকভাষা লোকসংস্কৃতি ঃ চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১, কলিকাতা।

হেমব্রম, পরিমল —সাঁওতালি ভাষাচর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত ঃ নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০১০।

পত্রপত্রিকা

১। অমৃতলোক, ৭৪ শারদ সংখ্যা ১৪০২, সম্পাদক— সমীরণ মজুমদার।

২। অমৃতলোক, বিশেষ সংখ্যা ১০৫, সম্পাদক— সমীরণ মজুমদার।

৩। অভিযাত্রী ফেরী, বর্ষ-৪, সংখ্যা-১, জুন ২০০৮, সম্পাদক— অচিন্ত্য বিশ্বাস।

৪। অভিযাত্রী ফেরী, বর্ষ-৪, সংখ্যা-২, জানুয়ারি ২০০৯, সম্পাদক অচিন্ত্য বিশ্বাস।

৫। জোয়ার, ৩৭ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮, সম্পাদক মণ্ডলী— স্বপ্না রায়, পুষ্পজিৎ রায়।

৬। জোয়ার, ৩৭ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, সম্পাদক মণ্ডলী— স্বপ্না রায়, পুষ্পজিৎ রায়।

৭। দেশ, ২৯ আগস্ট ১৯৯২, ৫৯ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, সম্পাদক— সাগরময় ঘোষ।

৮। দেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, ৫৫ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, সম্পাদক— সাগরময় ঘোষ।

৯। বর্তিকা, শারদ সংখ্যা ২০১০, কলকাতা ১০৭, বড়ডাঙ্গা মেনরোড নারকেল বাগান।

১০। সময়ের সংলাপ, ২১ নভেম্বর ২০০৮, কার্তিক ১৪১৫, পঃবঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, সম্পাদক— পুষ্পজিৎ রায়।

১১। সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা প্রথম খণ্ড, সম্পাদক— হাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, ২০১০।

১২। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, Research Journal, Vol-IX, 2003, সম্পাদক— সুব্রত পাল।

১৩। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, Research Journal, Vol-X, 2005, সম্পাদক— নন্দকুমার বেরা।

১৪। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, Research Journal, Vol-XI, December 2003, সম্পাদক— নন্দকুমার বেরা, Vol-XII, December 2007, সম্পাদক— নন্দকুমার বেরা।

সংগৃহীত চিত্র

টুসুভাসান, পার্বতিপুর, বাঁকুড়া

জিনাসিনি, সুখাডালী, বাঁকুড়া
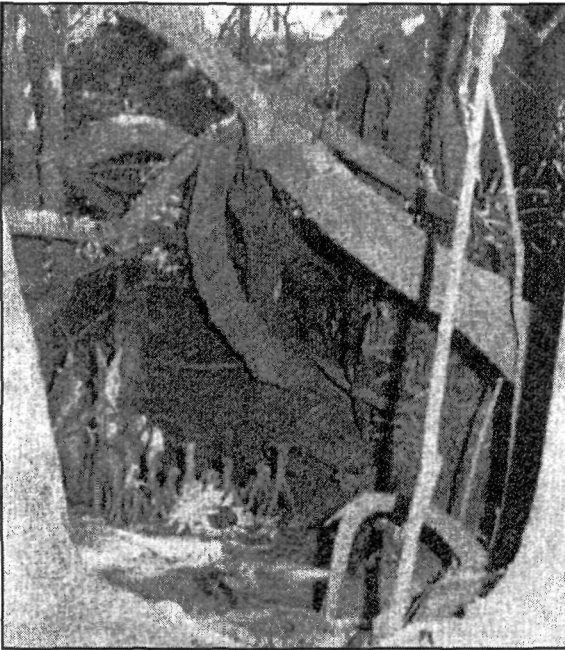
ডাকাই সিনি, পুরুলিয়া
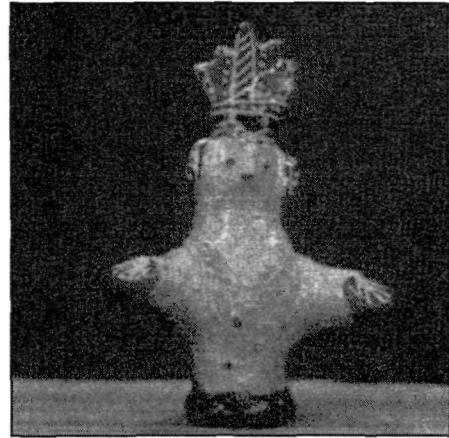
গালার মনসা, শিলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর
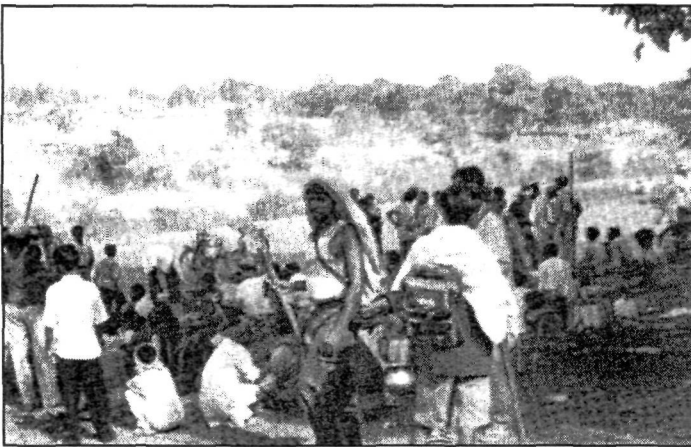
অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার পর্বের আগে জমায়েত, পুরুলিয়া

নন্দরানী, দোলতোলা, বাঁকুড়া

অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসবে জমায়েত, পুরুলিয়া
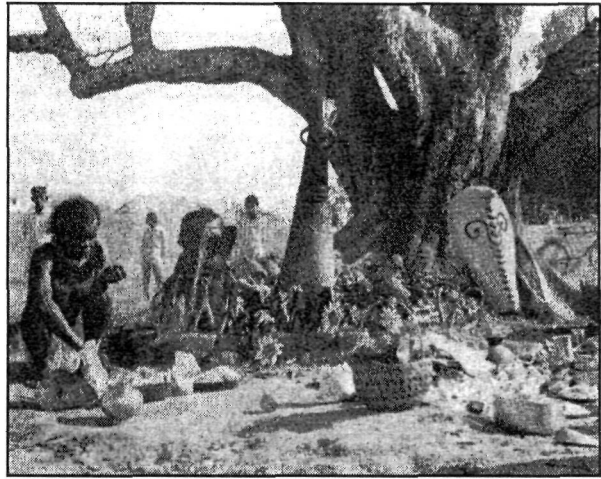
এখ্যান দিনে সিনিপুজো, বীরভানপুর, বাঁকুড়া

দেওয়ালি পুতুল, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর
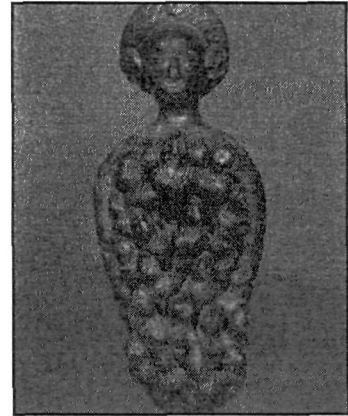
ষষ্ঠীপুতুল, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া
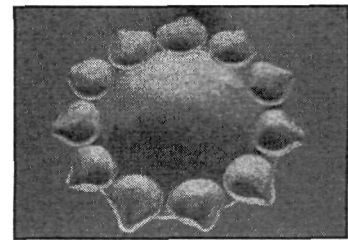
টুসু সরা, কাশীপুর, পুরুলিয়া

ঝাড়খন্ড থেকে আগত অযোধ্য পাহাড়ে শিকার উৎসবে
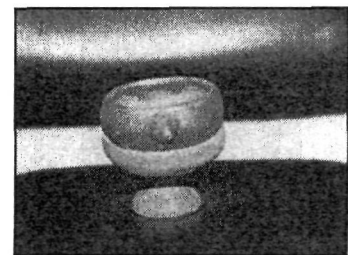
লক্ষ্মী, গণেশ ঘট, পশ্চিম মেদিনীপুর

হাড়িয়া তৈরির বাখর

ঝাড়গ্রামে শিবের আকৃতির বৌদ্ধদের উপাস্য
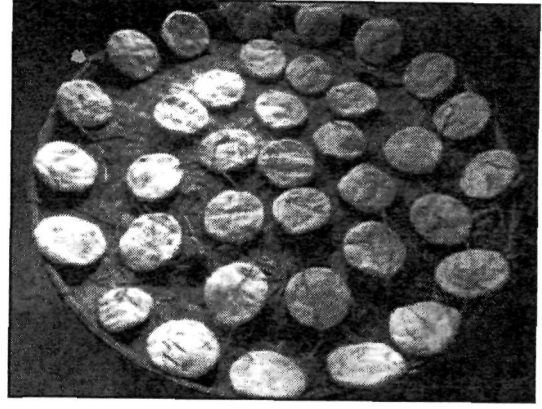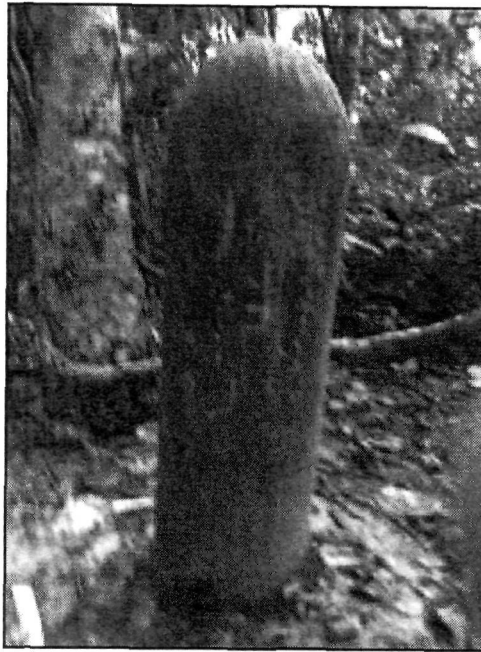
গরুখুটান উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে জাম্বনিডাঙ্গা, বাঁকুড়া

বীরবাইদ ও পুরুলিয়ায় ছৌ-নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে (গম্ভীরসিং মোড়া)
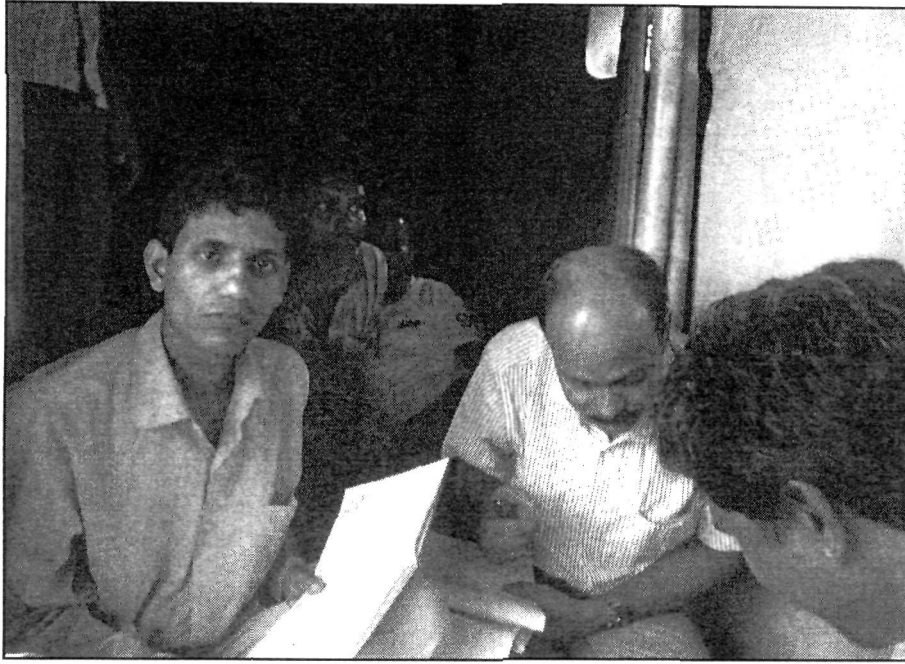
রামজীবনপুর, বাঁকুড়া কোড়া গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষায় রত গবেষক ও অধ্যাপক পার্থসারথী হাটি

তিরধনুক, কুঠার, জাল নিয়ে বীরহড় শিকারিরা, মহুলটাঁড়, পুরুলিয়া

ঝাড়গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ